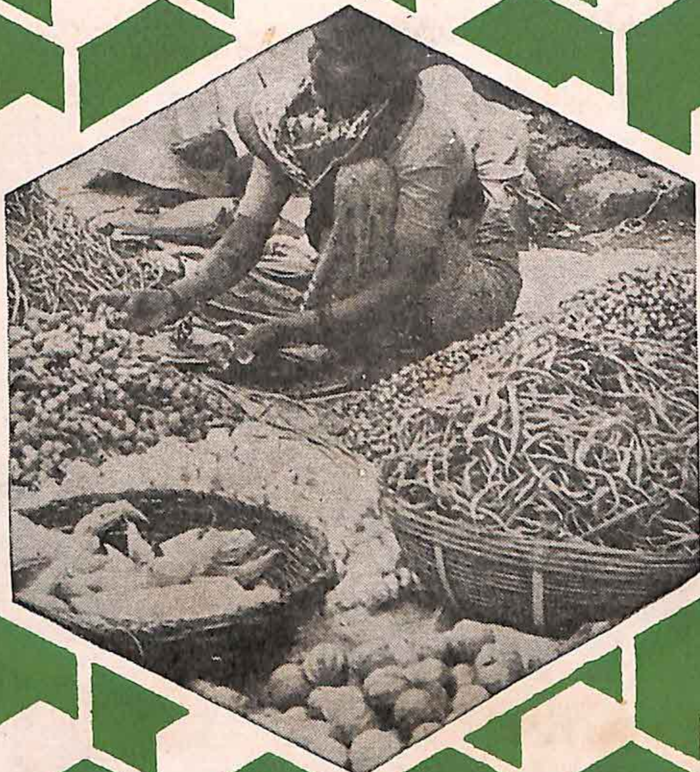
সব্জী বিজ্ঞান

তরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বিজ্ঞান পত্রিকা

সব্জী বিজ্ঞান

ডঃ তরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
এম. এস্.-সি. (কৃষি), পি-এইচ. ডি (কল্যাণী), অধ্যাপক,
উদ্যান বিজ্ঞান বিভাগ, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনপুর, নদীয়া ।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

SABJI BIJNAN

[*OLERICULTURE*]

Tarunkumar Chattopadhyay

প্রকাশকাল :

প্রথম মুদ্রণ : নভেম্বর ১৯৯০/বি

প্রকাশক :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

আর্য ম্যানসন্ (নবম তল)

৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

কলিকাতা ৭০০ ০১৩

মুদ্রক :

শ্রী প্রবীরকুমার পান

শ্রী লক্ষ্মী সরস্বতী প্রেস

২০৯বি, বিধান সরণী

কলিকাতা ৭০০ ০০৬

মূল্য : উনিশ টাকা

Published by Shri Shibnath Chattopadhyay, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the Centrally Sponsored Scheme of Production of books and literature in regional languages at the University level launched by the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education), New Delhi.

মুখবন্ধ

উদ্যান বিজ্ঞান আজ নির্দিষ্ট কয়েকটি শাখা বিজ্ঞানে বিভক্ত। সব্জী-বিজ্ঞান, উদ্যান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলো সহোদর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। উদ্যানবিজ্ঞানের পরিব্যাপ্তি ও গভীরতাই এর মূল কারণ।

উদ্যান বিজ্ঞানের একটি প্রধান অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পরই মাতৃভাষায় একটি বই-এর প্রয়োজন ছিল। আমার সীমিত ক্ষমতার দ্বারা পাঠক পাঠিকাদের কিছু তথ্য দেবার চেষ্টা করেছি। তাঁরা উপকৃত হলে, আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

স্নাতক শ্রেণীর উপযোগী করে লেখা হলেও বইটি উচ্চমাধ্যমিক, কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক, গবেষক ও স্নাতকোত্তর ছাত্রদের উপকারে আসবে বলে আশা করছি। এছাড়া কৃষি প্রযুক্তিবিদ, শিক্ষক ও সব্জী চাষীদের কাজে লাগলে আনন্দিত হব।

বইটি সহজ ও সরল ভাষায় লেখা হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় চলতি ইংরেজী ব্যবহার করে প্রতিশব্দের অভাব পূরণ করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায় স্বয়ং সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বইটি লেখার সময় অনেকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সবা ার কৃতজ্ঞতা জানাই। উদ্যান বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ডঃ সুবল চন্দ্র জানা ও কর্ম্মী মহঃ কলিমুদ্দিন সেখ বিশেষ ধন্যবাদের দাবী রাখে। রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে, বইটি প্রকাশের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

লেখার মধ্যে কিছু ভুল ত্রুটি থাকলে, আগ্রহী পাঠক দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, উপকৃত হব। পরবর্তীকালে সেগুলি সংশোধন করার চেষ্টা করব।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

সব্জী বিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়

সব্জী বিজ্ঞান

উদ্যান বিজ্ঞানে যেমন ফল, সব্জী ও ফুলের চাষ থেকে আরম্ভ করে এদের পরিপূর্ণ ব্যবহার পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সব্জী বিজ্ঞানেও তেমনি, পৃথিবীর যাবতীয় নরম ও কাষ্ঠহীন মরশুমী ও বর্ষজীবী সকল উদ্ভিদকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এইসব উদ্ভিদের কারও মূল, কারও কাণ্ড, কারও ডাঁটা, আবার কারও পাতা, ফুল, ফল বা বীজ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

উদ্যান বিজ্ঞানের অংশ হিসাবে সব্জী বিজ্ঞানেও ফসলের বীজ বপন থেকে আরম্ভ করে মানুষের ব্যবহার পর্যন্ত সমস্ত পর্যায়কেই এর আওতায় আনা হয়েছে।

সব্জী চাষের সুযোগ ও গুরুত্ব ঃ

বিগত কয়েক দশক ভারতবর্ষে খাদ্যের ঘাটতি ছিল।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ—খরা ও বন্যার ফলে এবং রোগ ও পোকার আক্রমণে, বর্তমানে কিছু কিছু অঞ্চলে, খাদ্যের ঘাটতি দেখা গেলেও সামগ্রিক ভাবে গোটা ভারতবর্ষে সেভাবে খাদ্য-ঘাটতি দেখা যায় না। ভারতে উচ্চ ফলনশীল বীজ ও উন্নত প্রথায় চাষাবাদ পদ্ধতির প্রচলন খাদ্যাভাব দূরীকরণের অন্যতম কারণ বলে ধরা হয়। আমরা জানি যে বর্তমানে এক হেক্টর জমি থেকে বছরে 70 কুইণ্ট্যাল গম, 90 কুইণ্ট্যাল চাল বা 50 কুইণ্ট্যাল ভুট্টা উৎপাদন করা কিছু মাত্র কঠিন নয়। কিন্তু শুধুমাত্র চাল, গম, ভুট্টা ইত্যাদিই পরিপূরক পুষ্টি বা সুষম খাদ্য হিসাবে পরিগণিত হবে না। ক্ষুধার্ত অবস্থায় উদর পূর্তির জন্য হয়ত এগুলি প্রয়োজন আছে ; কিন্তু প্রাথমিক ক্ষুধা মিটে গেলেই সুষম খাদ্যের দরকার হবে। মানুষ বেশী পরিমাণ আমিষ জাতীয় খাদ্য পেতে চাইবে। বেশী পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়ার চেষ্টা করবে। সাধারণভাবে সব সব্জীতে আমিষ খাদ্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী না থাকিলেও, সব্জী থেকে বেশী পরিমাণ খনিজ লবণ ও ভিটামিন পাওয়া যায় এবং সর্বোপরি হেক্টর প্রতি অন্য ফসলের থেকে সব্জীর ফলন বেশী, তাই সব্জী চাষের সুযোগ ও গুরুত্ব মূলত-এর উৎপাদনশীলতা, অর্থনৈতিক উপযোগিতা ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের ক্ষমতার দিক থেকে বিচার করা প্রয়োজন।

সব্জীর উৎপাদনশীলতা ঃ

সব্জীর উৎপাদনশীলতা প্রধানতঃ (1) হেক্টর প্রতি উৎপাদন ও (2) নিবিড় শস্য পর্যায়, এই দুটি দিক থেকে বিচার করতে হবে।

(1) **হেক্টর প্রতি উৎপাদন ঃ** তণ্ডুল জাতীয় শস্যের যেখানে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন 3 টন, সেখানে একই পরিমাণ জমি থেকে 125 টন ব্যাঙের ছাতা বা 80 টন টেপিয়োকা পাওয়া কিছুই আশ্চর্যের নয়। নীচের পরিসংখ্যানে বিভিন্ন সব্জীর গড় উৎপাদন ইত্যাদি দেওয়া হল।

পরিসংখ্যান—1 ঃ গড় উৎপাদন, ক্যালরী মান ও বৈজ্ঞানিকের নাম দেওয়া হল।

শস্য	হেক্টর প্রতি উৎপাদন (টনে)	100 গ্রাম শস্যের ক্যালরী উৎপাদন	
তণ্ডুল	3	345	
লাউ	20	13	গিয়াকোমো, 1967
মিষ্টি কুমড়ো	30	12·5—56	গৌরীশংকর, 1967
পটল	32	25	” ”
টম্যাটো	25	27	” ”
বেগুন	40	43	
পেঁয়াজ	20	54	” ”
ফুলকপি	20	34	” ”
বাঁধাকপি	30	17—34	” ”
গাজর	20	54	টেরা, 1967
টেপিয়োকা	80	144—146	চাড্ডা, 1961
ব্যাঙের ছাতা	125	45	ম্যানট্যাল, 1967
মিষ্টি আলু	28	117—121	ম্যাগুণ, 1967
কচু	18	104—108	” ”

এছাড়া (কুণ্ডু 1967) ইন্দোনেশীয়া বা ফিলিপাইনসে, শাঁখালুর কিছু কিছু প্রজাতি আছে, যাদের প্রতি হেক্টরে উৎপাদন প্রায় 95 টন। কাজেই উপরের পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়, সব্জীর হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন তণ্ডুল-জাতীয় শস্য অপেক্ষা অনেক বেশী।

সাধারণ উৎপাদনশীলতা ছাড়াও হেক্টর প্রতি তাপ (ক্যালরী) ও বিভিন্ন খাদ্যাংশ উৎপাদন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সব্জী থেকে অনেক বেশী তাপ, শর্করা, আমিষ ও খনিজ লবণ পাওয়া সম্ভব। পরিসংখ্যান 2-এ দেখান হয়েছে এক হেক্টর জমি থেকে কতটা তাপ, শর্করা, আমিষ ও চর্বি জাতীয় খাদ্য ও খনিজ লবণ পাওয়া যেতে পারে। অধিক উৎপাদনের আরও একটি সুবিধা, চাষী অপেক্ষাকৃত কম দামে ফসল বিক্রী করলেও নির্দিষ্ট লভ্যাংশ ব্যাহত

পরিসংখ্যান—2 : হেক্টর প্রতি তণ্ডুল জাতীয় সব্জীর গড় খাদ্যোপাদান উৎপাদন।

শস্য	হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন (টনে)	তাপ উৎপাদন (1000 ক্যালরীতে)	খাদ্যোপাদান (কিলোগ্রাম)			
			শর্করা	আমিষ	চর্বি	খনিজ লবণ
তণ্ডুল	3	11,037	2,475·6	222·9	39·0	23·4
সব্জী	25·5	20,892	5,059·5	512·7	24·9	256·5

হয় না। সব সব্জীতে যথেষ্ট পরিমাণ আমিষ ও চর্ব্বি জাতীয় খাদ্যোপাদান না থাকলেও কিছু কিছু সব্জী আছে যেখানে প্রচুর পরিমাণে এগুলি পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বীন জাতীয় সব্জী যেমন—সয়াবীন, ফরাসবীন, সীম, ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে আমিষ জাতীয় খাদ্যোপাদান পাওয়া যায়। এছাড়া ব্যাঙের ছাতা ও শাক জাতীয় সব্জীতেও বেশ খানিকটা আমিষ জাতীয় খাদ্যাংশ পাওয়া যায়। খুব কম সব্জী থেকেই চর্বি জাতীয় খাদ্যাংশ পাওয়া যায়। কেবলমাত্র সয়াবীন ও চীনা বাদাম চর্বিযুক্ত সব্জী হিসাবে পরিগণিত হয় (রাজলক্ষ্মী 1969)। সাধারণভাবে সব সব্জী থেকেই খনিজ লবণ পাওয়া গেলেও শাক জাতীয় সব্জী ও মূল জাতীয় সব্জী থেকে বেশী পরিমাণ খনিজ লবণ পাওয়া যায়। খনিজ লবণের মধ্যে ফসফরাস, লোহা ও চুন মানুষের দেহের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। সেগুলি নানা ধরনের সব্জী থেকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পেঁয়াজ, ইত্যাদি শ্যাল্যাড শস্য, যেগুলি কাঁচা খাওয়া হয়, সেগুলিতে খনিজ লবণ ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে এনজাইম বা উৎসেচক পাওয়া যায় যা মানুষের হজম বৃদ্ধি করে ও শরীরের অম্লত্ব ও বায়ু নষ্ট করে।

(2) সব্জী চাষ ও শস্য পর্যায় ঃ

সব্জী স্বল্পকালীন শস্য। অবশ্য কিছু সব্জী আছে যেগুলো উৎপন্ন হতে বেশী সময় নেয়, যেমন—পটল, ওল, ইত্যাদি। কিন্তু বেশীর ভাগ সব্জীই অল্প সময়ের ফসল অথবা এগুলির সাথে অন্তর্বর্তী বা সাথী ফসল চাষ করা যায়। কিছু সব্জী আছে যেগুলো ঠিক মত চাষ করতে পারলে বছরে একই জায়গায় চব্বিশটি ফসল নেওয়া যেতে পারে যেমন, ব্যাঙের ছাতা। সিমলার ভারতীয় গবেষণাগার থেকে জানান হয়েছে এইভাবে চাষ করে শস্য চাষের নিবিড়তা ও উৎপাদন বহুগুণ বাড়ানো সম্ভবপর। কতকগুলো জাতের মুলো এবং কিছু জাতের মটরশুঁটি 40—60 দিনের মধ্যে চাষ করা সম্ভব। এছাড়া ফুলকপি ও বাঁধাকপির জমিতে পালং বা ওলকপি সাথী বা অন্তর্বর্তী ফসল হিসাবে চাষ করলেও শস্য চাষের নিবিড়তা ও উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। যেহেতু সব্জী চাষে প্রতিটি গাছের আলাদাভাবে যত্ন নেওয়া হয়, সেহেতু উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় একই জমি থেকে বছরে তিন-চারটে ফসল নেওয়া কিছু মাত্র অসম্ভব নয়। শস্য পর্যায় বাড়লে জমির উৎপাদনশীলতাও বাড়ে এবং চাষী অর্থনৈতিক ভাবে উপকৃত হতে পারে।

এছাড়া চাষ আবাদে অনেক বেশী শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়।

অর্থ নৈতিক উপযোগিতা ঃ

অর্থনৈতিক উপযোগিতার দিক দিয়ে সব্জী চাষকে প্রধানত ঃ (1) একই জমি থেকে অনেক বেশী লাভ ; (2) সস্তায় সুষম খাবার যোগান ; (3) সব্জী চাষে বেশী শ্রম দিবস সৃষ্টি ; (4) বিভিন্ন ধরনের শ্রমিকের উপযোগী শ্রমক্ষেত্র সৃষ্টি ; (5) অল্প জমি থেকে সহজ জীবিকার্জ্জন, ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে।

(1) একই জমি থেকে বেশী লাভ ঃ আগেই দেখান হয়েছে যে সব্জীর গড় উৎপাদন অন্য ফসলের উৎপাদন থেকে অনেক বেশী। এক হেক্টর জমি চাষ করে বছরে যদি 4 হাজার টাকা মোট আয় হয় তবে সমপরিমাণ জমি থেকে পটল, বাঁধাকপি বা ফুলকপি, ইত্যাদি চাষ করে কম পক্ষে 25-30 হাজার টাকা পাওয়া অসম্ভব নয়। এছাড়া যদি ব্যাঙের ছাতা বা টেপিয়োকা বা শাঁখালুর চাষ করা যায় তবে হেক্টর প্রতি বছরে মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে 40-50 হাজার টাকা।

অধিক উৎপাদনশীলতার সঙ্গে নিবিড় শস্য পর্যায় যুক্ত হয়েই সব্জীর

সামগ্রিক উৎপাদন বাড়ে আর সেই সংগে মোট আয়ও বাড়ে। ফলে, চাষী, সব্জী চাষ করে একই জমি থেকে বেশী লাভ আশা করতে পারে।

(2) সস্তায় সুষম খাদ্য ঃ

শ্রমজীবি তথা খেটেখাওয়া মানুষ সাধারণতঃ পেট ভরা ও পুষ্টিকর খাবার পেলে সুখী হয়। খেটেখাওয়া বাঙ্গালীর দেহ রক্ষার জন্য দৈনিক 2300 থেকে 2600 ক্যালরী তাপ লাগে। অবশ্য মহিলা ও বাচ্চাদের জন্য কিছুটা কম তাপ লাগে। দৈহিক তাপ রক্ষার জন্য তারা এমন খাবার পছন্দ করে যা হবে সস্তা, পেট ভরা ও তাপ সরবরাহের উপযোগী। অন্য শস্যের মাধ্যমে এরকম খাবার দেওয়া সম্ভব না হলে সাধারণ মানুষেরও দুর্বল শ্রেণীর মানুষের তণ্ডুল জাতীয় শস্যের উপর নির্ভরতা বাড়বে এবং খাদ্য ঘাটতি দেখা যাবে। অধিক উৎপাদনশীলতার জন্য সব্জী চাষের মাধ্যমে দুর্বল শ্রেণীর মানুষকে সহজে ও সস্তায় পুষ্টিকর ও পেট ভরা খাবার জোগান দেওয়া সম্ভবপর। 1967 সালে রায় "সাইনস্ রিপোর্টারে" একটি প্রবন্ধে কোন জাতীয় খাবার কতটা পাওয়া যেতে পারে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে 1967 সালের বাজার দরে এক টাকার তণ্ডুল জাতীয় খাবার থেকে 2740 ক্যালরী, মাংস থেকে 388 ক্যালরী, শাক-সব্জী থেকে 2300 ক্যালরী, টেপিয়োকা থেকে 3180 ক্যালরী ও মিষ্টি আলু থেকে 3000 ক্যালরী তাপ পাওয়া যেতে পারে। স্বভাবতই সমপরিমাণ অর্থ মূল্যে টেপিয়োকা ও মিষ্টি আলুর তুলনায় তণ্ডুল জাতীয় শস্য থেকে কম (ক্যালরী) তাপ পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই দুর্বল শ্রেণীর মানুষকে যদি সঠিক সব্জী যোগান দেওয়া যায় তবে অল্প মূল্যে পুষ্টিকর ও পেট ভরা খাবারও দেওয়া যেতে পারে। বস্তুত দক্ষিণ ভারতে এইভাবেই মানুষের খাদ্য তালিকায় টেপিয়োকা স্থান করে নিয়েছে।

এছাড়া রাজলক্ষ্মী (1969) তাঁর "এ্যাপ্লায়েড নিউট্রিশন" বই এ ষাট দশকের শেষ ভাগে এক টাকা অর্থ মূল্যে কোন খাবার কতটা ও তার থেকে কি পরিমাণ খাদ্যোপাদান পাওয়া যেত সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন এক টাকায় তখন সব থেকে বেশী পাওয়া যেত শাকসব্জী আর সব থেকে কম পাওয়া যেত তণ্ডুল ও বীন জাতীয় শস্য। এর মধ্যে বীন জাতীয় সব্জী কম পাওয়া গেলেও এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী থাকে আমিষ (পরিসংখ্যান-3) ও রিবোফ্লেবিন। বাজার দরের সামান্য হেরফের হলেও বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে রাজলক্ষ্মীর অভিজ্ঞতা সমপ্রযোজ্য।

পরিসংখ্যান—3 ঃ ষাট দশকের শেষ ভাগে সমমূল্যে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য ও তাদের উপাদান (রাজলক্ষ্মী 1969)।

খাদ্য	প্রতি এক টাকায়					
	পরিমাণ (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চূন (মিলিগ্রাম)	লোহা (মিলিগ্রাম)	ক্যারোটীন (আই. ইউ)	রিবোফ্লেবিন (মিলিগ্রাম)
তণ্ডুল	800	80	240	48	800	0·80
বীন জাতীয় সব্জী	800	192	640	64	800	3·20
শাক সব্জী	2000	80	5000	300	1700	2·00
মূল সব্জী	1000	20	200	6	1000	0·20
অন্যান্য সব্জী	1000	20	400	20	3000	0·60

অন্যদিকে, শাকসব্জী, যেমন বেশী পরিমাণ পাওয়া যায় তেমনি এতে খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন "এ" সব থেকে বেশী থাকে। এসব থেকে একটা সিন্ধান্তে আসা যায় যে ভারতবর্ষে, তথা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের তথা দুর্বল শ্রেণীর মানুষের পেট ভরা খাবার ও পুষ্টির জন্য সব্জী চাষের উপর বেশী করে গুরুত্ব দিতে হবে। তণ্ডুল জাতীয় শস্যের উপর চাপ কমিয়ে কৃত্রিম খাদ্যাভাব দূর করার জন্য বেশী করে সব্জী চাষ করা দরকার। এছাড়া ভারতের মানুষকে, যার বেশীর ভাগই নিরামিষাশী, পুষ্টিকর ও পেট ভরা খাবার জোগানোর জন্যও বেশী করে সব্জী চাষ করা দরকার।

(3) সব্জী চাষে বেশী শ্রম দিবস সৃষ্টি ঃ

সব্জী চাষে যেহেতু প্রতিটি গাছে লক্ষ্য রাখা হয়, সেইহেতু এর ব্যাপ্তি ও উৎপাদনশীলতার সাথে শস্য পর্যায় যুক্ত হয়ে চাষের নিবিড়তা অনেক বাড়িয়ে দেয়। তাই এটা দেখা যায় যে অন্য শস্যের চাষে যখন 0·4-0·6 হেক্টর জমিতে একজন শ্রমিক লাগে তখন একই পরিমাণ জমিতে সব্জী চাষ করলে 1·5-2·0 জন শ্রমিকের দরকার হয়। অবশ্য সব্জীর প্রভেদ অনুসারে চাষে শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তার তারতম্য হয়। তবে সামগ্রিকভাবে সব্জী চাষের গড় প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে উপরের অনুপাত ঠিক করা হয়েছে। যেহেতু

শ্রমিক নিবিড়তার প্রেক্ষাপটে শ্রমিক দিবসের হিসাব হয়, সেইহেতু সব্জী চাষ শ্রম নিবিড় ও বেশী শ্রম দিবস সৃষ্টি করে এটা সহজেই বোঝা যায়।

(4) বিভিন্ন ধরনের শ্রমিকের উপযোগী শ্রম ক্ষেত্র সৃষ্টি :

সব্জী চাষের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক লাগে, যেমন জমি তৈরী, বপন বা চারা রোপণ, সেচ, শস্য রক্ষা ইত্যাদি কাজে পূর্ণ শ্রমিক দরকার হয়। আবার শস্য চয়ন বা সব্জী উত্তোলনে অনেক সময় স্ত্রী শ্রমিক বা বালক শ্রমিক নিয়োগ করলে সুবিধা হয়। সব্জী সংরক্ষণ ও বিপননেও স্ত্রী শ্রমিক অথবা বয়স্ক শ্রমিক নিয়োগ লাভজনক। কাজেই দেখা যায় যে সব্জী চাষে বিভিন্ন বয়স ও বিভিন্ন ধরনের শ্রমিকের কাজের সুযোগ আছে। অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষত প্রান্তিক চাষী বা ক্ষেত মজুরের (বাড়ির হাতায় জমি) পরিবারের মা, বাবা, স্ত্রী, পুত্র সকলেই কাজ করার সুযোগ পায় ও করে।

দ্রুত শস্য পর্যায় অনুসরণ করলে সব্জী চাষের আওতায় কোন জমি বছরের খুব বেশী দিন ফাঁকা পড়ে থাকে না। কাজেই শ্রমিক অনুযায়ী জমির আয়তন ঠিক করে পর্যায়ক্রমে সব্জী চাষ করলে বছরের সব সময়ই পারিবারিক শ্রমিকেরা প্রত্যেকেই কাজে নিযুক্ত থাকতে পারে। এইভাবে সমগ্র পরিবারের বাৎসরিক আয় অনেক বাড়ান যেতে পারে।

(5) অল্প জমি থেকে সহজে জীবিকাত্তর্জন :

ভারতবর্ষের মত উন্নতিশীল, জন সংখ্যা ভারাক্রান্ত দেশে, চাষযোগ্য সমস্ত জমি সুষমভাবে বণ্টন করে দিলে জন প্রতি জমির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় 0·7 হেক্টর। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আরও করুণ। কেননা এখানে জনসংখ্যার চাপ ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের তুলনায় অনেক বেশী। এমতাবস্থায় এত অল্প জমিতে সব্জী ছাড়া অন্য কোন ফসল চাষ করে ব্যক্তি বিশেষের জীবন ধারণ সম্ভব নয়। সব্জী চাষ করে গ্রাসাচ্ছাদন সম্ভব, তার কারণ সব্জীর উচ্চফলন, তড়িৎ শস্য পর্যায় ও সর্ব শেষে বেশী আয়। এছাড়া আরও সুবিধে হচ্ছে যে, সব্জী চাষীকে ফসলের জন্য বেশী দিন অপেক্ষা করতে হয় না। ফসল লাগানোর কিছু দিন পর থেকেই চাষী, শুধু মাত্র তার পারিবারিক শ্রমিকের সাহায্যে কিছু কিছু শস্য তুলে বাজারজাত করে আয় করতে পারে। এই সবের জন্য সহজেই বলা যায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী তথা কৃষি শ্রমিকের সব্জী চাষই একমাত্র বাঁচার উপায়।

সব্জী চাষ ও পুষ্টি ঃ

মানুষ যে খাবার খায় তার মূল কারণ বা উদ্দেশ্য দেহের পুষ্টি তথা প্রয়োজনীয় তাপ সরবরাহ। পুষ্টি ও তাপ প্রধানত বিভিন্ন খাদ্যোপাদান যথা শর্করা, আমিষ, চর্বি, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ থেকে পাওয়া যায়। তবে শুধু-মাত্র শর্করা বা কারবোহাইড্রেট, প্রোটীন, ইত্যাদির সমাহার হলেই খাদ্য হবে না, তার সাথে চাই উৎকৃষ্ট স্বাদ ও সহজ পাচ্যতা। সব্জীর মধ্যে এই গুণগুলি সবই বিদ্যমান। এছাড়া সব্জী সহজে রান্না করা যায়; সতেজ অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়, অন্য সব্জী ও তণ্ডুল জাতীয় শস্যের সাথে সহজেই মিশিয়ে রান্না করা যায় এবং এগুলির প্রায় সবগুলিরই কিছু না কিছু আয়ুর্বেদিক গুণও আছে। সাধারণভাবে আমিষ ভক্ষণের ফলে শরীরের মধ্যে যে অম্লতা সৃষ্টি হয়, প্রয়োজনমত সব্জী খেলে এই অম্লতা দূর করা যায়। কোষ্ঠবদ্ধতা দূরীভূত হয়। সুনির্বাচিত ও সুপক্ক সব্জী, রূপে, গন্ধে ও স্বাদে অপূর্ব এক পরিবেশ সৃষ্টি করে খাওয়ার উৎসাহ বাড়ায়।

সব্জীতে প্রায় সমস্ত রকম খাদ্যোপাদান থাকলেও কতকগুলি খাদ্যোপাদান বেশী মাত্রায় ও কতকগুলি অল্পমাত্রায় থাকে। কোন সব্জী হতে কোন খাদ্যোপাদান কতটুকু পাওয়া যায় এ সম্বন্ধে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হল।

(1) শর্করার উৎস হিসাবে সব্জীর মূল্য ঃ

কতকগুলি সব্জীতে প্রচুর পরিমাণ শর্করা জাতীয় খাদ্যোপাদান পাওয়া যায়। আলু, মিষ্টি আলু, ওল, টেপিয়োকা, খামালু ও কচু প্রভৃতি কন্দ জাতীয় ফসলে প্রচুর পরিমাণ শর্করা বর্তমান থাকে। শাক ও ফল জাতীয় সব্জী থেকে খুব বেশী না হলেও মোটামুটি পরিমাণ শর্করা জাতীয় খাদ্যো-পাদান পাওয়া যায়। তবে সব সব্জীই ভাল শর্করা সরবরাহ করে না।

(2) আমিষের উৎস হিসাবে সব্জীর মূল্য ঃ

একইভাবে সব সব্জীই আমিষ জাতীয় খাদ্যোপাদানের ভাল উৎস না হলেও কিছু কিছু সব্জী থেকে প্রচুর পরিমাণ আমিষ পাওয়া যায়। আবার কিছু সব্জীতে লাইসিন জাতীয় এ্যামিনো এ্যাসিড ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে এ্যাস্‌পারটিক ও গ্লুটামিক এ্যাসিড পাওয়া যায়। এগুলি শরীরের গঠন বৃদ্ধির জন্য প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হয়। সাধারণত ডাল জাতীয় সব্জী যথা, মটরশুঁটি,

সয়াবীন, সীম, ফরাসবীন, মাখন সীম, ইত্যাদিতে প্রচুর আমীষ জাতীয় খাদ্যোপাদান থাকে। এছাড়া বেথুয়াশাক, ধনেপাতা, মেথীশাক ও ব্যাঙের ছাতাতেও মোটামুটি ভাল পরিমাণ আমিষ জাতীয় খাদ্য থাকে।

(3) চর্বির উৎস হিসাবে সব্জীর মূল্য ঃ

সত্যি কথা বলতে কি খুব বেশী সব্জী থেকে চর্বি জাতীয় খাদ্যোপাদান পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র সয়াবীন ও চীনে বাদামকে ভাল উদ্ভিদ চর্বি উৎপাদনকারী ফসল হিসাবে গণ্য করা যায়।

(4) খনিজ লবণ উৎপাদন ও সব্জী ঃ

খনিজ লবণের মধ্যে চুন, ফসফরাস ও লোহা শরীর গঠনের জন্য প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হয়। এগুলি সব সব্জী থেকেই যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, বিশেষত সবুজ ও কন্দ জাতীয় সব্জী এগুলির উৎকৃষ্ট উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়।

পালংশাক, ওল, কচু, ঢেঁড়স, পেঁয়াজ, বীট, বীন, মেথীশাক, টেপিয়োকা, ধনেপাতা, বেথুয়াশাক ও নটেশাকে প্রচুর পরিমাণ চুন পাওয়া যায়। অনেক-ক্ষেত্রে 100 গ্রাম সব্জীতে 397 মিলিগ্রাম পর্যন্ত চুন পাওয়া যায় যেমন—নটেশাক। আবার 100 গ্রাম বীনে 50 মিলিগ্রাম চুন পাওয়া যায়।

ফসফরাসের ভাল উৎস হচ্ছে বীন, কচু, মটরশুঁটি, নটেশাক, লংকা, মিষ্টি আলু, পেঁয়াজ ও আলু। 100 গ্রাম বীনে 130 মিলিগ্রাম ফসফরাস পাওয়া যায়। সব থেকে কম 40 মিলিগ্রাম ফসফরাস পাওয়া যায় প্রতি 100 গ্রাম আলুতে।

পুদিনাপাতা, গাজর, ধনেপাতা, মেথীপাতা বেথুয়াশাক ও কচুশাকে প্রচুর পরিমাণ লৌহজ খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়।

(5) ভিটামিন ও সব্জী ঃ

শরীরের গঠনের জন্য ও শরীরকে ঠিকমত রাখার জন্য বিভিন্ন ভিটামিন ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে দরকার হয়। ভিটামিন "এ" দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে, ভিটামিন "সি" রক্ষণ ক্ষমতা বাড়ায় ও ভিটামিন "বি" যৌগগুলি শরীরের রেচন পদ্ধতিতে প্রয়োজন হয়। সবুজ ও হলুদ রঙের সব্জী ভিটামিনের ভাল উৎস এবং এগুলি মোট প্রয়োজনের শতকরা 35 ভাগ ভিটামিন 'এ', শতকরা 25 ভাগ ভিটামিন 'সি' ও কিছু পরিমাণ ভিটামিন 'বি' সরবরাহ করে। টাট্কা সব্জীতে কতকগুলো ভিটামিন বেশী থাকে। কতগুলো আবার রান্নার সময় উত্তাপ পাওয়ায় নষ্ট হয়ে যায়।

সাধারণত যে সব সব্জী কাঁচা খাওয়া হয়, সেগুলোতে বেশী পরিমাণ ভিটামিন তো পাওয়া যায়ই উপরন্তু কিছু এনজাইমও পাওয়া যায় যা রেচন পদ্ধতিতে সাহায্য করে। পেঁয়াজ, মুলো, শশা, কাঁচা লংকা, বীট, গাজর, টমাটো, লেটুসপাতা, ধনেপাতা, পুদিনাপাতা ইত্যাদি অনেক সময় শ্যালাড্ হিসাবে বা অন্যভাবে অপরিবর্তিত অবস্থায় খাওয়া হয় এবং এদের থেকে ভাল রকম ভিটামিন পাওয়া যায়।

সমস্ত দিক বিচার করে একটিই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে উন্নয়নশীল দেশে চাষবাসে প্রগতি আনতে, সাধারণত মানুষকে ঠিকমত পুষ্টিকর খাবার জোগান দিতে, বেকারি দূর করতে ও চাষীদের অর্থনৈতিক উন্নতি করতে, সব্জী চাষের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বস্তুত কৃষি ক্ষেত্রে সব্জী চাষই জাতীয় জীবনে অর্থনৈতিক উন্নতি আনতে পারে, শিল্পের নবদিগন্ত খুলে দিতে পারে ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে কল্যাণময় সমাজ সৃষ্টি করতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সব্জী বাগান

সব্জী বাগানের প্রকারভেদ ঃ

সবজী বাগানের প্রকার, সব্জীর রকমফের, চাষের উপাদানের প্রতুলতা ও কতটা জমি চাষের জন্য নির্দিষ্ট, এগুলোর উপর নির্ভর করে। বাড়ী সংলগ্ন কিচেন গার্ডেন এর প্রকৃতি, ব্যবসায়িক চাষে নিযুক্ত ট্রাক-গার্ডেনের থেকে আলাদা। আবার এগুলিতে সব্জীর প্রকার, বীজ উৎপাদনের জন্য নিযুক্ত বাগানের থেকে আলাদা। সমস্ত দিক বিবেচনা করে বিজ্ঞানীরা সব্জী বাগানকে নিম্নলিখিত ছয়টি নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করেছেন।

(1) কিচেন গার্ডেন বা বাড়ী সংলগ্ন বাগান ; (2) মার্কেট গার্ডেন বা কাছাকাছি বাজারে সব্জী সরবরাহ করার জন্য বাগান ; (3) ট্রাক-গার্ডেন যেখানে সমস্ত সব্জী নিলামে বিক্রি করা হয় ; (4) গার্ডেন ফর ভেজিটেবিল প্রসেসিং বা সংরক্ষণ শিল্পের জন্য সব্জী উৎপাদনকারী বাগান ; (5) ভেজি-টেবিল ফোরসিং অর্থাৎ যেখানে কৃত্রিম উপায়ে, অসময়েও সব্জী উৎপাদন করা হয় ; (6) সব্জী বীজ উৎপাদনের জন্য বাগান।

প্রতিটি রকমের বাগানের নাম থেকে এগুলোর কার্যকারিতা কিছুটা বোঝা যায়। কিচেন গার্ডেন বা বাড়ী সংলগ্ন যে বাগান করা হয় তার জন্য খুব বেশী জায়গা পাওয়া যায় না। অল্প জমিতে নিবিড় পদ্ধতিতে রকমারী সব্জী চাষ করে পারিবারিক প্রয়োজন মেটান হয়। এখানে লাভ-ক্ষতির দিকে বেশী নজর না দিয়ে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দিকে বেশী নজর দেওয়া হয়। পরিবারের সকলেই কাজ করার ফলে নিয়মানুবর্তিতা বাড়ে, উৎপাদনমুখিনতা সৃষ্টি হয় ও উদ্বৃত্ত সময় কাজে লাগাবার সুযোগ পায়। তাছাড়া রোজ কিছুটা সময় কাজ করলে খানিকটা শারীরিক ব্যায়ামও হয়। প্রাত্যহিক জীবনের একঘেয়েমী কাটান সম্ভব হয়। শহরাঞ্চলে যেখানে মাটী পাওয়াই দুষ্কর সেখানে ছাদের উপর বা বারান্দাতে টবের মধ্যে ফুল ও সব্জী চাষ পাশাপাশি করা হয়। এদের বলা হয় রুফ বা বারান্দা গার্ডেন। আবার পাহাড়ী অঞ্চলে এদের বলা হয় টের‍্যাস গার্ডেন। জলা অঞ্চলে এদের বলা হয় ফ্লোটিং বা ভাসমান বাগান। কলকাতা প্রভৃতি বড় শহরে ছাদে ও বারান্দায় বাগান প্রায়ই দেখা যায়। আবার

দার্জিলিং-এর পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সিঁড়ির ধাপের মত টেরাস গার্ডেন বা বাগান হামেশাই চোখে পড়ে। কাশ্মীরের ডাল হ্রদে ভাসমান বাগান একটি সাধারণ দৃশ্য। মেহেতার (1959) মতে কিচেন গার্ডেন, বাল্য ও কৈশোরের নিয়মানুবর্তিতা ও সৌন্দর্য শিক্ষার আখড়া। চৌধুরীর মতে (1968) কিচেন গার্ডেন যুবকের জীবনে আনে বৈচিত্র্য। আর ভেঙ্কটরত্নমের (1963) মতে বৃদ্ধকে প্রয়োজনীয় ব্যায়ামের মাধ্যমে কিচেন গার্ডেন দেয় জীবনের সজীবতা।

বড় বড় শহরের উপকণ্ঠে (যেমন কলকাতার কাছে ধাপা, খড়দহ, চাকদহ, ইত্যাদি) প্রয়োজনীয় সব্জী সরবরাহের জন্য গড়ে উঠেছে এক ধরনের বাগান, যেগুলির মূল উদ্দেশ্য শহরে টাট্কা সব্জী সরবরাহ। এসব জায়গায় জমির উঁচু দর ও শ্রমিকের মজুরি বেশী হওয়া সত্ত্বেও চাষীরা ভাল দাম পায়। কেননা, সব্জী ভাল হলে শহরের লোকেরা বেশী দাম দিতে কার্পণ্য করে না। এসব বাগান থেকে সব্জী বাজারজাত করার খরচ অনেক কম। শহরের লোকেদের পছন্দমত বৈচিত্র্যময় টাট্কা সব্জীই এখানে উৎপন্ন করা হয়।

বাজার থেকে বেশ কিছুটা দূরে, রাস্তার ধারে, যেখানে একলপ্তে অনেকটা জমি সহজলভ্য অথবা যেখানে এমন একটা আবহাওয়া পাওয়া যায়, যাতে বিশেষ কোন সব্জী উৎপাদন সম্ভব ; অথবা চাষের সব উপাদানগুলো যথা— শ্রমিক, সেচ, সার ইত্যাদি সস্তায় পাওয়া যায়, যাতে করে দূর দূরান্তে সব্জী পাঠানোর খরচা পুষিয়ে যায় এমন জায়গাকেও অনেক সময় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সব্জী চাষের আওতায় আনা হয়। এসব ক্ষেত্রে সব্জীর বৈচিত্র্যের বদলে 2/1 রকমের সব্জী বেশী করে চাষ করা হয়। এবং অনেক ক্ষেত্রে পুরো খামারটি যান্ত্রিক চাষের আওতায় আনা হয়। তবে মূল যে ব্যাপারটি লক্ষ্য করার, তা হ'ল চাষী কোন সময়ই খুচরো বিক্রি না করে, পুরো ফসল নিলামে বিক্রি করে দেয়। নিলামে বিক্রি করার পদ্ধতি 'ট্রাকার' (ফরাসী) থেকেই ট্রাক গার্ডেন বা নিলামে বিক্রি করার জন্য সব্জী বাগান কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গাতে ট্রাক গার্ডেন পদ্ধতিতে কপির চাষ হতে দেখা যায়।

সংরক্ষণ শিল্পের নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর জন্য শিল্পাঞ্চলের কাছাকাছি অনেক সময় সব্জী বাগান করা হয়। এগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এখানে শিল্পের প্রয়োজনীয় বিশেষ ধরনের সব্জী উৎপাদন করা হয় এবং পুরো উৎপাদনটাই সংরক্ষণ শিল্প কিনে নেয়। উৎপাদনকারী এখানে শিল্পের প্রয়োজনীয় সব্জী অর্থাৎ তার উৎপাদন ও চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ প্রকার সব্জী

চাষ করে। এসব বাগানে ফসল বাজারজাত করার সমস্যা কম ও উৎপন্ন ফসল অবিক্রিত হওয়ারও সম্ভাবনা কম। কাজেই লোকসানের সম্ভাবনা ন্যূনতম। এই জাতীয় বাগানকে গার্ডেন ফর ভেজিটেবল প্রসেসিং বা সংরক্ষণ শিল্পের জন্য সব্জী বাগান বলা হয়।

উন্নত দেশে অসময়ের সব্জীর চাহিদা খুব বেশী। আবার উন্নত দেশের সব জায়গাতে প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য সব ফসল হয় না। বিভিন্ন উন্নত দেশে সারা বছর টোম্যাটো, শশা, মুলো এগুলোর চাহিদা থাকলেও উৎপাদন করার আবহাওয়া থাকে না বা অন্য দেশ থেকে আমদানী করা সম্ভব হয় না। কাজেই দেশের মধ্যেই কৃত্রিম উপায়ে এগুলো উৎপন্ন করার চেষ্টা করা হয়। সাধারণত, শীততাপ নিয়ন্ত্রণ কাঁচের ঘরেই এগুলো চাষ করা হয়। উৎপাদন খরচ বেশী পড়লেও ক্রেতারা অসময়ে টাট্কা সব্জীর মূল্য বেশী দিতে আপত্তি করে না। কৃত্রিম উপায়ে অসময়ে সব্জী চাষের পদ্ধতিকেই ভেজিটেবিল ফোরসিং বা অসময়ের সব্জী বাগান বলা হয়।

ভাল বীজ, সব্জী চাষের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কিছু বাগান শুধু সব্জী বীজ উৎপাদন করে। এদের গার্ডেন ফর ভেজিটেবিল সীড প্রোডাকশান বলা হয়। দার্জিলিং জেলার সোনাদা অঞ্চলে এরকম কিছু খামার বা বাগান আছে যারা ফুল ও বাঁধা কপির বীজ উৎপাদন করে। এছাড়া হিমাচল প্রদেশের কুলুমানালী ও কাট্রেণ, কাশ্মীরের শ্রীনগরে ও অন্যান্য অঞ্চলে অনেক সব্জী বীজ উৎপাদন ক্ষেত্র বা বাগান আছে। এছাড়া অনেক সরকারী খামারেও সব্জী বীজ উৎপাদন করা হয়। যেহেতু বীজের দাম অনেক বেশী, সহজে নষ্ট হয় না ও বেশী দিন ধরে রাখা যায়, তাই সব্জী থেকে ফলন কম হলেও বীজ উৎপাদন বাগান একটি লাভজনক ব্যবসা।

তৃতীয় অধ্যায়

সব্জীর শ্রেণী বিন্যাস

বিভিন্ন ধরনের সব্জীকে বিভিন্নভাবে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। বৈজ্ঞানিক বংশানুক্রম, চাষের সময়, পরিচর্যার পদ্ধতি, মৃত্তিকার ক্ষারত্ব বা অম্লত্বের প্রতি আসক্তি ও সব্জী বিশেষের ব্যবহার্য অংশের নামানুসারে এগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। শ্রেণী বিভাগের উদ্দেশ্য সব্জী বিশেষের বৃদ্ধির প্রকৃতি, রোগ ও পোকা প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্বন্ধে জানা এবং কৃত্রিম উপায় উচ্চ ফলনশীল সংকর বীজ তৈরীর জন্য পরাগ উৎপাদন, পরাগ মিলন ও বংশ তত্ত্ব সম্বন্ধে ঠিকমত জ্ঞাত হওয়া ও এগুলিকে ব্যবহারিক কাজে লাগানো। এছাড়া সব্জী চাষীদের সহায়তার জন্য আবহাওয়ার ও পরিচর্যার সাদৃশ অনুযায়ী সব্জী জগতকেও কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

উদ্ভিদবিদ্যা অনুযায়ী সব্জীর শ্রেণী বিভাগ ঃ

বিভিন্ন উদ্ভিদকে এদের প্রজনন অঙ্গের সাদৃশ্য অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা হয়। বিভাগ থেকে আরও নির্দিষ্টভাবে বংশ ও শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। একই বংশ বা শ্রেণীর উদ্ভিদের বেশ কিছু গুণগত সাদৃশ থাকে। অনেকের মধ্যে আবার অবাধ পরাগ সংযোগ হয়। ফুলের প্রকৃতি, পরাগ রেণু বিমোচন ও পরাগ মিলন সম্বন্ধে জানা থাকলে বিপরীত পরাগ মিলন ঘটিয়ে উচ্চ ফলনশীল সংকর জাত তৈরী করা যায়, যা আগেই বলা হয়েছে। উদ্ভিদের পুষ্টি, বৃদ্ধি, ইত্যাদি জানতেও উদ্ভিদ বিদ্যা অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ বৈজ্ঞানিকদের প্রভুত সাহায্য করে। প্রচলিত সব্জীগুলিকে প্রথমে চারটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায় যথা—(1) থ্যালোফাইটা, (2) ব্রাইওফাইটা, (3) টেরিডোফাইটা ও (4) স্পারম্যাটোফাইটা।

(1) **থ্যালোফাইটা**—প্রধানত শেওলা ও ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এদের কোন শক্ত কাণ্ড থাকে না। বেশীর ভাগই পরজীবী। এই গোষ্ঠীর মধ্যে খুব বেশী সব্জী দেখা যায় না। ব্যাঙের ছাতা (*Agaricus Spp*) এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

(2) **ব্রাইওফাইটা**—মস জাতীয় উদ্ভিদ এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই গোষ্ঠীতে বিশেষ সব্জী না পাওয়া গেলেও, বর্তমানে কতগুলি সামুদ্রিক মস

(*Moss*) যেমন—লাল এ্যালগি এবং সবুজ এ্যালগিতে প্রচুর উদ্ভিদ আমিষ আছে বলে জানা গেছে এবং এগুলো মানুষের খাবার হিসাবে ব্যবহার করা যায়, বিশেষত জাপানে এগুলোর ব্যবহার করা হচ্ছে।

(3) টেরিডোফাইটা—ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই গোষ্ঠী থেকে বিশেষ সব্জী পাওয়া যায় না। ঢেঁকিশাক এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

(4) স্পারম্যাটোফাইটা—সমস্ত উদ্ভিদ এই গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে। কাজেই প্রচলিত সমস্ত সব্জীও এই গোষ্ঠীর আওতায় এসে যায়। এই গোষ্ঠীর উদ্ভিদ গুলিকে আবার দুটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশে সেইসব উদ্ভিদ পড়ে যাদের ভ্রূণে কোন আবরণ থাকে না। এই অংশকে জিমনোস্পার্ম বলা হয়। অন্য অংশ এনজিওস্পার্মে ভ্রূণে আবরণযুক্ত উদ্ভিদ দেখা যায়। প্রায় সব সব্জীই দ্বিতীয় অংশের অন্তর্গত। এনজিওস্পার্মকে আবার দুটি বিভাগে ভাগ করা যায় যথা—মনোকট বা একবীজপত্রী ও ডাইকট বা দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদ। একবীজপত্রী বিভাগে বেশ কিছু সব্জী থাকলেও বেশীর ভাগ সব্জী দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্গত। প্রতিটি বিভাগ আবার কতকগুলি সব্জী পরিবার নিয়ে গঠিত। পরিবারগুলি, অণুপরিবার বর্ণ ও একক উদ্ভিদের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি বিভাগের অন্তর্গত পরিবার ও পরিবারস্থ সব্জী বিশেষের নাম নীচে দেওয়া হল।

একবীজপত্রী সব্জী :

যে সব উদ্ভিদের একটি বীজপত্র থাকে তাদের একবীজপত্রী উদ্ভিদ বলে। এই বিভাগের সাতটি পরিবার থেকে অনেকগুলি সব্জী পাওয়া যায়। পরিবারের নাম ও তাদের অন্তর্গত সব্জী নীচে দেওয়া হল।

(1) এমারিলিডেসি (Amaryllidaceae)—পেঁয়াজ (*Allium cepa*), রসুন (*Allium sativun*) এবং লীক (*Allium porrum*) এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এদের কাণ্ড খুব ছোট। খোসার মত পাতা দিয়ে শাখা মুকুল ঢাকা থাকে। সবগুলি বর্ষজীবী উদ্ভিদ।

(2) এ্যারেসি (Araceae)—বিভিন্ন ধরনের কচু (*Colocasia spp.*) এই পরিবারের অন্তর্গত। কাণ্ড মাটির নিচে জন্মায়। সাধারণত কাণ্ড ছেদ করে বংশ বৃদ্ধি করান যায়। বর্ষজীবী উদ্ভিদ। সবগুলিতেই প্রচুর শর্করা পাওয়া

যায়। বেশীর ভাগ কচুতেই প্রচুর র‍্যাফাইড (*raphide*) থাকার জন্য মুখ চুলকোতে পারে। এগুলি ক্যালসিয়াম বা চুন জাতীয় খনিজের ভাল উৎস।

(3) এরোইডি (Aroideae)—এই পরিবারের মধ্যে সব্জীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ওল (*Amorphophallus Companulatus*)। কচুর প্রায় সব গুণই ওলের মধ্যে বর্তমান। কান্ড বিভাজন করে বংশ বৃদ্ধি ঘটান হয়, বর্ষজীবী উদ্ভিদ।

(4) ডায়সকরেসী (Dioscoreaceae)—খামালু (*Dioscorea alata*) এই পরিবারের প্রধান সব্জী। প্রভুত পরিমাণ শর্করা ছাড়াও খামালুর মধ্যে অনেক ঔষধি গুণ বর্তমান। খামালুর গাছ লতানো ও বর্ষজীবী। কান্ড কেটে বংশ বৃদ্ধি ঘটান হয়।

(5) গ্র্যামিনেসী (Graminaceae)—শস্য হিসাবে অনেক উদ্ভিদ দেখা গেলেও, ভুট্টা (*Zea mays*) ছাড়া অন্য সব্জী এই পরিবার থেকে পাওয়া যায় না। বীজের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি হয়। গাছ বর্ষজীবী। ভুট্টার মধ্যে দুইটি প্রকার যথা—মিষ্টি ভুট্টা (*Sweet corn Zea mays var rugosa*) ও পপ কর্ণ (*Pop corn Zea mays var everata*) এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

(6) লিলি পরিবার (Lilliaceae)—এই পরিবারের উল্লেখযোগ্য সব্জীর নাম শতমূলী (*Asparagus officinalis*)। এর মূলগুলি মাটীর নিচে জন্মায়। গাছ বহুদিন বাঁচে। মূলগুলি সংগ্রহ করে সব্জী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। উৎকৃষ্ট সব্জীর মধ্যে শতমূলীর নাম উল্লেখযোগ্য।

(7) কদলী পরিবার (Musaceae)—এই পরিবারের কিছু প্রজাতি সুস্বাদু ফল উৎপাদন করে। আবার কিছু প্রজাতির ফল পাকলেও সুস্বাদু হয় না, পরন্তু কাঁচা অবস্থায় সব্জী হিসাবে ব্যবহারের উপযোগী। এছাড়া প্রায় বেশীর ভাগ প্রজাতির ফুল ও কান্ড সব্জী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কাঁচা কলা (*Musa paradisiaca*) এ রকম ফলের একটি উদাহরণ। এছাড়া মর্তমান ও কাঁচা কলা জাতীয় প্রজাতির ফুল অর্থাৎ মোচাও উৎকৃষ্ট সব্জী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। থোড় বা কান্ডও ভাল সব্জী।

সব্জী হিসাবে ব্যবহৃত দ্বি-বীজ-পত্রী উদ্ভিদগুলিকেও কতগুলি পরিবারে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক পরিবারে আবার বেশ কিছু উদ্ভিদ প্রজাতি দেখা যায়, যা সুস্বাদু সব্জী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পরিবার অনুযায়ী বিভাগ ও পরিবারের অন্তর্গত প্রজাতির নাম নীচে দেওয়া হল ঃ

(1) এ্যাজয়েস (Aiozoaceae)—উল্লেখযোগ্য প্রজাতির নাম নিউজিল্যান্ড পালং (*Tetragonia expensa*)। বর্ষজীবী উদ্ভিদ। বীজের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি হয়।

(2) **নটে পরিবার** (Amaranthaceae)—লালশাক, কাটোয়াডাঁটা, চম্পাডাঁটা (*Amaranthus spp.*) এবং চাওলি জাতীয় শাক (*Alternanthera onoena*) এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। নটে পরিবারের প্রায় সব গাছই ভারতীয় জল হাওয়ায় ভাল বাড়ে ও নিরামিষ আহারীদের আমিষ খাদ্যোপাদনের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস। এগুলি বর্ষজীবী উদ্ভিদ। বীজের মাধ্যমে সব্জীটির বংশ বৃদ্ধি ঘটানো হয়।

(3) পুঁই পরিবার (Basellaceae)—পুঁই শাক যার আবার অনেকগুলি প্রজাতি আছে যা এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। সাদা বা সবুজ পুঁই (*Basella alba*) ও লাল পুঁই (*Basella rubra*) এই দুই প্রজাতি ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে বহুল প্রচলিত। পুঁই গাছ বহুদিন বাঁচে। বীজ থেকে চারা তৈরী করে বা অঙ্গ বিভাজনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করা হয়। গাছ লতানো হওয়ায় মাচাতে ভাল হয়।

পুঁই গাছের সবটাই মানুষের খাবার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পুঁই শাকে বেশ কিছুটা আমিষ খাদ্যোপাদান থাকে এবং যারা প্রাণীজ আমিষ গ্রহণ করে না তাদের জন্য আমিষ আহারের ভাল উৎস।

(4) পালং **পরিবার** (Chenopodiaceae)—পালং (*Spinacia oleracea*), পাহাড়ী পালং (*Artiplex hortensis*), বীট (*Beta vulgaris*) ও বেথুয়াশাক (*Chenopodium album*) এই পরিবারভুক্ত সব্জী। এগুলোর মধ্যেও আমিষ খাদ্যোপাদান ভালই আছে। সবগুলিই বর্ষজীবী এবং বীজের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি হয়।

(5) **কমপোজিট** (Compositeae)—কুসুম (*Carthamus tinctorius*) ও লেটুসপাতা (*Lactuca sativa*) ভারতীয়দের কাছে বহুল পরিচিত সব্জী। এছাড়াও শীত প্রধান দেশে চিকোরী (*Cichorium intybus*), আর্টিচোক (*Cynara scolymus*) ও এনডিভ-এর (*Cinchorium endivia*) যথেষ্ট চাষ হয় ও সব্জী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এগুলি প্রধানত বর্ষজীবী। ভারতীয় সমতলে শীতকালে চাষ হতে পারে।

(6) **কনভলভিউলেসী** (Convolvulaceae)—মিষ্ট আলু (*Ipomoea batatus*) এই পরিবার ভুক্ত সব্জী। এর থেকে প্রচুর পরিমাণে শর্করা জাতীয়

খাদ্যোপাদান পাওয়া যায়। বীজ ও লতার মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি হয়। গাছ সাধারণতঃ বর্ষজীবী ও লতানে। মিষ্টি আলু মাটীর নীচ থেকে সংগ্রহ করতে হয়।

(7) **কপি পরিবার** (Crucifereae) নাম থেকেই বোঝা যায় নানান ধরনের কপিকে এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফুলকপি *(Brassica oleracea var botrytis)*, বাঁধাকপি *(B, oleracea var capitata)*, ওলকপি *(B. coulorapa)*, শালগম *(B. compestris)*, হালিম শাক *(Nasturtium officinalis)*, মুলো *(Raphanus sativus)*, সরষে শাক *(B. juncea)* ভারতীয়দের কাছে বিশেষ পরিচিত। এছাড়া ব্রকোলী *(B. oleracea var italica)* রুটাবাগা *(B. napus var Napobrassica)*, ব্রুশেলস্ স্প্রায়ুট *(B. oleracea var gemmifera)* ও কেল *(B. oleracea ver acephala)* সব্জী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই পরিবারে প্রায় সব সব্জীই শীতকালে চাষ হয়। শেষের সব্জীগুলি প্রধানত শীত প্রধান দেশে চাষ হয়। সাধারণত ইতর পরাগ মিলন দেখা যায় এবং এই মিলন বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সংঘটিত হতে পারে। বর্ষজীবী উদ্ভিদ এবং বীজের মাধ্যমে এগুলির বংশবৃদ্ধি হয়। একমাত্র মুলো গরম কালে হতে দেখা যায়। কিছু সবজী দ্বি-বর্ষজীবী।

(8) **কুষ্মান্ড পরিবার** (Cucurbitaceae)—কুষ্মান্ড পরিবারভুক্ত বেশীর ভাগ সব্জীই গরম কালে চাষ করা হয়। কিছু সব্জী শীতকালেও চাষ করা হয়। অধিকাংশ সব্জীই ঋতুজীবী হলেও কিছু সব্জী একাধিক বর্ষ বেঁচে থাকে। এই পরিবারের কিছু গাছে পুরুষ ফুল ও স্ত্রীফুল আলাদাভাবে ফুটতে দেখা যায়। কিছু প্রজাতির পুরুষ গাছ ও স্ত্রী গাছ আলাদা, আবার অনেক ক্ষেত্রে একই ফুলে পুরুষ ও স্ত্রী জননেন্দ্রীয় বিদ্যমান। ইতর পরাগ মিলনই স্বাভাবিক নিয়ম। কুষ্মান্ড পরিবারের সব সব্জীই ভারতীয়দের অতি পরিচিত। ঝিঙে *(Luffa acutangula)*, ধধুল *(L. cylindrica)*, টিণ্ডা *(Citrullus vulgaris var fistulosus)*, চালকুমড়া *(Benincasa hispida)*, উচ্ছে ও করলা *(Momordica charantia)*, শশা বা ক্ষীরা *(Cucumis sativus)*, কাঁকরী *(C. melo, var, utilissimus)*, লাউ *(Lagenaria siceraria)* ও চিচিঙ্গা *(Tricosanthes anguina)* প্রভৃতি গরম কালে উৎপন্ন হয়।

অন্যদিকে কুয়াস *(Cucurbita pepo)*, খরমুজ *(C. melo var. reticulata)* ও তরমুজ *(Citrullus vulgaris)* প্রভৃতি শীতকালে চাষ আরম্ভ হয়।

কিছু সব্জী যেমন পটল (*Trichosanthus dioeca*), কুদরী (*Coccinea cordifolia*), কাঁকরোল (*Momordica cochinchinensis*) প্রভৃতি গোটা বছর চাষ হতে দেখা যায় ও গাছ এক বছরের বেশী বাঁচে। মিষ্টি কুমড়োর (*Cucurbita moschata*) গাছ গোটা বছর না বাঁচলেও বছরের সব সময়ই এর চাষ হয়। পটল, কুঁদরী ও কাঁকরোল সাধারণত মূলের সাহায্যে বা অঙ্গ বিভাজন করে বংশ বৃদ্ধি ঘটানো হয়। অন্যগুলির বীজের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি ঘটে। এই পরিবারের অন্তর্গত সব সব্জী গাছই লতানো।

(9) চালতা পরিবার (Dilleniaccae)—এই পরিবারের একমাত্র চালতা (*Dillenia indica*) সব্জী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বেশ বড় গাছ, বহুদিন বাঁচে।

(10) ইউফরবিয়েসী (Euphorbiaceae)—পশ্চিমবঙ্গে বা উত্তর ভারতে বিশেষ ব্যবহৃত না হলেও সমগ্র দক্ষিণ ভারতে টোপিয়োকা (*Manihot esculenta*) এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত একটি অতি প্রচলিত সব্জী। মূলত শর্করা সরবরাহকারী এটি একটি উচ্চ ফলনশীল কন্দ ফসল। এর গাছ বর্ষজীবী ও অঙ্গবিভাজনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি হয়।

(11) শিম্বী পরিবার (Leguminoseae)—উদ্ভিদজ আমিষ সরবরাহকারী প্রধান পরিবার। আগেই বলা হয়েছে এই পরিবারের দু একটি উদ্ভিদ থেকে যথেষ্ট চর্বি বা তৈল জাতীয় খাদ্যোপাদানও পাওয়া যায়। এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত উদ্ভিদগুলির নাম লীমা বীন (*Phaseolus lunatus*), ফরাসবীন (*Phaseolus vulgaris*), সয়াবীন (*Glycine max*), মটর শুঁটী (*Pisum sativum*), চীনে বাদাম (*Aracis hypogea*), সীম (*Dolichos lab lab*), বরবটী বা লোবিয়া (*Vigna sinensis*), জ্যাকবীন (*Canavalia ensiformis*), মাখন সীম (*Canavalia gladiata*), মেথী (*Trigonella Foenum Graecum*), চম্পা মেথী (*Trigonella cornaculata*), কাঞ্চন ফুল (*Boehinia alba*), বক ফুল (*Sesbania grandiflora*), তেতুঁল (*Tamarindus indica*), শাঁখালু (*Paccharynas angulatus*), বুনো সীম (*Canavalia carthertica*), করঞ্জা (*Deris indica*) ও উইন বীন (*Psophocarpus tetragonolobus*)। কাঞ্চন, বক ও তেতুঁল ছাড়া অন্য সবগুলিই বর্ষজীবী এবং বীজের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি হয়। এছাড়া প্রায় সবগুলিই লতানে গাছ।

(12) **মালভেসী** (Malvaceae)—ঢেঁড়স (*Abelmoschus eseulentus*) এই পরিবারের একমাত্র প্রচলিত সব্জী। এই পরিবারের অন্যান্য উদ্ভিদ সব্জী হিসাবে ব্যবহৃত না হলেও অন্য কাজে লাগে।

(13) **নিম পরিবার** (Maliaceae) নিম গাছ (*Azadirachta indica*) প্রকৃত পক্ষে বৃহৎ গাছ হিসাবে পরিচিত হলেও এর পাতা, যা দ্রব্য গুণে পরিপূর্ণ, ভারতীয় বিশেষত বাঙ্গালীদের বিশেষ প্রিয়।

(14) **ডুমুর পরিবার** (Moraceae)—ডুমুর (*Ficus recemosa*) একটি ভাল সব্জী। এতে প্রচুর লৌহ জাতীয় খনিজ পদার্থ আছে।

(15) **সজনে পরিবার** (Moringaceae)—সজনে (*Moringa oleifera*) গাছের পাতা ও ডাঁটা (ফল) সব্জী হিসাবে বিশেষ পরিচিত ও দ্রব্য গুণে পরিপূর্ণ। সাধারণ ভারতীয়দের কাছে সজনেশাকের যথেষ্ট সমাদর দেখা যায়।

(16) **পলিগনেসী** (Polygonaceae)—টক পালং (*Rumex Acetosa*), ও রুহার্ব (*Rheum Rhaponticum*) এই দুটি প্রধান সব্জী এই পরিবার থেকে পাওয়া যায়।

(17) **রুটেসী** (Rutaceae)—কারীপাতা (*Murraya chalcas*) দক্ষিণ ভারতীয়দের কাছে একটি আবশ্যকীয় সব্জী, যদিও মূলত এটি সব্জীর গন্ধ বৃদ্ধিকারী মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(18) **আলু পরিবার** (Solanaceae)—এই পরিবারভুক্ত অনেকগুলি উদ্ভিদ সব্জী সরবরাহ করে। আবার এই পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন রকমের সব্জীও পাওয়া যায়, যাদের কারও মধ্যে প্রচুর শর্করা আছে, কারও মধ্যে প্রচুর ভিটামিন "সি" আছে ; আবার কারও মধ্যে প্রচুর ভিটামিন "বি" আছে। আলু (*Solanum tuberosum*), টোম্যাটো (*Lycopersicon lycopersicum*), বেগুন (*Solanum melongena*), ধানী লংকা (*Capsicum annuum*), ও লংকা (*Capsicum frutescens*) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কাণ্ড বিভাজন ও বীজের মাধ্যমে, বর্ষজীবী এই উদ্ভিদের চাষ করা হয়।

(19) **পাট পরিবার** (Tiliaceae)—এর মধ্যে একটি শাক জাতীয় সব্জী পূর্বভারতে বিশেষ পরিচিত। এটি পাট শাক বা মিঠা পাট (*Corchorus olitorius*) এর অন্তর্ভুক্ত সব্জী। বীজের সাহায্যে গ্রীষ্মকালে চাষ করা হয়।

(20) **আম্বেলীফেরী** (Umbelliferae)—বেশ কিছু শীত প্রধান দেশের সব্জী এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এদের বৈশিষ্ট্য হল ফুল ফুটলে পুষ্প বিন্যাস দেখতে অনেকটা ছাতার মত। এই জাতীয় সব্জীগুলি থেকে প্রচুর ভিটামিন "এ" ও "বি" পাওয়া যায়। গাজর (*Daucus carota*), সেলারী (*Apium groveolens*), পারশনীপ (*Pastinaca sativa*), পারশুলে (*Petroselinum crispum*) এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

আগেই বলা হয়েছে, উদ্ভিদ বিদ্যা ব্যাতিরেকেও সব্জী জগৎকে কতকগুলি বিভাগে ভাগ করা যায়। এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে মূলত (1) আবহাওয়া অনুযায়ী, (2) চাষের পদ্ধতি অনুযায়ী, (3) সব্জী হিসাবে ব্যবহার অনুযায়ী ও (4) মৃত্তিকার সহনশীলতা অনুযায়ী বিভাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আবহাওয়া অনুযায়ী সব্জীর শ্রেণী বিভাগ ঃ

বস্তুত শৈত্য সহনশীলতার উপর ভিত্তি করেই এই বিভাগ করা হয়েছে। দেখা গেছে শীতকালীন সব্জীগুলির শৈত্য সহনশীলতা বেশী ; এদের বাড় খুব বেশী নয় ; নাইট্রোজেনঘটিত সার দিলে ও সেচ দিলে উপকার পাওয়া যায়। শীতের মধ্যেও অঙ্কুরোদ্গাম হয় এবং স্বল্প ও অগভীর মূল দেখা যায়। গ্রীষ্মকালীন সব্জীগুলির মধ্যে প্রচুর জলীয় পদার্থ থাকে যা শীতকালীন সব্জীর জলীয় পদার্থ অপেক্ষা বেশী। প্রচুর পরিমাণে অপেক্ষাকৃত গভীর মূল দেখা যায়। বর্ষজীবী সব্জীগুলিকে (ক) শীতকালীন ও (খ) গ্রীষ্মকালীন, প্রধানত এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(ক) **শীতকালীন সব্জী ঃ** শীতকালীন সব্জী 45°-75° ফাঃ উষ্ণতা সহ্য করতে পারলেও মোটামুটি 70° ফাঃ উষ্ণতায় ভাল হয়। এগুলির মধ্যে কিছু স্বল্পজীবী ও কিছু অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ মেয়াদী। শালগম, মুলো, গাজর, ওলকপি, ইত্যাদি সব্জীকে স্বল্পজীবী বলা হয়। এগুলি দেড় থেকে তিন মাসের মধ্যে উৎপন্ন হয়। আবার ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রুসেলস্ স্প্রাউট, লেটুস, বীট, ইত্যাদি উৎপন্ন হতে তিন মাসের বেশী সময় লাগে ; ফুল আসতে ও বীজ উৎপাদন করতে অনেক সময় এক বছর বা তার বেশী সময় লাগে। এছাড়া পেঁয়াজ, রসুন, প্রভৃতি সব্জীর প্রথম অবস্থায় ঠাণ্ডা আবহাওয়ার দরকার হলেও শেষের দিকে উষ্ণ আবহাওয়া না থাকলে ভাল ফলন হয় না। এগুলি প্রধানত 55°-75° ফাঃ উষ্ণতায় ভাল ফলন দেয়।

(খ) গ্রীষ্মকালীন সব্জী ঃ এই শ্রেণীর সব্জী বীজের ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে ভাল অঙ্কুরোদ্গম হয় না। সাধারণত 60°—120° ফাঃ উষ্ণতায় জন্মালেও, 80° ফাঃ উষ্ণতা এগুলির জন্য আদর্শ। এগুলির মধ্যেও কিছু সব্জী যেমন শশা, ঢেঁড়স, বেগুন, ইত্যাদি সব্জী 70° ফাঃ উষ্ণতায় ভাল ফলন দেয়। আর কিছু সব্জীর প্রথম অবস্থায় গরম আবহাওয়া লাগলেও পরে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা আবহাওয়া প্রয়োজন হয়। মিষ্টি ভুট্টা, আলু, টোম্যাটো, মিষ্টি আলু, ফরাস-বীন, ইত্যাদি এই শ্রেণীতে পড়ে। এগুলির প্রথম অবস্থায় 70°—80° ফাঃ উষ্ণতা প্রয়োজন হলেও পরে শস্য উৎপাদনের জন্য 65° ফাঃ উষ্ণতা দরকার হয়।

বর্ষজীবী ছাড়াও কিছু সব্জী আছে যেগুলি উৎপন্ন হতে এক বছরের বেশী সময় লাগলেও গরম না পড়লে ঠিকমত উৎপাদন করা যায় না। যেমন পটল, ওল ইত্যাদি। শীতকালে এদের গাছ প্রায় মৃত অবস্থায় থাকে। গরম পড়লে সব্জী হতে আরম্ভ করে বা ফলন দেয়।

চাষের পদ্ধতি অনুযায়ী সব্জীর শ্রেণী বিভাগ ঃ

শস্য উৎপাদনের পদ্ধতি অনুসারেও সব্জীগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যে সব সব্জীর একই ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি সেগুলিকে একই শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এ ধরনের শ্রেণী বিভাগে চাষীরা বিশেষ উপকৃত হয়। চাষীদের চাষের পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ বিব্রত হতে হয় না। একই শ্রেণীভুক্ত সব্জীগুলি একই পদ্ধতিতে চাষ করা চলে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী সব্জীগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

(1) কোল শস্য—ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, ইত্যাদি।

(2) শাক-সব্জী—পালং শাক, লেটুসপাতা, ইত্যাদি।

(3) লতানে সব্জী—শশা, লাউ, টিণ্ডা, মিষ্টি কুমড়ো, ধধুল, ঝিঙে, উচ্ছে, গিমি কুমড়ো, চিচিঙে, পটল, ইত্যাদি।

(4) ফল সব্জী—টোম্যাটো, বেগুন, ঢেঁড়স, লংকা, ইত্যাদি।

(5) মূল সব্জী—মূলো, বীট, গাজর, শালগম, মিষ্টি আলু, খামালু, ইত্যাদি।

(6) কন্দ সব্জী—আলু, কচু, মান কচু, ওল, ইত্যাদি।

(7) সাল্যাড সব্জী—লেটুস, সেলারী, পারস্‌লে, ক্রেস্‌, লীক, ইত্যাদি।

(8) ডাল জাতীয় সব্জী—মটরশুঁটি, ফরাসবীন, সীম, বরবটী, লীমাবীন,, মাখন সীম, ইত্যাদি।

(9) বাল্ব জাতীয় সব্জী—পেঁয়াজ, রসুন, ইত্যাদি।

(10) বহু বর্ষজীবী সব্জী—টোপিওকা, শতমূলী, সজনে, চালতা, ইত্যাদি।

ব্যবহার্য অংশ অনুযায়ী সব্জীর শ্রেণী বিভাগ :

সাধারণত সব্জীর যে অংশ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়, সেই মতও সব্জী জগতের শ্রেণী বিভাগ করা যেতে পারে। যেমন যে গাছের ফুল সব্জী হিসাবে ব্যবহার করা হয় সেগুলিকে ফুল সব্জী বলা যেতে পারে। একইভাবে ডাঁটা সব্জী, মূল সব্জী, ফল সব্জী ও শাক সব্জী ইত্যাদি শ্রেণী বিভাগ হতে পারে। তবুও এগুলির মধ্যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যাতিরেকে একটি ব্যবহারিক পারমপর্য্য দেখা যায়। শ্রেণী বিভাগগুলি নিচে দেওয়া হল।

(1) ফুল—ফুলকপি, বক ফুল, ব্রকোলী, ইত্যাদি।

(2) মূল ও কন্দ—আলু, মিষ্টি আলু, বীট, গাজর, মুলো, শালগম, কচু, মান কচু, খামালু, টেপিয়োকা, ওল, পেঁয়াজ, রসুন, ইত্যাদি।

(3) ফল—লংকা, বেগুন, পটল, শশা, কুমড়ো, লাউ, চাল কুমড়ো, ঢেঁড়স, বীন, টিণ্ডা, স্কুয়াস, ইত্যাদি।

(4) ডাঁটা—কুমড়ো বা লাউ ডাঁটা, কাটোয়া ডাঁটা, চম্পা ডাঁটা, ইত্যাদি।

(5) পাতা (শাক)—মেথি, ধনে পাতা, পালং, বাঁধাকপি, সরষে শাক, লেটুস, নটে, চাউলী, পিরিং, বেথুয়া, ইত্যাদি।

মৃত্তিকার প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী সব্জীর শ্রেণী বিভাগ :

নানা অভিজ্ঞতা ও গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেছে বিভিন্ন সব্জীর বৃদ্ধি ও উৎপাদন মৃত্তিকার প্রতিক্রিয়ার সাথে যুক্ত। অর্থাৎ কোন সব্জী অম্ল মাটিতে ভাল হয়। আবার কোনটা ক্ষার মাটিতে ভাল হয়। আবার দেখা যায় কিছু সব্জী অম্ল বা ক্ষার নিরপেক্ষ। এই শ্রেণী বিভাগের মাধ্যমে চাষী কোন্ জমিতে কোন্ সব্জী চাষ করবে তার মোটামুটি একটা আন্দাজ পেয়ে যায়। এবং সব্জী বিশেষ চাষ করার জন্য নির্দিষ্ট জমি নির্বাচন করে নিতে পারে।

পরিসংখ্যান—4 : মৃত্তিকার প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী সব্জীর শ্রেণী বিভাগ।

অম্ল মাটির সব্জী	অল্প অম্ল মাটির সব্জী	নিরপেক্ষ মাটির সব্জী	ক্ষার মাটির সব্জী
আলু, মুলো, মিষ্টি আলু, টোম্যাটো, খামালু, চিকোরী, রুহার্ব, টেপিওকা, বীন, স্কুয়াস, গাজর, শালগম, রসুন, ইত্যাদি।	বীট, ওলকপি, মুলো, ফুলকপি, লংকা, পালং, ঢেঁড়স, পেঁয়াজ, আলু, বেগুন, কাঁকরোল, শতমূলী, ইত্যাদি।	বাঁধাকপি, লেটুস, ঢেঁড়স, পেঁয়াজ, শশা, কুমড়ো, লাউ, ধুধুল, ঝিঙে, উচ্ছে, পটল, ব্রোকালী, ইত্যাদি।	তরমুজ, ঢেঁড়স, লংকা, নটে, উচ্ছে, পটল, ঝিঙে, ডাঁটা, মেথী, ধনে, কুঁদরী, শশা, ইত্যাদি।

বীজ

বীজ উৎপাদন—প্রাক স্বাধীনতা আমলে, ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে সামান্যই বীজ উৎপাদিত হত। বেশীর ভাগ বীজই ভারতের বাইরে থেকে আমদানী করা হত। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় বীজ আমদানির অসুবিধা হ'তে লাগল। কাজেই ভারতের নানান জায়গায় কয়েকটি সব্জী বীজ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরী করা হ'ল। কিন্তু ভারত বিভাগের সময় আবার এই কেন্দ্রগুলির কয়েকটি পাকিস্থানে চলে যাওয়ায় অসুবিধা হতে লাগল। এমতাবস্থায়, কিছু কিছু বেসরকারী বীজ উৎপাদনকারী সংস্থা অর্ন্তদেশীয় চাহিদার জোগান দিত। এদের মধ্যে কলকাতার "সাটন এণ্ড সন্স" ও "গ্লোব নার্শারী" এবং পুনার "পোচা", ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। "এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটি" যৌথ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য। ভারতে এদের অনেকগুলি শাখা ছিল। তবে কলকাতার সোসাইটি সর্বাপেক্ষা পুরাতন। সরকারী স্থাপনায় দু-একটি বীজ উৎপাদন খামারও প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের মধ্যে "কালিম্পং সরকারী সব্জী খামারের" নাম উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

পরবর্তীকালে সব্জী বীজের চাহিদা বাড়ার সাথে সাথেই ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ "সমন্বিত সব্জী উন্নয়ন প্রকল্প" চালু করে ও বীজ উৎপাদনের জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রচেষ্টা চালায়। বিপননের জন্য 'জাতীয় বীজ নিগম' সৃষ্টি করে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও "রাজ্য বীজ নিগম" তৈরী করেছেন। যার মূল উদ্দেশ্য হ'ল প্রচুর পরিমাণে উন্নত মানের ভাল বীজ উৎপাদন করে ন্যায্য দামে চাষীর প্রয়োজন মেটান।

ভাল বীজ ঃ

সব্জী চাষে ভাল বীজ এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, যদিও সব্জী চাষের সমগ্র খরচের পরিপ্রেক্ষিতে বীজের মূল্য অত্যন্ত নগণ্য। ভাল বীজ না পেলে চাষীর সমস্ত দক্ষতা ও প্রচেষ্টা নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় বীজকে "ঢাকনা বন্দী" গাছ বা সুপ্ত গাছ বলা হয়। ছোট অবস্থায় গাছটি থাকার জন্য একে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। আবার উপযুক্ত পরিবেশ, অর্থাৎ জল, বায়ু ও তাপ পেলে বীজ পূর্ণ গাছে পরিবর্তিত হতে পারে। কাজেই বীজের ক্ষমতা তার বংশগতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। বীজ একবার উৎপাদিত হয়ে গেলে সাধারণভাবে সেটির আর বংশগতি পরিবর্তন করা

যায় না। বংশগতি পরিবর্তন করতে হলে বীজ উৎপাদনের আগেই অথবা উৎপাদিত হওয়ার পর বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে করা হয়। তবে প্রাকৃতিক পরিবেশ কিছুটা পরিবর্তন করা যায়। উৎপাদনের উপাদান, যেমন সার, সেচ, ইত্যাদির কিছু উন্নতিসাধন করে ও পরিবেশ পরিবর্তন করে, বীজের বংশগতির পূর্ণ প্রকাশ ঘটানো সম্ভব। কাজেই ঠিকমত উৎপাদন পেতে হলে, শুধু উপযুক্ত পরিবেশ দিলেই হবে না, এর সাথে চাই বীজের উৎপাদনশীল বংশগতি। চাষীকে বীজ কেনার আগে, তাই নির্দিষ্টভাবে বীজের শ্রেষ্ঠত্ব, উৎপাদনশীলতা, শুদ্ধতা, ইত্যাদি সমন্ধে জেনে নিতে হবে। ভাল ফসল উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায় হচ্ছে ভাল বীজ সংগ্রহ।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ভাল বীজ কি? ভাল বীজ এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকবে এবং এগুলো ঠিকমত পরিপূরণ হলেই, সেগুলিকে ভাল বীজ বলে ধরা হবে। ভাল বীজের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নামের সাথে সামঞ্জস্য, অর্থাৎ বীজের যে জাত লেখা থাকবে, বীজ থেকে উৎপন্ন গাছের বৈশিষ্ট্যগুলি সেই জাতের অনুরূপ হবে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বীজ ভেজালমুক্ত হবে, অর্থাৎ অন্য জাতের বীজের অথবা অন্য ধরনের সব্জী বীজের সাথে মেশানো থাকবে না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় পুষা রুবি টোম্যাটো বীজ এর সাথে অন্য কোন জাতের টোম্যাটো বীজ অথবা টোম্যাটো জাতীয় অন্য কোন ফসলের বীজ মেশান থাকবে না। তৃতীয়ত বীজের দাম, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের কাছেই, ন্যায্য হতে হবে। অর্থাৎ ভাল বীজ বলে বিক্রেতা ক্রেতাকে শোষণ করবে না। আবার ক্রেতাও বিক্রেতাকে ঠকাবে না। চতুর্থত, বীজ রোগ বা পোকার আক্রমণমুক্ত হবে। পঞ্চমত, বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কম হওয়া চলবে না, অর্থাৎ সাধারণভাবে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কোন মতেই শতকরা 80 নীচে হবে না।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকলেই বীজগুলিকে উৎকৃষ্ট বীজ বলা যাবে। বীজের উৎকর্ষ বাড়ানোর জন্য উৎপাদনের প্রথম অবস্থা থেকেই চাষীকে সতর্ক থাকতে হয়। প্রতিটি জাতের সব্জী বীজ আলাদাভাবে সংগ্রহ, শোধন ও সংরক্ষণ করা দরকার। উৎপাদন, শোধন, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বিপননের সময় যাতে কোন রকম সংক্রমণ, সংমিশ্রণ বা জলের বা আর্দ্রতার সংস্পর্শে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ দরকার। সঠিক বীজ পেলে যেমন উৎপাদনের নিশ্চয়তা ও লাভ বাড়ে, বীজ সঠিক না হলে তেমনি ফসল উৎপাদন অনিশ্চিত হয়ে চাষাবাদ অলাভজনক হতে দেখা যায়।

ব্যবহারিক দিক থেকে বীজ উৎপাদনকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(1) পারিবারিক প্রয়োজনে বীজ উৎপাদন ও (2) ব্যবসার জন্য বীজ উৎপাদন।

পারিবারিক প্রয়োজনে অনেক সময় বাড়ীতেই বীজ উৎপাদন করা হয়। এ সব ক্ষেত্রে বাড়ীর অল্প কিছু গাছ হতে প্রয়োজন মত কিছু বীজ উৎপন্ন করা হয়। সাধারণ সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করে বীজ উৎপন্ন করা হয় বলে স্বপরাগ সংযোগে উৎপন্ন বীজগুলির বংশগতি অক্ষুণ্ণ থাকে। অনেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে ইতর পরাগ সংযোগেও বীজ উৎপাদন করে থাকেন। পারিবারিক বীজ উৎপাদনে সাধারণত উৎকৃষ্ট গাছ বেছে নিয়ে, সেটি থেকেই নির্দিষ্ট পরিমাণ বীজ সংগ্রহ করে পারিবারিক প্রয়োজন মেটান হয়।

ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বীজ উৎপাদনে প্রায়শই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে বৃহৎ পরিমাণে উৎকৃষ্ট বীজ উৎপন্ন করা হয়। এ সব ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ নিয়োগ, পৃথকীকরণ, সংকর বীজ উৎপাদন ও অন্যান্য উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। যেহেতু উন্নত বা উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদন যথেষ্ট লাভজনক, সেইজন্য ব্যয়বহুল নিয়ন্ত্রিত প্রজনন পদ্ধতি, উন্নত পৃথকীকরণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এসব ক্ষেত্রে প্রতিটি শস্যের বীজ উৎপাদনের বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে, জাতি, উপজাতি ও প্রকার ভেদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদিত হয়।

উন্নত বীজ-এর উৎপাদন পদ্ধতি কিছু জটিল কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত উন্নত বীজে, ভাল বীজ-এর বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও কিছু বিশেষ গুণ থাকে। এগুলি উচ্চফলনশীল হতে পারে বা রোগ ও পোকার আক্রমণ মুক্ত হতে পারে। আবার অনেক সময় এগুলি বিশেষ কোন আবহাওয়ার উপযুক্ত হতে পারে অথবা নাবী বা জলদি জাতের হতে পারে। এছাড়াও এগুলি ক্রেতার কাছে আকর্ষণীয় বা অতিরিক্ত পুষ্টি সম্পন্ন হতে পারে। অনেক সময় শিল্পের বিশেষ প্রয়োজন মেটাতেও উন্নতজাতের বীজ উৎপাদন করা হয়। বিভিন্ন জাতের গুণাবলীর সমন্বয় ঘটিয়ে সংকর ও উন্নত বীজ উৎপাদন করা যায়। উন্নত জাতের বীজ উৎপাদনে সংকর বীজ উৎপাদন ছাড়া, অন্য পদ্ধতিগুলির মধ্যে, প্রচলিত জাতিগুলি হতে নির্দিষ্ট স্থান ও আবহাওয়ার উপযুক্ত নির্দিষ্ট জাতের বীজ নির্বাচন এবং বিভিন্ন দেশ হতে উন্নত বীজ সংগ্রহ ও আমদানির পদ্ধতি উল্লেখ করা যায়।

উন্নত বীজ উৎপাদনের জন্য নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। নির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলি নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। অবশ্য বিভিন্ন প্রকারের নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। অনেকগুলির মধ্যে বিশেষ একটি নির্বাচনের নাম "মাস সিলেকশান" (Mass selection) এই পদ্ধতিতে বিশেষ একটির মাতা ও পিতাকে বিভিন্ন স্থান ও আবহাওয়ায় বছরের পর বছর উৎপন্ন করে এদের উৎপাদনশীলতা বিশেষ একটির সাথে তুলনা করা হয়। স্বভাবতই এ পদ্ধতিটি কিছুটা শ্লথ। এটি ছাড়া, নির্ভেজাল নির্বাচনে বা পিওর লাইন সিলেকশান (Pure line selection) পদ্ধতির দ্বারা পুনঃ পুনঃ স্বপরাগ সংযোগ ঘটিয়ে নির্ভেজাল শ্রেণী তৈরী করে তাদের মধ্য হতে বিশেষ একটিকে নির্বাচন করা হয়। এই পদ্ধতিটিও বেশ সময় সাপেক্ষ। স্বপরাগ ও ইতর পরাগ সংযোজন পদ্ধতি ক্ষেত্র বিশেষে কিছুটা পরিবর্তন করে নিতে হয়। পুনঃ পুনঃ স্বপরাগ সংযোগের ফলে, সমবংশগতি (Homozygosity)। প্রতিষ্ঠিত হয় ও অনেক সময় এদের উন্নত মান দেখা যায়। আবার উন্নত মান দেখা না গেলেও সংকর বীজ উৎপাদনের জন্য যখন এগুলি ব্যবহার করা হয় তখন এদের মধ্যে উন্নত মান দেখা যায়।

উন্নত বীজ আমদানি ও সংগ্রহ একটি বহু পুরোনো পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে, আমদানিকৃত জাতিগুলি থেকেও অনেক সময় উন্নত জাত পাওয়া যায়। বীজ সংগ্রহ দেশের মধ্যে বা বাইরে যে কোন জায়গা থেকে হতে পারে। স্থানীয় জাতের সঙ্গে এগুলির তুলনামূলক বিচার করে উৎকর্ষ প্রমাণিত হ'লেই এগুলিকে চাষের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হয়।

সংকরায়ন বা সংকর বীজ উৎপাদন পদ্ধতির মাধ্যমে এক বা একাধিক প্রকার ও গোত্রের গুণাবলী, নির্দ্দিষ্ট একটি জাতে সমন্বিত করা হয়। 7/8 বৎসর পরপর সমবংশগতি জাতের মিলন ঘটিয়ে প্রায় নির্ভেজাল জাত উৎপন্ন করা সম্ভব। বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন নির্ভেজাল জাতই একটি প্রকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং এটিকে সংকর বীজ উৎপাদনের জন্য পুনরায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

এছাড়া বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য বা আলোকরশ্মির ব্যবহারে ক্রোমোজমের ও বংশগতির পরিবর্তন করা যেতে পারে। যা পরে একটি বিশেষ প্রকার হিসাবে পরিগণিত হয়। সাধারণত কলচিসিন (Colchecine), মাস্টার্ড গ্যাস (Mustard gas) ইত্যাদি ব্যবহার করে ক্রোমোজমের পরিবর্তন সম্ভব। সাধারণভাবে গাছে দ্বিগুণন ক্রোমোজম (2n) থাকে। এগুলি ত্রিগুণন বা

চতুর্গুণন করা যায়। আবার দ্বিগুণনের সাথে চতুর্গুণনের মিলন ঘটিয়ে ত্রিগুণন করা সম্ভব। চতুর্গুণন বা তার বেশী জোড় গুণনযুক্ত ক্রোমোজম থাকলে উৎপাদন বাড়তে পারে। ত্রিগুণন বা পঞ্চম গুণন ইত্যাদি বিজোড় গুণন যুক্ত গাছে সাধারণত বীজ হতে দেখা যায় না। অবশ্য বীজ না হওয়ার আরও অনেক কারণ আছে। অনেক সময় দেখা যায় ইতর পরাগ সংযোগ না হলে বীজ উৎপাদিত হয় না। আবার কোথাও স্বপরাগ না হলে বীজ হয় না। আবার পুষ্পে লিংগের অবস্থানের উপর ইতর বা স্বপরাগ সংযোগ নির্ভর করে। পরাগ সংযোগের পরও প্রকৃত মিলন না ঘটতে পারে ও গাছ বন্ধ্যা হতে পারে। এগুলির মূল কারণ (পরাগ বন্ধ্যাত্ব) সাইটোপ্লাজম ও বংশগতির মধ্যে নিহিত থাকে। তবে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে নিহিত থাকলে শুধুমাত্র জনীতৃর মাধ্যমেই এটি বংশ পরম্পরায় বিস্তৃতি লাভ করে।

পরাগ বন্ধ্যাত্ব সাধারণ চাষীদের কাছে সমস্যা হলেও, বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তি-বিদরা এটির সাহায্যে বর্তমানে উন্নত উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন করছেন। অনেক সব্জীর অনেকগুলি প্রকারে পরাগ বন্ধ্যাত্ব লক্ষ্য করা গেছে। পরাগ বন্ধ্যাত্ব জাতের পেঁয়াজ, টোম্যাটো, বেগুন, তরমুজ, ইত্যাদিকে জনীতৃ হিসাবে ব্যবহার করা হয় ও উন্নত বীজ উৎপাদন করা হয়।

বীজ নিষ্কাশন ঃ

বীজ নিষ্কাশনের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তবে শস্যের তারতম্যের উপর নিষ্কাশনের পদ্ধতি নির্ভর করে।

যেসব সব্জীর বীজ দানা জাতীয়, তাদের বীজযুক্ত ফলগুলি, শস্য জমিতে রেখেই পুষ্ট হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় এবং ফল পুষ্ট হয়ে গেলে, বৃন্ত সহ সংগ্রহ করে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে মাড়াই করে বীজ সংগ্রহ করা হয়। বীজগুলি খোসা থেকে আলাদা করে আবার ভালভাবে রোদে শুকনো করা হয়। বীজ যথেষ্ট শুকনো হলে, সংরক্ষণের উপযুক্ত হয়। শুকনো বীজ এ 1-4 শতাংশের বেশী আদ্র্তা থাকা উচিত নয়।

বেগুন, টোম্যাটো, কুমড়ো, ইত্যাদি সব্জী বীজ শাঁসযুক্ত থাকে। সেই জন্য এগুলি আগের পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা যায় না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এগুলির শাঁসযুক্ত বীজ প্রথমে ফল থেকে আলাদা করে, দুই শতাংশ কস্টিক সোডা বা হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডে চব্বিশ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে বীজগুলি শাঁস

থেকে আলাদা হয়ে যায়। অবশ্য বীজ ও শাঁস 12-24 ঘণ্টা জলের মধ্যে রেখে দিলেও শাঁসগুলি পচে যাবে ও বীজ থেকে আলাদা হয়ে উপরে ভেসে উঠবে। পরিস্কার জলে বীজগুলি হাত দিয়ে কচলে নিয়ে শাঁস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলা হয়। বীজ পরিস্কার হয়ে গেলে ব্লটিং কাগজের উপর রেখে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এতে বীজের উজ্জ্বল্য ও বর্ণ আকর্ষণীয় হয়।

ধুধুল, ঝিঙে, ইত্যাদির বীজ সংগ্রহের জন্য পুষ্ট ফল প্রথমে রোদে ভালভাবে শুকিয়ে নেওয়া হয়, পরে ফলের একদিক খুলে শক্ত জায়গায় ঠোঁকা দিলে বীজগুলি বেরিয়ে আসে। অনেক সময় উচ্ছে ইত্যাদি শাঁসযুক্ত বীজ ঘুঁটের ছাই মিশিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়, সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে, চটের থলে বা বস্তার উপর ঘসে নিলে, পরিস্কার বীজ বেরিয়ে আসে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে এই পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রচলিত।

কিছু কিছু বীজ-এর আস্তরণ বা খোসা ভীষণ শক্ত থাকে ; সহজে অঙ্কুরোদ্গম হতে চায় না। আবার কিছু কিছু বীজ লাগানোর 2/1 দিন পরেই কল আসতে দেখা যায়। অঙ্কুরিত হওয়ার সময় অনুযায়ী বিভিন্ন সব্জী বীজকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(1) এক সপ্তাহ বা তার কম সময়ের মধ্যে যেসব সব্জীর কল হতে দেখা যায় সেগুলির মধ্যে মুলো, ও ঢেঁড়সের নাম করা যেতে পারে।

(2) ফুলকপি, বাঁধাকপি, কুমড়ো, শশা, লাউ, ঝিঙে, ধুধুল, ফরাসবীন, ভুট্টা, শালগম, বীট পালং ও লেটুস, ইত্যাদির বীজ এক থেকে দেড় সপ্তাহে অঙ্কুরিত হয়।

(3) আবার এক থেকে দু সপ্তাহের মধ্যে বেগুন, টোম্যাটো, মটরশুঁটি, লংকা, পেয়াঁজ, রসুন, ইত্যাদির বীজ বা কোয়া অঙ্কুরিত হতে দেখা যায়।

(4) সব থেকে বেশী, প্রায় তিন সপ্তাহ, সময় লাগাতে পারে গাজর, উচ্ছে, তরমুজ, পটল, ইত্যাদি সব্জী বীজের অঙ্কুরিত হতে।

অবশ্য সময়ের নির্দ্দিষ্টতা নির্ভর করবে বীজ-এর বয়স, বীজ সংরক্ষণের পদ্ধতি, বীজবপনের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও চাষের পদ্ধতির উপর।

সংরক্ষণের কাল অনুসারে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা হ্রাস বা বৃদ্ধি হতে পারে। অর্থাৎ কিছু বীজ দেখা যায় এক বছরের বেশী রাখা যায় না। আবার কিছু বীজ বৎসরাধিক কাল সংরক্ষণ করে রাখা যায়। যদিও বীজ সংরক্ষণের জন্য নির্দ্দিষ্ট তাপ ও আর্দ্রতার ব্যতিক্রম হলে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা কমে

যায়, তবু প্রয়োজনীয় আবহাওয়ার মধ্যেও অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতার তফাৎ দেখা যায়। ভুট্টা, পেঁয়াজ, রসুন, আলু, আদা, ইত্যাদির বীজ এক বৎসরের বেশী রাখা যায় না। কিন্তু বীট, পালং, লংকা, মটরশুঁটি, ঢেঁড়স, প্রভৃতির বীজ দুবছর রাখলেও অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা হারায় না। আবার শতমূলী, গাজর, টোম্যাটো, ইত্যাদি সব্জী বীজ তিন বছর পর্যন্ত রাখা যায়। বেগুন, মূলো, ফুলকপি, বাঁধাকপি প্রভৃতির বীজ চার বছরও রাখা যায়। সব থেকে বেশীদিন রাখা যায় কুমড়ো জাতীয় সব্জী বীজ। অবশ্য আগেই বলা হয়েছে, বেশীদিন রাখার জন্য উপযুক্ত আবহাওয়া দরকার বিশেষত তাপ ও আদ্রতা। সাধারণভাবে তাপের সাথে আদ্রতার একটি অনুপাত অনুসরণ করা হয়। যেমন উষ্ণতা যদি 58° ফাঃ হয় তবে আদ্রতা শতকরা 45 বেশী হবে না। আবার 70° ফাঃ উষ্ণতায় 60 শতাংশ পর্যন্ত আদ্রতা রাখা যেতে পারে। হিম ঘরে (40-50 ফাঃ) রাখলে শতকরা 50 ভাগ আদ্রতা দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

বীজ উৎপাদনের সমস্যা ঃ

বীজ উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য ভাল বীজ উৎপাদন, উন্নত জাতের বীজ উৎপাদন, রোগ মুক্ত বীজ উৎপাদন ও পর্যাপ্ত বীজ উৎপাদন। এখনো বিদেশ থেকে বেশ কিছু বীজ আমদানী করতে হয় কাজেই প্রয়োজনীয় বীজ উৎপাদন করে স্বয়ম্ভরতা আনাই বীজ উৎপাদনের মূল লক্ষ্য বলে বিবেচনা করা হয়।

ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে বীজ উৎপাদনে অনেকগুলি সমস্যা দেখা যায়, কিছু কিছু সমস্যার সমাধান সহজ, কিন্তু কিছু সমস্যার সমাধান বেশ কষ্টসাধ্য। বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গে বীজ উৎপাদন ও বিপনন একটি অর্থকরী ব্যবসা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যদিও এটির প্রভুত সম্ভাবনা ছিল। যাইহোক বীজ উৎপাদনে সমস্যাগুলিকে সাধারণভাবে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(1) অর্থনৈতিক সমস্যা, (2) প্রযুক্তিগত সমস্যা, (3) আবহাওয়া জনিত সমস্যা ও (4) সাংগঠনিক সমস্যা। সমস্যাগুলি আলাদাভাবে আলোচনা করা হল।

(1) **অর্থনৈতিক সমস্যা ঃ** বর্তমান বিশ্বে বীজ উৎপাদন একটি উন্নত লাভজনক ব্যবসা। উন্নত দেশগুলিতে বীজ উৎপাদনে প্রচুর পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। এছাড়া দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক এবং দামী যন্ত্রপাতি প্রতিটি বীজ উৎপাদক সংস্থার আওতায় কাজে লাগানো হয়। সমস্ত ব্যবস্থাটিই বেশ ব্যয় সাপেক্ষ। সাধারণ ভারতবাসীর অর্থনৈতিক দুর্বলতা থাকার জন্য তাদের

পক্ষে এই ব্যবসা ঠিকমত চালানো সম্ভব হচ্ছে না। বীজ ব্যবসা এদেশে তাই মুষ্টিমেয় কিছু অর্থশালী ব্যক্তির কুক্ষিগত। তবে আশার কথা, জাতীয় বীজ নিগম, ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ ও জাতীয় ব্যাংকগুলি উৎসাহ, বিপনন, গবেষণা ও অর্থ সাহায্য করে বীজ উৎপাদন ব্যবসাকে সার্ব্বজনীন ও বৃহদাকার করার চেষ্টা করছেন।

(2) প্রযুক্তিগত সমস্যা ঃ

আগেই বলা হয়েছে উন্নত মানের বীজ উৎপাদনে যথেষ্ট প্রযুক্তির সাহায্য লাগে। প্রযুক্তির প্রয়োজন হয় বীজ উৎপাদনে, বীজ সংগ্রহে, বীজ নিষ্কাশনে, বীজএর শ্রেণী বিন্যাসে, বীজ বস্তাজাত করায়, বীজ সংরক্ষণে ও বীজ বিপননে। কাজেই প্রতিটি স্তরেই প্রযুক্তিবিদ্যা বা প্রযুক্তিবিদের দরকার হয়। সাধারণ ভারতীয় চাষীর বেশীর ভাগের খামারেই এ প্রযুক্তি বিদ্যার অভাব দেখা যায়। যারা প্রযুক্তিবিদ্যা লাভ করেছেন তাঁরা প্রায়শই ব্যবসায় এগিয়ে আসেন না। ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে বিশ্বের অনেক দেশের থেকেও বেশী প্রযুক্তিবিদ থাকলেও তাই কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদের অভাব দেখা যায়। সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মারফৎ বীজ উৎপাদনের কার্যকরী প্রযুক্তিবিদ্যা শেখানোরও বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই। মাইনে দিয়ে প্রযুক্তিবিদ রাখা ব্যয়বহুল। তাই প্রযুক্তি-বিদের অভাবেও বীজ উৎপাদন সার্ব্বজনীন ও লাভজনক ব্যবসা হতে পারে নি।

(3) আবহাওয়াজনিত সমস্যা ঃ

ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ প্রাকৃতিক বৈচিত্রে পরিপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের সমতল ভূমিতে আর্দ্র ও উষ্ণ আবহাওয়া দেখা যায়। এখানে শীত ক্ষণস্থায়ী। অনাবৃষ্টিজনিত খরা ও অতিবৃষ্টিজনিত বন্যা প্রায়ই দুর্ভাগ্য বহন করে।

বীজ উৎপাদনের জন্য মূলত তাপ, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, সূর্যালোক, ইত্যাদির দরকার হয়। শস্য বপন ও রোপণের পর এগুলি ঠিকমত না পেলে নানাবিধ অসুবিধা ও রোগ পোকার আক্রমণ হয় ও বীজ উৎপাদন প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়। এ ছাড়া কিছু সব্জীর বীজ উৎপাদনে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ শীতকাল ও বেশী ঠাণ্ডা দরকার হয়, যা সমতল ভূমিতে পাওয়া অসম্ভব। অন্য দিকে পার্বত্য অঞ্চলে অত্যধিক বারিপাত এসব সব্জী বাঁচিয়ে রাখার অন্তরায়। কাজেই প্রাকৃতিক অস্থিরতা ও অনুপোযোগিতা পশ্চিমবঙ্গে বৃহদাকার সব্জী বীজ উৎপাদনের কিছুটা অন্তরায়।

(4) **সাংগঠনিক সমস্যা ঃ** বীজ উৎপাদন, শস্য বপন থেকে বীজ বিপনন পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের সমন্বয়ে গঠিত একটি লাভজনক ব্যবসা। কাজেই এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডে বেশ সুদক্ষ সাংগঠনিকের দরকার হয়। সাংগঠনিককে একাধারে শস্য নির্বাচন, আবহাওয়া স্থিরিকরণ, জমি, অর্থ ও প্রযুক্তিবিদ সংগ্রহ করতে হবে। এগুলি ঠিক হলে, আশা করা যায় বীজ উৎপাদিত হবে। সফল বিপণনের মাধ্যমে নিয়োজিত অর্থের পুনরুদ্ধার না করতে পারায় সাংগঠনিক দক্ষতার সমন্বয় না হওয়ার ফলেই সব্জী বীজ উৎপাদন সার্বজনীন হয়নি ও সামগ্রিক উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়নি।

এছাড়া সরকারের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় আইন তৈরী না করায়, যে কেউই বীজ ব্যবসায়ী হতে পারে ও নিম্নমানের বীজ উৎপাদন ও বিপণন করতে পারে। উন্নত মানের বীজ উৎপাদনের ও বিপণনের "বীজ আইন" তৈরী করা দরকার। যাতে বীজ উৎপাদন ও বিপণনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত আরোপ করা থাকবে। কেননা বীজ খারাপ হলে শুধু চাষীই ক্ষতিগ্রস্থ হবে না, জাতীয় উৎপাদনও বিঘ্নিত হবে। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় বা প্রতিটি রাজ্য সরকারের "বীজ আইন" তৈরী করা দরকার।

চারা তৈরী ঃ

অনেক সব্জীতেই সরাসরি বীজ বপন করে গাছ তৈরী করা হলেও বেশীর ভাগ সব্জীর ক্ষেত্রেই বীজতলায় বীজ বপন করে চারা তৈরী করে নেওয়া হয়। ভাল চারা তৈরীর মধ্যেও সফল সব্জী চাষের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে। চারা তৈরী করে নেওয়াতে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়। বীজতলায় চারা তৈরী করলে বীজ কম লাগে। চারার বেশী যত্ন নেওয়া যায়, যা ছোট অবস্থায় একান্ত প্রয়োজন।

বীজ উৎপাদনের মতই চারা উৎপাদনেও বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন ভাবে চারা তৈরী করা যেতে পারে। কখনো ফাঁকা আকাশের নিচে। আবার কখনো ঢাকা জায়গায় বীজতলা তৈরী করা হয়। খোলা জায়গায় লম্বা উঁচু বা নিচু বীজতলা প্রাকৃতিক অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে তৈরী করা হয়। বীজতলার আকার ও প্রকার যেমনই হোক এর মূল উপাদান হচ্ছে মাটি। বীজতলার মাটি হালকা ও ফাঁপা হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাধারণত বেলে দোঁয়াশ মাটিতে প্রয়োজনমত জৈব সার মিশিয়ে বীজতলা তৈরী করা হয়। রোগের প্রাদুর্ভাব

থাকলে, অনেক সময় মাটি শোধন করতে হয়। শোধনের জন্য এক শতাংশ ফরম্যালডিহাইড দ্রবণ মাটির উপর প্রয়োগ করে ২/৩ দিন পলিথিনের কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখলে ইপ্সিত ফল পাওয়া যায়। আমাদের দেশে মাটি কুপিয়ে রোদে খুলে রাখলেও মাটি কিছুটা শোধিত হয়। এছাড়া খামারের আবর্জনা পুড়িয়েও মাটি শোধন করা যায়। মাটি নির্বাচন ও প্রয়োজনমত শোধন হয়ে গেলে বীজ-তলা তৈরী করা হয়।

বীজ তলা ঃ

বীজতলাকে গাছের আঁতুড় ঘর বলা হয়। বীজতলায় বীজ বপন করে উপযুক্ত পরিচর্যার সাহায্যে সতেজ চারা তৈরী করা হয়। চারা ঠিক মত তৈরী না হলে, ফসলের নিশ্চয়তা থাকে না। বীজের আকার, পরিমাণ এবং প্রাকৃতিক অবস্থা ও চাষীর প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে, নানা ধরনের বীজতলা হতে পারে।

বীজতলার আকৃতি মূলত বীজের আকার ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে ; কারণ বীজ যদি ছোট হয়, তবে ঠিক মত যত্নের ও পরিচর্যার জন্য, এগুলি ছোট বীজতলা বা মাটির টবে অথবা কাঠের বাক্সে বীজতলা তৈরী করে, সেখানে বপন করা ভাল। এক্ষেত্রে বীজ-এর পরিমাণ বেশী হলে ছোট ছোট অনেকগুলি বীজতলা করা উচিত। বীজ আকারে বড় হলে বড় বীজতলায় অসুবিধা হয় না এবং পরিমাণে বেশী হলে অবশ্যই বড় বীজতলা করে নেওয়া ভাল।

প্রাকৃতিক অবস্থা ও বীজতলার আকার ও প্রকার নিরূপণে প্রভাব বিস্তার করে। প্রাকৃতিক অবস্থা খারাপ হলে, নাবি জাতের সব্জী বীজ প্রায়ই মাটির টবে বা কাঠের পাত্রে বীজতলা তৈরী করে সেইখানেই বপন করা রীতি। এতে সুবিধা হচ্ছে প্রয়োজনমত বীজতলায় রোদ খাওয়ানো যায়। আবার দরকারে এগুলি আচ্ছাদনের নিচে এনে রাখা যায়।

এছাড়া, বর্ষাকালে খোলা জায়গায় বীজতলা করতে হলে. প্রায় 15 সে. মি. উচু বীজতলা করা উচিত। এতে বৃষ্টির জলে বীজতলা ডুবে যাওয়ার ভয় থাকে না। এছাড়া, এগুলির কানা একটু উঁচু করে দিলে, বৃষ্টিতে বীজ ধুয়ে যায় না। খোলা জায়গায় শীত ও গ্রীষ্মকালে একটু নিচু (10 সে. মি.) বীজতলা করলে জল দেবার সুবিধা হয়।

বীজতলার আকার ও প্রকার সব থেকে বেশী নির্ভর করে চাষীর মর্জ্জির ও প্রয়োজনের উপর।

যাই হোক, অবস্থানগত তারতম্যের জন্য বীজতলাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (1) খোলা বীজতলা (2) ঢাকা বীজতলা।

(1) খোলা বীজতলা—সাধারণত খোলা আকাশের নিচে করা হয়। তবে প্রয়োজনে মাঝে মাঝে ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে পারে। এগুলিকে আবার দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন—(ক) বর্ষাকালের বীজতলা ও (খ) শীত ও গ্রীষ্মকালের বীজতলা।

(2) ঢাকা বীজতলা সারা বছরই ব্যবহার করা যায়। এগুলির ওপর সারা বছরই ঢাকা বা আচ্ছাদন দেওয়া থাকে সাধারণত হোগলা, খড়, পলিথিন, কাগজ বা স্বচ্ছ কাঁচ দিয়ে। ঢাকা বীজতলার জায়গাটি মোটামুটি স্থায়ী হয়। এগুলি সর্ব ঋতুতেই ব্যবহার করা যায়। প্রয়োজনে জায়গার অভাব হলে, থাক বানিয়ে দুই তিন স্তরে বীজ ফেলা যায়। ঢাকা বীজতলায়, বীজ বপন করলে, চারাগুলিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে বাচানো সম্ভব হয়। চারার উপযুক্ত পরিচর্যা করাও সম্ভব হয়। ঢাকা জায়গায় সাধারণত মাটির সমতলেই বীজতলা করা হয়। প্রয়োজনে, বীজতলা ছোট বা বড় হতে পারে ; অথবা ঢাকা জায়গায় চালি টবেও বীজ বপন করা হয়। চালি টবে বা কাঠের অগভীর বাক্সে মাটি ভরে বীজতলা করলে পুরো বীজতলাটিই গাছ রোপণ করার জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। তাছাড়া রোগ পোকা দমন ও সার ব্যবহার সহজসাধ্য হয়। কিছুটা খরচও কমে।

বীজতলা তৈরী :

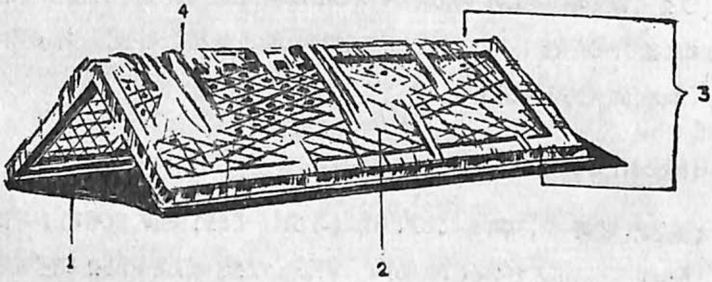
বীজতলা ভাল ও ঠিকমত তৈরী না হলে চারা তৈরী ভাল হবে না। বীজতলা তৈরীতে মাটিই প্রধান বিবেচ্য। মাটির পরেই আসে মাটির আর্দ্রতা বা রস, বাতাস বা অম্লজান, তাপ বা উষ্ণতা ইত্যাদি। অর্থাৎ চারা তৈরীর জন্য মাটি চাই এবং এর সাথে চাই অংকুর গজানোর উপযুক্ত পরিবেশ।

বীজতলার মাটিতে যথেষ্ট জৈবসার থাকা দরকার। মাটি হালকা বেলে দোঁয়াশ হলে ভাল হয়। বেলে দোঁয়াশ মাটিকে কুপিয়ে ফাঁপা ও ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। প্রয়োজন মত জৈব পদার্থ ও উদ্ভিদ খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। রোগ জীবাণু মুক্ত করার জন্য ফরম্যালীন ইত্যাদি প্রয়োগ করে প্রয়োজনে মাটি

শোধন করা হয়। মাটি শোধিত ও ঠিকমত তৈরী হয়ে গেলে এক মিটার চওড়া ও প্রয়োজন মত লম্বা ও উচু বা নিচু বীজতলা তৈরী করা হয়। আগেই বলা হয়েছে, গ্রীষ্ম বা শীত কালের বীজতলা জমির তল থেকে কিছুটা নিচে করা হয়। এবং বর্ষাকালীন বীজতলা জমির তল থেকে কিছুটা উচু করা হয় ও বীজ-তলার ধারগুলি সামান্য উচু করে বেড় দেওয়া হয়, যাতে বৃষ্টির জলে বীজ ধুয়ে না যেতে পারে। এছাড়া পিঁপড়ে বা উঁইপোকা দমন করতে হলে বীজতলার উপর হালকা করে বি. এইচ. সি. বা অলড্রিন পাউডার ছড়িয়ে দেওয়া দরকার।

বীজ সাধারণভাবে বীজতলার উপর ছড়ানো হয় অথবা নির্দিষ্ট দূরত্বে সারিতে কিছুটা অন্তর অন্তর বীজ বপন করা হয়। মাটির কতটা নিচে বীজগুলি ছড়ানো হবে, এটা নির্ভর করবে বীজ-এর আকারের উপর। বীজ খুব ছোট হলে বীজতলার মাটির উপর বীজ ছড়িয়ে, মিহি ছাইয়ের গুঁড়ো দিয়ে হালকা করে ঢেকে দেওয়া হয়। অপেক্ষাকৃত মোটা হলে, যেমন বেগুন, লংকা, টোম্যাটো ইত্যাদি বীজ মাটির 0·5—1 মি. মি. নিচে বপন করাই বাঞ্ছনীয়। বীজ আরও মোটা হলে অপেক্ষাকৃত বেশী গভীরে দেওয়া যেতে পারে। সারিতে বীজ বপন করলে, বীজতলার উপর আগে সারি কেটে নেওয়া হয়।

বীজ ছড়ানো হয়ে গেলে, ফুলঝারি দিয়ে হালকা সেচ দেওয়া হয়। অনেক সময় (বিশেষত বর্ষাকালে) পলিথিনের ঢাকনা (চিত্র-1) খড় বা শণ দিয়ে



চিত্র-1 : পলিথিনের ঢাকনা।
1. বীজতলা, 2. তারের জাল, 3. কাঠের কাঠামো, 4. পলিথিন ঢাকনা

বীজতলা 2/1 দিন ঢেকে রাখলে তাড়াতাড়ি চারা বেরিয়ে পরে এবং বৃষ্টির ফোঁটা থেকে বীজগুলিকে রক্ষা করা যায়।

এরপর চারাগুলিকে প্রয়োজন মত সেচ ও যথেষ্ট রোদ খাওয়াতে হবে। তবে প্রথম অবস্থায় কোন মতেই এগুলিকে কড়া রোদে বা বৃষ্টির বড় ফোঁটায় খোলা

রাখা চলবে না। রাত্রে খুলে রাখতে পারলে ভাল হয়। চারা বেরোনোর প্রথম 12—15 দিন বাদে এগুলি সাধারণভাবে পরিচর্যা করা যায় ও সার প্রয়োগ করা যায়। এ সময় জলের সাথে অল্প ইউরিয়া (0·5% অর্থাৎ 1 লিটার জলে 5 গ্রাম ইউরিয়া) মিশিয়ে চারার পাতা ভাল করে ভিজিয়ে দিলে চারা সতেজ হয় ও তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠে।

বীজতলায় প্রয়োজনমত নিড়ানী দিয়ে আগাছা তুলে ফেলতে হবে ও চারা খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে। এছাড়া দরকার মত কীটনাশক ওষধ প্রয়োগ করতে হবে। চারা একটু বড় হয়ে গেলে, সেচের নিবিড়তা কমিয়ে পরিমাণ বাড়াতে হবে।

কিছু কিছু সব্জীর চারা সরাসরি জমিতে না লাগিয়ে মাঝে একবার অপেক্ষাকৃত বড় অন্য বীজতলায় লাগিয়ে নিলে, চারা শক্ত হয় ও নষ্ট হবার ভয় থাকে না। এটিকে দ্বি-রোপণ পদ্ধতি বলা হয়। দ্বি-রোপণ পদ্ধতিতে চারার সহনশীলতা বাড়ানো যায় ও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় চারা মরে না।

পেঁয়াজ প্রভৃতি কয়েকটি সব্জী বাদ দিয়ে প্রায় সমস্ত সব্জী চারাই 1-1½ মাসের মধ্যে রোপণ করার উপযোগী হয়ে যায়। বীজতলা থেকে চারা তোলার আগে অন্তত এক সপ্তাহে সেচ দেওয়া বন্ধ করতে হবে কিন্তু চারা তোলার আগের দিন বীজতলা ভাল করে ভিজিয়ে দিতে হবে। এতে চারা তোলার সুবিধা হয় ও শেকড় ছেঁড়ার ভয় থাকে না। সাধারণতঃ চারা বিকেলের দিকে তুলে, রোপণ করলে পাতার থেকে বাষ্প নিষ্কাশন কম হয় ও চারার মৃত্যুর হার কমে। ছোট চারার সহনশীলতা বেশী।

মূল জমিতে বিকেলে চারা রোপণের জায়গা নির্দিষ্ট করে, সেখানে জল দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হয় ও মাটি অল্প গর্ত করে চারার শেকড় মাটির নিচে রেখে কাণ্ডের পাশের মাটি আঙুলের চাপ দিয়ে ভালভাবে বসিয়ে দিতে হবে। দরকারে কাণ্ডে ঠেকাও দেওয়া হয়। যাই হোক চারাটি যাতে ঢোলে না যায়, তার জন্য সর্তকতা নেওয়া দরকার।

চারা রোপণের পর, প্রখর সূর্য তাপ থেকে বাঁচানোর জন্য 2/3 দিন ঢাকা দেওয়া দরকার হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ছোট সবুজ গাছ বা গাছের শাখা বা সবুজ কচুরিপানা ব্যবহার করা হয়। কাঁচা বা সবুজ কচুরিপানা ব্যবহার করলে চারাটি ছায়া ছাড়াও কিছুটা আদ্রর্তা পায়। গাছ না লাগা পর্যন্ত প্রায় রোজই

হালকা সেচ দিতে হবে। গাছ লেগে গেলে, সাধারণ ভাবে সেচ ও সার দেওয়া যেতে পারে।

সব্জী চাষের সফলতা কিছুটা চারার বয়সের উপর নির্ভরশীল। আগেই বলা হয়েছে, সাধারণভাবে প্রায় সব সব্জী চারাই 1-1½ মাসের মধ্যে তৈরী হয়ে যায়। আর বিস্তৃতভাবে 28-70 দিনের মধ্যে পেঁয়াজসহ সমস্ত সব্জী চারাই তৈরী হয়। উচ্চতার দিক থেকে চারাগুলি 10-15 সে. মি. হতে পারে আবার পাতার সংখ্যা ধরলে 3-5 টি পাতা হলেই চারা রোপণের উপযুক্ত হয়।

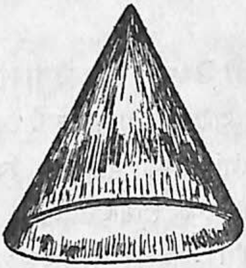
এতক্ষণ চারার কথা বললেও জেনে রাখা ভাল, সব সব্জীর চারা তৈরী করা যায় না। কুমড়ো, ঝিঙে, ধুঁধুল, চিচিঙ্গে, পালং, সীম, মুলো, ঢেঁড়স, লাল শাক, চামেলী নটে ইত্যাদির চারা তৈরী করা হয় না বা চারা রোপণ করলে ভাল হয় না। কিছু সব্জী যেমন লাউ, পুঁই, শালগম ইত্যাদির চারা তৈরী করাও যায় আবার বীজ সরাসরি জমিতেও লাগানো যায়। কিন্তু ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, টোমাটো, বেগুন, লংকা, কাটোয়া ডাঁটা, পেঁয়াজ ইত্যাদির আগে চারা তৈরী করা হয় ও পরে মূল জমিতে রোপণ করা হয়।

চারা তৈরী করে রোপণ করার কতকগুলি বিশেষ সুবিধে আছে। চারা তৈরী করলে বীজ-এর সাশ্রয় হয়, বীজতলাতে চারার পরিচর্যার সুবিধে হয়। মাধ্যমিক পরিচর্যা ও রোগ পোকা দমন সহজ হয়। চারা তুলে মূল জমিতে রোপণ করলে নির্দিষ্ট দূরত্ব থাকার জন্য একর প্রতি বেশী গাছ লাগানো যায়; রোপণের জন্য চারার সহনশীলতা বাড়ে ও চারা তোলার সময় কিছু শেকড় ছিঁড়ে যাওয়ায় গাছের বৃদ্ধি বেশী হয়। এছাড়া চারা তুলে লাগানোর জন্য কম সময়ের মধ্যেই গাছ উৎপাদনযোগ্য অবস্থায় এসে যায়।

আমাদের দেশে বিশেষ ব্যবহৃত না হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সব্জী উৎপাদনের জন্য নানান ধরনের আচ্ছাদন ব্যবহার করা হয়। এগুলির মূল উদ্দেশ্য, সব্জীগুলিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচিয়ে, প্রয়োজনীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি করা এবং বছরের যে কোন সময়ই ইচ্ছামত সব্জী উৎপাদন করা। ইউরোপে যেখানে সারা বছরই যথেষ্ট ঠাণ্ডা থাকে, সেখানে এ ধরনের আচ্ছাদনের ব্যবহার খুবই প্রচলিত। তাছাড়া এসব দেশে ক্রেতারা আচ্ছাদনে উৎপন্ন সব্জীর বেশী দাম দিতে পেছ পা হয় না।

এ সব আচ্ছাদনের মধ্যে কাঁচের ঘর, লোহা বা নাইলন জালের ঘর, হোগলা বা খড় আচ্ছাদিত ঘর ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যায়। এছাড়া উন্মুক্ত ক্ষেত্রে

প্রতিটি গাছে আলাদা ঢাকনাও দেওয়া হয় (চিত্র-2) বা যে দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসে সেদিকে বায়ু প্রতিরোধক বেড়াও দেওয়া হয়। অনেক সময় মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জৈব পদার্থ প্রয়োগ করেও মাটির উষ্ণতা রক্ষা করা হয়। আবার মাটির মধ্যে দিয়ে বা আচ্ছাদনের ভিতর দিয়ে পাইপের মাধ্যমে গরম জল বা বাষ্প চালনা করেও মাটির বা আচ্ছাদনের আবহাওয়া গরম রাখা হয়।



চিত্র-2 ঃ পলিথিন বা কাগজের টুপি

পশ্চিমবঙ্গ বা পূর্ব ভারতে এর প্রচলন বিশেষ না থাকায় এখানে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই। যাই হোক এসব ক্ষেত্রে সব্জী উৎপাদনের দুটি মূল উপাদান মাটি ও আবহাওয়ার উপর উৎপাদকের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে।

সব্জী উৎপাদন

সব্জী উৎপাদনের উপাদান ঃ

আগের অধ্যায়ে সব্জী উৎপাদনের একটি মূল উপাদান, বীজ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু বীজ ছাড়াও সব্জী উৎপাদনে আরো কিছু উপাদানের প্রয়োজন হয়। যেগুলির মধ্যে আবহাওয়া ও মাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া মাধ্যমিক পরিচর্যাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই সবগুলি মিলেই সব্জী উপাদানের পরিমণ্ডল তৈরী করে। যা উদ্ভিদের বংশগতি প্রকাশ বা পরিস্ফুটনে বিশেষ সহায়তা করে। প্রয়োজনমত মাটি, আবহাওয়া ও মাধ্যমিক পরিচর্যা অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে পরিমণ্ডল না পেলে বংশগতির ঠিকমত পরিস্ফুটন হয় না বা উৎপাদন ব্যাহত হয়।

আবহাওয়া ও সব্জী উৎপাদন ঃ

আবহাওয়া বলতে প্রধানত উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, সূর্যালোক, বায়ু-প্রবাহ, কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও অক্সিজেনের অনুপাত, ইত্যাদি বোঝায়। চাষী সাধারণত তার ব্যবহারিক জ্ঞানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্থানের জন্য নির্দিষ্ট সব্জী নির্ধারণ করেন। আবহাওয়ার উপাদানগুলি. প্রাকৃতিক পরিবর্তন ছাড়া, সহজে পরিবর্তন করা যায় না বা পরিবর্তন ব্যয়-সাপেক্ষ। কিন্তু উপাদানগুলির সামান্য পরিবর্তনে সব্জী গাছের এমন শারীরবৃত্তিয় ও আঙ্গিক পরিবর্তন সাধন হতে পারে, যা উৎপাদনের পরিপন্থী, কিন্তু বাহ্যত এই পরিবর্তন সামান্যই লক্ষ্য করা যায়। কাজেই চাষীর এগুলি সম্বন্ধে কিছুটা ওয়াকিবহাল হওয়া উচিত।

উষ্ণতা ঃ উষ্ণতা বা তাপের প্রয়োজনানুসারে সব্জী জগতকে আগেই বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। কাজেই প্রয়োজনীয় তাপের ব্যতিক্রম হলে সব্জী গাছের শারীরবৃত্তিয় ও আঙ্গিক পরিবর্তন হতে দেখা যায়, অনেক সময় গাছ উৎপাদনে আসতে পারে না। গাছ বড় হওয়ার আগেই ফুল এসে যায় বা মরেও যেতে পারে। বেশী তাপে যেমন গাছ শুকিয়ে মরে যেতে পারে, ঠিক তেমনিই অত্যধিক শৈত প্রবাহে কোষের মধ্যেকার জল জমে বরফে পরিণত হয়, গাছের কলা ফাটিয়ে দেয় ও মৃত্যু ঘটায়।

এছাড়া বাইরের শীত ও গ্রীষ্ম, মৃত্তিকার শীতলতা ও উষ্ণতার উপর প্রভাব বিস্তার ক'রে, মৃত্তিকাস্থ উপকারী জীবাণুর বিকাশ সাধনে সাহায্য বা বাধা

সৃষ্টি করতে পারে। পরাগ মিলনেও উষ্ণতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উষ্ণতা বেশী হলে যেমন পরাগ রেণু শুকিয়ে যায়, কম হলেও তেমনিই পরাগ সংযোগকারী প্রাণীর গতিবিধি বিঘ্নিত হয়ে পরাগ সংযোগ ব্যাহত হয়। কাজেই আবহাওয়ার উষ্ণতা অনুযায়ী সব্জী নির্বাচন একান্ত প্রয়োজনীয়।

বৃষ্টিপাত ঃ বৃষ্টিপাতের প্রভাব, মাটি ও আবহাওয়ার আর্দ্রতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। বৃষ্টির জল মাটির মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় সঞ্চিত থাকে ও প্রয়োজনে গাছের সাহায্যে আসে। খাদ্য সংশ্লেষ, বাষ্পমোচন ইত্যাদি শারীরবৃত্তিয় কাজে জল ব্যবহৃত হয়।

বৃষ্টিপাত তথা জলের অভাব হলে খাদ্য সংশ্লেষ, বাষ্পমোচন ইত্যাদি শারীরবৃত্তিয় কাজ ব্যাহত হয়, বাধাপ্রাপ্ত হয় ও গাছ মরে যাবার সম্ভাবনা থাকে। বেশী বৃষ্টিপাতে গাছের খাদ্য মাটি থেকে ধুয়ে যায়। মাটির মধ্যে বায়ু বা অক্সিজেনের অভাব ঘটে, শেকড় পচে যায়। অনেক সময় সব্জীর স্বাদও নষ্ট হয়ে যায়। বেশী বৃষ্টিপাত, পরাগরেণু ধুয়ে পরাগ সংযোগে বিঘ্ন ঘটায়। এছাড়া পরোক্ষ প্রভাব হিসাবে তাপমাত্রার তফাৎ হয় ও সূর্যালোকের উপর প্রভাব ঘটায়।

সূর্যালোক ঃ সূর্যালোক, সালোকসংশ্লেষে সাহায্য করে ও তাপের প্রয়োজন মেটায়। সূর্যালোকের প্রয়োজনীয়তার মাপকাঠিতে সব্জী গাছকে হ্রস্বদিন, দীর্ঘদিন ও নাতিদীর্ঘদিন এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। মটর শুঁটি, সীম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, গাজর, শালগম ইত্যাদিকে হ্রস্বদিন গাছ বলা হয়। এবং এগুলির সূর্যালোকের প্রয়োজন দৈনিক 8—10 ঘণ্টার বেশী নয়। পক্ষান্তরে লেটুস, টোমাটো, ফরাসবীণ, শশা, ঝিঙে, উচ্ছে, বীট, পেঁয়াজ, ঢেঁড়স, পালং ইত্যাদি দীর্ঘদিনের গাছ এবং এগুলি দৈনিক সূর্যালোকের প্রয়োজন 12 ঘণ্টার কম নয়। আবার কিছু সব্জীর ছোট বা বড় দিন যে কোন অবস্থাতেই ফুল হতে দেখা যায়। এদের নাতিদীর্ঘদিন শ্রেণীতে রাখা হয়। বেগুন, লংকা ইত্যাদি সব্জী এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

সাধারণভাবে দেখা যায় শাক জাতীয় সব্জী লম্বা দিন পেলে বেশী খাদ্য সংশ্লেষ করে ও বেশী বাড়ে। কিন্তু ফুল ও ফল জাতীয় সব্জীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সূর্যালোক না হলে ফুল আসেনা। কাজেই খাদ্য ও তাপ ছাড়াও সূর্য্যালোক গাছের ফুল ও ফল ধরার উপর প্রভাব বিস্তার করে। আবার কোন কোন জাতের পেঁয়াজ, মোটা হওয়ার জন্য, দীর্ঘদিন পছন্দ করে।

বায়ুপ্রবাহ ঃ বায়ুপ্রবাহ, সাধারণত, বাষ্পমোচন ও পরাগ সংস্থাপনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। অবশ্য প্রবাহ বেশী হলে অনেক সব্জী গাছ ঝড়ে পড়ে যায় বা কান্ড ভেঙে যায়। বায়ুপ্রবাহ বেশী হলে, বাষ্পমোচন বেশী হতে দেখা যায়। এরকম অবস্থায়, মাটিতে প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা না থাকলে গাছ শুকিয়ে ঢোলে পড়ে। এছাড়া, বায়ুপ্রবাহ, পরাগসংযোগকারী পতঙ্গের গতিবিধি কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে। প্রবাহ বেশী হলে পরাগ সংযোগে ব্যাঘাত ঘটে।

কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও অক্সিজেন অনুপাত ঃ

কার্বন-ডাই-অক্সাইড, গাছ মূলত পারিপার্শ্বিক বায়ুস্তর থেকে আহরণ করে। বিভিন্ন কারণে আবহাওয়াতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব কম বা বেশী হতে পারে। ঋতু ও স্থান বিশেষে এটির ঘনত্ব বাড়ে বা কমে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকলে, গাছ কম পরিমাণে শর্করা তৈরী করে, পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত বেশী থাকলে, বেশী খাদ্য সংশ্লেষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কার্বন-ডাই-অক্সাইড খুব বেশী থাকলে গাছের ক্ষতি হয়। মাটির ভিতর কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেশী থাকলে শেকড়েরও ক্ষতি হয় এবং বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।

কার্বন-ডাই-অক্সাইড, সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে জলের বিজারণ ঘটিয়ে, খাদ্যে রূপান্তরিত হয়। অক্সিজেন শ্বসন কাজে ব্যবহৃত হয়। খাদ্য সংশ্লেষের মাধ্যমে উৎপন্ন শর্করা, গাছের প্রয়োজনে অক্সিজেনের দ্বারা জারিত হয়। দূষিত না হলে, বায়ুস্তরে অক্সিজেনের ঘনত্ব পরিবর্তিত হয় না। তবে মাটির মধ্যে অক্সিজেনের ঘনত্বে তারতম্য ঘটতে দেখা যায়। জলা জমির মাটির মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ কম বলে গাছের ক্ষতি হয়। এবং মূলের বৃদ্ধি কমে যায়। বায়ুস্তরে বা মাটীতে বেশী অক্সিজেন ক্ষতিকারক নয়। কিন্তু কার্বন-ডাই-অক্সাইড ক্ষতি কারক। কাজেই সব্জী গাছের বৃদ্ধি ও উৎপাদনশীলতা, আবহাওয়াতে এ দুটির ঘনত্বের উপর কিছুটা নির্ভরশীল।

মাটি ও সব্জী উৎপাদন ঃ মাটি উদ্ভিদ জগতের ভাতঘর। সব্জী এর ব্যতিক্রম নয়। মাটি থেকে সব্জীগাছ শেকড়ের মাধ্যমে খাদ্য, জল ইত্যাদি আহরণ করে, এছাড়া মাটিতে শেকড় আটকে থাকায় গাছ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রধানত অন্তস্থ শিলা, প্রাকৃতিক কারণে ক্ষয় হয়ে মাটিতে পরিণত হয়। অন্তস্থ শিলা থেকেই বেশ কিছু কিছু উদ্ভিদ খাদ্য মাটিতে সঞ্চারিত হয়। এছাড়া

প্রাণীজগৎ থেকেও জৈব পদার্থ মাটির সাথে মেশে। প্রকৃতির থেকে জল ও বায়ু সঞ্চিত হয়। এ সবকিছুর সংমিশ্রণে তৈরী হয় চাষোপযোগী মাটি। প্রাকৃতিক তারতম্যের সাথে সাথেই এগুলির অনুপাতের তারতম্য ঘটে এবং মাটির গুণগত পার্থক্য দেখা যায়।

এছাড়া, মৃত্তিকা কণিকার আকৃতি অনুসারেও মাটির প্রভেদ দেখা যায়। মোটা বালি কণার আকৃতি সব থেকে বড় (2·0—0·2 মি. মি.) অন্যদিকে কাদা কণার আকৃতি সব থেকে ছোট (0·—·302 মি. মি. অপেক্ষা ছোট) বিভিন্ন ধরনের কণার সংমিশ্রণে মাটি সৃষ্টি হয়। কাজেই বিভিন্ন মৃত্তিকা কণার অনুপাত অনুসারেও মাটির শ্রেণী ভাগ করা যায়, যেমন—বালি, পলি, কাদা, দোয়াঁশ, এঁটেল ইত্যাদি। সব মাটির খাদ্য, জল বা বায়ু ধারণ ক্ষমতা একই রকম নয়।

মাটির দানা যত বড় হবে, কণাগুলির মধ্যের মোট ফাঁকা জায়গা তত কমে যাবে এবং খাদ্য, জল, বায়ু ও জৈব পদার্থ ধারণ ক্ষমতাও তত কমে যাবে। বালি মাটির দানার মধ্যে মোটা ফাঁকা জায়গা কম থাকায় জল ধারণ ক্ষমতা কম এবং জল দিলে তাড়াতাড়ি নিষ্কাশিত হয়। অন্যদিকে পলি ও কাদা মাটির দানার মধ্যে মোট জায়গা বা ফাঁকা বেশী থাকায় জল ধারণ ক্ষমতা বেশী।

সব্জী চাষের জন্য এমন মাটি দরকার যা প্রয়োজনীয় জল, খাদ্য ও বাতাস ধরে রাখবে আর জল বেশী হলে ছেড়ে দেবে। মাটি হালকা হওয়াও বাঞ্ছনীয়। কাজেই কিছুটা বালি (30—50%), কিছুটা কাদা (50—30%) ও পলি (20%) দিয়ে যে দোয়াঁশ মাটি তৈরী হয়, সেটিই সব্জী চাষের উপযুক্ত। দোয়াঁশ মাটি কিছুটা হালকাও হয়, কেননা এর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ বালি (30—50%) বর্তমান থাকে। তাই এর জল নিষ্কাষণ ও ধারণ ক্ষমতা এবং খাদ্য, জৈব পদার্থ ও বায়ু ধারণ ক্ষমতাও উৎকৃষ্ট। মাটি হালকা বা ভারী হয় সাধারণত মৃত্তিকা কণার সন্নিবেশ অনুসারে। হালকা মাটিতে চাষ করার সুবিধে হয়, কিন্তু ভারি মাটি ঠিক সময়ে (অবস্থায়) লাঙ্গল করতে না পারলে চাষের উপযোগী হয় না ও মাধ্যমিক পরিচর্যা করতে অসুবিধা হয়।

মাটির রঙ দেখেও শ্রেণী বিন্যাস করা হয় ও উর্বরতা সম্বন্ধে আন্দাজ করা যায়। সাধারণত পলি বা কাদা মাটিতে জৈব পদার্থ বেশী থাকলে, এর রঙ গাঢ় হয়, তা সে লাল, কালো বা হলুদ যে কোন রঙেরই হতে পারে।

এছাড়া, মাটির ক্ষারত্ব বা অম্লত্ব, সব্জী নির্বাচন কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে। সব্জীর ক্ষার বা অম্লপ্রিয়তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ও সেই অনুযায়ী শ্রেণী

বিভাগ করা হয়েছে। মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়া অর্থাৎ ক্ষারত্ব বা অম্লত্ব অনুযায়ী কিছু কিছু উদ্ভিদ খাদ্যের নিষ্কাশন ও লভ্যতা বাড়ে। এছাড়া মৃত্তিকার উপকারী প্রাণীর (Aratobactor etc.) জন্ম ও বৃদ্ধি মৃত্তিকার রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। কাজেই এ সমস্ত কিছু বিবেচনা করে মৃত্তিকা বিশেষে সব্জী নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য কৃত্রিম উপায়ে মাটির ক্ষারত্ব বা অম্লত্ব কিছুটা পরিবর্তিত করা যায়। সাধারণভাবে মাটির বিক্রিয়া 6—7 পি. এইচ. হলে সব রকম সব্জীরই উচ্চ মানের ফলন আশা করা যায়।

উদ্ভিদ খাদ্য ঃ উদ্ভিদের প্রয়োজন অনুসারে উদ্ভিদ খাদ্যকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা হয়। কতকগুলি খাদ্য বেশী পরিমাণে লাগে, এদের মূল বা প্রধান খাদ্য বলা হয়। বর্তমান সময় পর্যন্ত দশটি মূল খাদ্য জানা গেছে। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, অঙ্গার, নাইট্রোজেন, পটাসিয়াম, ফসফরাস, চুন, লোহা, গন্ধক ও ম্যাগনেশিয়াম মূল খাদ্যের অন্তর্গত। এগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি প্রকৃতি থেকে সহজেই গাছ আহরণ করতে পারে। পরের সাতটি মূল খাদ্য প্রকৃতি থেকে কিছুটা পাওয়া গেলেও, কৃত্রিম উপায়ে যোগান দেওয়া হয়। এছাড়া আরো পাঁচটি অণুখাদ্য যেমন তামা, দস্তা, সোহাগা, মলিবডেনাম, ম্যাঙ্গানিজ ও দু-একটি বিশেষ অণুখাদ্য যেমন ক্লোরিন, সোডিয়াম ও বালি বা সিলিকল ক্ষেত্র বিশেষে নির্দিষ্ট গাছের জন্য দরকার হতে পারে।

উদ্ভিদ খাদ্য স্বাভাবিক বা প্রয়োজনমত না পেলে গাছের বৃদ্ধি ও পাতার রঙ দেখে বাইরে থেকে উদ্ভিদ খাদ্য অভাবজনিত রোগ নির্ণয় করা যায়, অবশ্য অভাব বেশী না হলে এগুলি প্রকটিত হবে না। অল্প অভাব বা আধিক্য পাতার বা গাছের অংশ বিশেষের রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব। প্রায় সব সব্জীগাছের নির্দিষ্ট চাহিদা অবশ্য গবেষণা ও পরীক্ষার মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়েছে। কোন বিশেষ সব্জীর পাতা বা অংশ বিশেষের রাসায়নিক পরীক্ষা করে, এগুলির সাথে তুলনা করলে, অভাব ও আধিক্য নিরূপণ করা সহজ হয়।

সব্জী গাছের সম্পূর্ণ উদ্ভিদ খাদ্য মেটানোর জন্য প্রচুর গবেষণা হয়েছে। এগুলি থেকে 'হোগল্যাণ্ড' সাহেব একটি মিশ্রণ প্রস্তুত করেন। যেটি সমস্ত উদ্ভিদ খাদ্যে ভরপুর। পরবর্তীকালে, হেউইট সাহেব হোগল্যাণ্ড সাহেবের মিশ্রণটি কিছুটা পরিবর্তন ও উন্নত করেন। এই মিশ্রণগুলি জলীয় দ্রবণে গুলে গাছের পাতায় প্রয়োগ করলে উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া, নির্দিষ্ট সময়ের

পর সব্জী চারা বীজতলা থেকে তুলে, চারার শেকড় একদিন ঐ মিশ্রণে ডুবিয়ে রাখলে পরবর্তীকালে চারার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। অণুখাদ্যের অভাব দেখা দিলে, নির্দিষ্ট অণুখাদ্য জলীয় দ্রবণে মিশিয়ে গাছে ছড়ান যেতে পারে বা উপরিউক্ত মিশ্রণগুলির যে কোন একটি পাতায় প্রয়োগ করা যেতে পারে ও অভাবজনিত রোগ নির্মূল করা যায়।

পরিসংখ্যান—5 : হোগল্যান্ড সাহেবের সম্পূর্ণ উদ্ভিদ খাদ্য মিশ্রণ।

ক্রমিক সংখ্যা	লবণ	লিটার প্রতি গ্রাম
(1)	পটাসিয়াম নাইট্রেট্	1·02
(2)	ক্যালসিয়াম নাইট্রেট্	0·49
(3)	এ্যামোনিয়াম্ ফসফেট	0·23
(4)	ম্যাগসালফ্	0·49
(5)	বোরিক এ্যাসিড	2·86
(6)	ম্যাঙ্গানিজ ক্লোরাইড	1·41
(7)	তুঁতে	0·08
(8)	জিঙ্ক সালফেট	0·22
(9)	সোডিয়াম মলিবডেট্	0·09
(10)	0·05 ফেরাস সালফেট ও টার্টারিক এ্যাসিড 0·4°/。	0·6

হোগল্যান্ড সাহেবের মিশ্রণটি 1963 সালে হেউইট সাহেব কিছুটা সংশোধন করেন ; যা আজও অব্যাহত হচ্ছে। হেউইট সাহেবের মিশ্রণটি প্রায় এগারটি লবণ সংযোগে তৈরী এবং এর কার্যকারিতা কিছুটা বেশী।

পরিসংখ্যান—6 : হেউইট সাহেবের সম্পূর্ণ উদ্ভিদ খাদ্য মিশ্রণ।

ক্রমিক সংখ্যা	লবণ	লিটার প্রতি গ্রাম
(1)	পটাসিয়াম নাইট্রেট্	0·505
(2)	ক্যালসিয়াম নাইট্রেট্	0·820
(3)	সোডিয়াম্ ডাই-হাইড্রোজেন ফস্ফেট্	0·208
(4)	ম্যগসালফ্	0·369

ক্রমিক সংখ্যা	লবণ	লিটার প্রতি গ্রাম
(5)	ফেরিক সাইট্রেট্	0·0245
(6)	ম্যাঙ্গানিজ সালফেট্	0·00223
(7)	তুঁতে	0·00024
(8)	জিঙ্ক সালফেট্	0·000216
(9)	বোরিক্ এ্যাসিড	0·00186
(10)	এ্যামোনিয়াম্ মলিবডেট্	0·000035
(11)	লবণ বা সোডিয়াম্ ক্লোরাইড	0·00585

বর্তমানে তেজস্ক্রিয় ধাতু ব্যবহার করেও এগুলির প্রয়োজন, প্রয়োগকাল গতিপথ ও মোট চাহিদা নিরূপণ সম্ভব হচ্ছে।

জমিতে বিভিন্ন হারে সার প্রয়োগ করে ও উৎপাদনের তারতম্য দেখেও উদ্ভিদ খাদ্যের প্রয়োজন নিরূপণ করা যেতে পারে। সার প্রয়োগের সময় ও পরিমাণের পরিবর্তন ঘটিয়ে, ফলন তুলনা করে উৎকৃষ্ট উৎপাদনশীল ব্যবস্থা নিরূপণ করে, চাষীদের মধ্যে পেঁছে দেওয়া হয়।

এতক্ষণ উদ্ভিদ খাদ্যের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করা হলেও প্রয়োগ পদ্ধতি সমন্ধে বিশেষ কিছু বলা হয় নি। উদ্ভিদখাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি নানা রকমের হতে পারে, তবে তা নির্ভর করবে প্রধানত শস্যের প্রকার, আবহাওয়া, মাটি ও উদ্ভিদ খাদ্যের প্রকারের উপর। অবশ্য, শস্য চাষের পদ্ধতি এবং প্রয়োগের স্থানও উদ্ভিদ খাদ্য প্রয়োগপদ্ধতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে। সবকিছু বিবেচনা করেই প্রয়োগপদ্ধতি স্থির করা হয় এবং এগুলির বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। অবশ্য প্রত্যেকটি পদ্ধতির কিছু সুবিধা ও অসুবিধা আছে। চাষী সুবিধা ও অসুবিধা অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করেন। প্রয়োগানুসারে প্রাথমিকভাবে পদ্ধতিগুলিকে (i) প্রাথমিক প্রয়োগ ও (2) মাধ্যমিক প্রয়োগ বা চাপান এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রাথমিক প্রয়োগ কোথাও সমস্ত জমিতে ছড়িয়ে বা গাছের সারিতে করা হয়; আবার কোথাও প্রতিটি গাছের গোড়ায় বৃত্তাকারে দেওয়া হয়। সর্বত্রই, হয় জমি তৈরী বা গাছ রোপণের সময় প্রাথমিক প্রয়োগ করা হয়।

মাধ্যমিক প্রয়োগ, অবশ্য, উপরের পদ্ধতিগুলি ছাড়াও উদ্ভিদখাদ্য তরলাকৃত অবস্থায় পাতায় ছড়িয়ে করা যায়। এসব ক্ষেত্রে অল্প উদ্ভিদ খাদ্য জলে

(1 শতাংশের উপরে নয়) গুলে পাতায় ছড়ানো হয়। পাতায় ছড়ালে উদ্ভিদ খাদ্য অপেক্ষাকৃত অনেক কম লাগে এবং অত্যন্ত কম অপচয় হয়। কিছু কিছু উদ্ভিদ খাদ্য জলে গুলে পাতায় প্রয়োগ করলে গাছের গ্রহণ করতে সুবিধা হয় ও সরাসরি অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করে ফেলে।

সার প্রয়োগের অন্য একটি পদ্ধতি আছে, যেটির মাধ্যমে চারাগুলিকে বীজ-তলা থেকে তুলে তরলাকৃত সারে সঞ্জীবিত করা হয় (এ সম্বন্ধে আগে কিছুটা বলা হয়েছে)। এটিকে "ষ্টাটার সলুউশন" বলা হয়। রোপণের আগে চারা-গুলিকে এভাবে 24 ঘণ্টা সঞ্জীবিত করলে চারার প্রাথমিক বৃদ্ধি ও গাছের ফলন বেশী হতে দেখা যায়। চারা রোপণের সময়ও, জলের পরিবর্তে এটি ব্যবহার করা যায়। সারের দ্রবতা অনুসারে দ্রবণের ঘনত্ব 1—2·5% হতে পারে।

সব্জীতে, প্রকার ভেদে, সব পদ্ধতিগুলোই বিভিন্নস্থানে প্রয়োগ করা হয়। জমির উর্বরতার উপর প্রয়োগ পদ্ধতির কার্যকারিতা নির্ভরশীল। হাল্কা অনুর্বর জমিতে বা মাটিতে, "ষ্টাটার সলুউশন" ও তরল সার কার্যকারী হলেও উর্বর মাটিতে এগুলির প্রভাব বিশেষ চোখে পড়ে না। কিছু কিছু সব্জী যেমন—লংকা, পেঁয়াজ, বেগুন, টোমাটো, বাঁধাকপি ও ফুলকপি ইত্যাদিতে "ষ্টাটার সলিউশন"-এর উপকারিতা নিয়ে গবেষণা হয়েছে ও ইতিবাচক ফল পাওয়া গেছে।

উদ্ভিদ খাদ্যের উৎস ঃ

উদ্ভিদ খাদ্য, প্রধানত, জৈব ও অজৈব উপাদান থেকে সংগৃহীত হয়। জৈব উপাদান, উদ্ভিদ খাদ্য সরবরাহ ছাড়াও, মাটির প্রভূত উন্নতি করে। জৈবসার সাধারণত, সবুজ সার, গোবর, শহরের আবর্জনা, খামার পচা সার, ইত্যাদি হতে তৈরী করা হয়। জৈবসারে, উৎসের তারতম্য অনুযায়ী, উদ্ভিদখাদ্যের অনুপাতের তারতম্য ঘটে।

ডাল জাতীয় শস্য চাষ করে সবুজ সার তৈরী করলে জমিতে জৈবসার সরবরাহ ছাড়াও মিথোজীবি ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে বায়বীয় নাইট্রোজেন সঞ্চিত হয়। শস্যের বৃদ্ধি ও মিশ্রণের অবস্থার উপর নির্ভর করলেও জৈবসার হিসাবে ডাল জাতীয় শস্য চাষ করলে হেক্টরে মোটামুটি 50—125 কেজি নাইট্রোজেন সার সংগৃহীত হয়। আমাদের দেশে ধইনচা, কালোকলাই, শন ও বরবটী ইত্যাদি শস্য সবুজ সার হিসাবে ব্যবহার বা চাষ করা হয়।

পচান গোবর সার, শহরের আবর্জনা এবং খামারের পচা সারও উৎকৃষ্ট জৈবসার। সবগুলিই প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ বা উদ্ভিদ পচিয়ে তৈরী করা হয়।

অজৈব উদ্ভিদ খাদ্য প্রধানত কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন সার। ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত কারখানা সমূহে নানা ধরনের সার যথা—ইউরিয়া, এ্যামোনিয়াম সালফেট, মিউরিয়েট অফ্ পটাশ, পটাসিয়াম সালফেট, এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ডাই-এ্যামোনিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, এ্যামোনিয়াম মলিবডেট, বোরাক্স, কপার সালফেট, ফেরাস সালফেট, জিঙ্ক সালফেট, ইত্যাদি বিভিন্ন আকারে উৎপাদিত হয়।

নাইট্রোজেন ঘটিত সার ইউরিয়া প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হচ্ছে। ইউরিয়া কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন হলেও বস্তুত এটিই একমাত্র জৈবসার হিসাবেও বিবেচনা করা হয়। বোনমিল বা হাড় গুড়ো, মিশোরী ফস বা পুরুলিয়া ফস্ ইত্যাদি জৈবসার হিসাবেই বিবেচিত হয়। বর্তমানে বাজারে একাধিক উপাদান সম্বলিত সারও উৎপন্ন হচ্ছে। এগুলির কয়েকটি উদাহরণ যেমন ক্যালসিয়াম, এ্যামোনিয়াম, নাইট্রেট বা সোনা সার এবং সুফলা সার। এগুলিতে একাধিক উদ্ভিদ খাদ্যোপাদান মিশ্রিত থাকে।

জৈব ও অজৈব সার গুলির মধ্যে কিছু সারে তাৎক্ষণিক ফল পাওয়া যায়। আবার কিছু সারে প্রলম্বিত ফল পাওয়া যায়। যা পরবর্তী ফসলেরও উপকারে আসে। ইউরিয়া ব্যতিত প্রায় সব জৈবসারেই খাদ্যোপাদান আস্তে আস্তে গ্রহণীয় অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। কিছু সারের স্বাভাবিক বিক্রিয়া অম্ল আবার কিছু সারের ক্ষারীয়। কাজেই মাটির বিক্রিয়া অনুসারে এদের নির্বাচন করা উচিত। সার প্রয়োগে মাটি বেশী অম্ল বা ক্ষার হলে উদ্ভিদ উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে।

খাদ্যোপাদানের উৎস যাই হোক না কেন, বিভিন্ন সব্জী নির্দিষ্ট পরিমাণ উদ্ভিদ খাদ্য না পেলে ঠিকমত ফলন দেবে না। নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যোপাদান প্রয়োগ করে, বর্তমানে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে। আজকাল অজৈব সারের মাধ্যমেই উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করা হয়। এর ফলে অজৈব সারের ব্যবহার পূর্বাপেক্ষা অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছে। দেশে বিভিন্ন অনুপাতের নানা ধরনের অজৈব সার উৎপাদনও চাষীদের সার প্রয়োগ সহজ করে দিয়েছে। এছাড়া অজৈব সারে উদ্ভিদ খাদ্যের অনুপাতও অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে এবং তাৎক্ষণিক ফল পাওয়া যায়। এগুলি গুদাম জাত করার জন্য বেশী জায়গার প্রয়োজন হয় না। বাজারে প্রয়োজন মাফিক পাওয়া যায়। এই সুবিধাগুলিই অজৈব সার প্রয়োগের প্রবণতাও এর ব্যবহারের পরিমাণ বাড়িয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সব্জী ও আগাছা

আগাছা ও আগাছা নিয়ন্ত্রণ ঃ শস্য ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত গাছকেই আগাছা বলা হয়। সে গাছ তৃণ গুল্ম হতে পারে, আবার অন্য কোন বহুবর্ষজীবী গাছও হতে পারে।

আগাছা বর্ষজীবী, দ্বিবর্ষজীবী বা বহু বর্ষজীবী হতে পারে। বর্ষজীবী আগাছা আবার শীত ও গ্রীষ্মকালীন এই দুই ভাগে বিভক্ত হতে পারে। শীতকালীন আগাছার শরৎ বা শীতকালে অঙ্কুরোদ্গম হয়। শীত ও বসন্তকালে বৃদ্ধি পায় এবং গ্রীষ্মকালে এদের মৃত্যু ঘটে, জীবন চক্র শেষ হয়। গ্রীষ্ম-কালীন আগাছার বসন্তে অঙ্কুরোদ্গম হয়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে গাছ বাড়ে ও হেমন্ত বা শীতকালে জীবন চক্র শেষ হয়। উভয় ক্ষেত্রেই বীজ-এর মাধ্যমে বংশ বিস্তার হয়। বীজ হয়ে গেলে, সুপ্ত অবস্থায় মাটির মধ্যে পরবর্তী উপযুক্ত আবহাওয়ার অপেক্ষায় অবস্থান করে। এই আগাছাগুলির অঙ্কুরোদ্গমের জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রা দরকার হয়।

দ্বিবর্ষজীবী আগাছাগুলি দুই বছরের মধ্যে জীবনচক্র সম্পূর্ণ করে। এগুলিও প্রধানত, বীজের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে। পক্ষান্তরে, বহু বর্ষজীবী আগাছাগুলি দু বছরের অধিক কাল বেঁচে থাকে। বৎসরান্তে ফুল ও বীজ হয়। এগুলি বীজ ও অঙ্গ বিভাজনের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে। এগুলির মধ্যে কতকগুলো সাধারণ আবার কতকগুলো লতানো। সাধারণগুলি বীজ দ্বারা বংশ বিস্তার করলেও লতানোগুলি প্রায়ই অঙ্গজ বিভাজনের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে এবং এগুলি দমন করা খুব কঠিন।

অনেকের মনেই প্রশ্ন আসতে পারে, আগাছা সব্জী চাষে কি ক্ষতি করে? অবশ্য আজকাল উৎসাহী চাষী মাত্রেই জানেন, আগাছা যে কোন ফসলেরই ক্ষতি করে উৎপাদন কমিয়ে দেওয়া ছাড়াও, আগাছা উৎপাদিত শস্যের মান কমিয়ে দেয়; শস্যরক্ষা পদ্ধতি দুরূহ করে; জমিতে সেচের অসুবিধা ঘটায়; সেচের জল ও শস্যের জন্য ব্যবহৃত সারে ভাগ বসায়; যন্ত্র ব্যবহারে অসুবিধা ঘটায়; চাষের খরচ বাড়িয়ে দেয় ও সামগ্রিকভাবে জমির কদর কমিয়ে দেয়।

আগাছা দমন ঃ

উপরের কারণগুলি থেকে এটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে শস্যের চাষ করতে হলে আগাছা দমন একটি অবশ্য করণীয় পদক্ষেপ। সাধারণত, কতকগুলি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আগাছা দমন করা হয়। এই নীতিগুলি বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রিত হয়। মূল আগাছা দমনের মূলনীতিগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা ঃ (1) আগাছা প্রতিরোধ (2) আগাছা নিয়ন্ত্রণ ও (3) আগাছা নির্মূল।

আগাছা প্রতিরোধ বলতে যে কোনও ভাবে আগাছা সংক্রমণ ব্যাহত করা অর্থাৎ বাইরে থেকে খামারের ভেতর বা ভেতর থেকে বাইরে সব রকমের সংক্রমণ প্রতিরোধ করার নীতিকে আগাছা প্রতিরোধ নীতি বলা হয়। আগাছার সংখ্যা ও পরিমাণ সীমিত করাকে আগাছা নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। অর্থাৎ আগাছা বৃদ্ধির সীমিতকরণ পদ্ধতিগুলিকেই নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। আগাছা নিয়ন্ত্রণ নীতি মূলত কোন খামারের মধ্যে আগাছা বৃদ্ধি সীমিতকরণ পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। পদ্ধতিগুলি নিয়ন্ত্রণের খরচ ও উৎপাদন বৃদ্ধিজনিত লাভের অনুপাতের ওপর নির্ভরশীল।

পক্ষান্তরে নির্মূলপদ্ধতি বলতে সেই পদ্ধতিগুলিকেই বোঝায় যার দ্বারা সব রকমের আগাছা সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করা যায়। মূলত নিবীর্জন পদ্ধতির দ্বারা মাটির মধ্যে আগাছার বীজ, মূল বা কাণ্ডের অংশ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয়। তবে নির্মূল পদ্ধতি বেশ সময় সাপেক্ষ এবং নিবীর্জন পদ্ধতিও ব্যায় সাপেক্ষ।

আগাছা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ঃ

প্রয়োগানুসারে আগাছা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বিভিন্ন হতে দেখা যায়। এগুলি প্রধানত শস্যের প্রকার, আগাছার রকম, খরচ, আবহাওয়া ও মাটির তারতম্যের উপর নির্ভরশীল। বর্তমান প্রয়োগ কৌশলানুসারে পদ্ধতিগুলিকে মোটামুটি তিনটি প্রাথমিক ভাগে ভাগ করা যায়। প্রতিটি প্রাথমিক ভাগকে আবার কতকগুলি পরবর্তী ভাগে ভাগ করা হয়।

প্রাথমিক ভাগ ও পরবর্তী ভাগগুলি নিচে উল্লেখ করে, পরে এগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হ'ল।

(1) যান্ত্রিক পদ্ধতি ঃ

(ক) লাঙ্গল, বিঁদে ও ছাঁটাই যন্ত্রের ব্যবহার।

(খ) আচ্ছাদনের ব্যবহার।

(গ) আগুনের ব্যবহার।

(2) জীববিদ্যা সম্বন্ধীয় পদ্ধতি ঃ

(ক) শস্য প্রতিযোগিতা।

(খ) শস্য পর্যায়।

(গ) শিকারী জীব প্রয়োগ।

(3) রাসায়নিক পদ্ধতি ঃ

(ক) সংস্পর্শ সংক্রামক রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার।

(খ) হরমোনের ব্যবহার।

(গ) মৃত্তিকা নির্বীজনকারী রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার।

(1) যান্ত্রিক পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিতে যন্ত্র বা কলের সাহায্যে আগাছা প্রসার নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল করা যায়। এর মধ্যে কিছু পদ্ধতি যেমন লাঙ্গল, বা বিঁদের সাহায্যে জমির আগাছা চাষ দিয়ে উল্টে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়, বা বেছে আলাদা করে পরে নষ্ট করে ফেলা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে আগাছা জন্মাতে দেওয়া হয় না। অন্যত্র বিভিন্ন পদ্ধতিতে আগাছা নির্জীব করা বা মেরে ফেলা হয়।

(ক) লাঙ্গল, বিঁদে বা ছাঁটাই যন্ত্রের ব্যবহার করে আগাছার মূল ও কাণ্ডের স্থিতিশীলতা নষ্ট করা হয়। লাঙ্গল দিয়ে চাষ দিলে মাটি কর্ষিত হয় এবং আগাছা হয় উপড়ে যায় অথবা শেকড় ও কাণ্ড কেটে মাটির সাথে মিশে যায়। ঠিক মত চাষের মাধ্যমে আগাছা প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল করা যেতে পারে ; তবে সেটা নির্ভর করবে কখন, কতটা গভীর ও কতবার চাষ দেওয়া হচ্ছে তার উপর।

বিঁদের মাধ্যমে হালকাভাবে চাষ দেওয়া হয়। হালকা চাষে আগাছা উপড়ে গেলে সেগুলো বেছে নিয়ে নষ্ট করে ফেলা হয়। হালকা চাষে যেগুলো উপড়ে যায় না, সেগুলোর শেকড় ছিঁড়ে যায়, মাটির রস না থাকলে ও আবহাওয়া শুকনো হলে, জলের অভাবে আগাছাগুলো ঝিমিয়ে পড়ে। এই পদ্ধতি, বর্ষ, দ্বিবর্ষ বা বহু বর্ষজীবী আগাছা নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবে কার্যকর। কিন্তু এগুলি যদি একটু বড় হয়ে যায়, তাহলে খাদ্য সঞ্চয় বা বংশ বৃদ্ধি করে। এ অবস্থায় হালকা চাষে কোন কাজ হয় না। তখন গভীর চাষ দিয়ে মাটি উল্টে

দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে ছাঁটাই যন্ত্রের সাহায্যে আগাছার উপরিভাগ ছেঁটে দিলে এগুলির খাদ্য সঞ্চয়ে ব্যাঘাত ঘটে। তখন নতুন পাতা ও শাখা সৃষ্টির জন্য সঞ্চিত খাদ্য ব্যবহার করতে হয়। ফলে, যখন আগাছা বাড়তে আরম্ভ করে, তার আগেই মূল ফসল বেড়ে যায়। এর ফলে, আগাছা বাড়ার আর কোন সুযোগ থাকে না। বার বার ছাঁটাই যন্ত্রের সাহায্যে যদি আগাছার শাখা প্রশাখা ছেঁটে দেওয়া যায়, তাহলে সঞ্চিত খাদ্যে টান পড়ে। শেষে আগাছা মারা যায়। আগাছা দমনের ক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখা দরকার। আগাছার ফুল হওয়ার আগেই বিনাস করা উচিত। তা না হলে ফুল থেকে ফল ও বীজ এবং পরে সেই বীজ থেকে আগাছার বংশ বৃদ্ধি হয়। এমনও দেখা গেছে, কিছু কিছু আগাছায় পরাগ সংযোগের সাথে সাথেই বীজের অংকুরোদ্গম হয়।

লাঙ্গল বা বিদার সাহায্যে বার বার চাষ দিয়ে আগাছা দমন করার সময় দেখা দরকার যে, মাটি কি ধরনের বা কি ধরনের ফসল চাষ করা হচ্ছে এবং সেই ফসলের মূলের বৈশিষ্ট্য কি ? যদি দেখা যায় ভারি মাটি, সে ক্ষেত্রে বার বার লাঙ্গল দিয়ে আগাছা দমনের অসুবিধা নেই। মোটা ও হালকা মাটিতে এ পদ্ধতি উপযোগী নয়। সেই সাথে মূল ফসলের মূলের অবস্থান লক্ষ্য করে চাষ দেওয়া উচিত। যেমন—বেগুন, টম্যোটো, কপি প্রভৃতি শস্যে প্রচুর সরু সরু মূল মাটির অগভীর স্তরে বিস্তৃত থাকে। এ ক্ষেত্রে বার বার লাঙ্গল ও বিঁদা দেওয়ার ফলে ফসলের সমূহ ক্ষতির সম্ভবনা থাকে।

(খ) **মালচিং ঃ** আগাছা দমনের ক্ষেত্রে মালচিং বা আচ্ছাদনের-এর একটা বিরাট ভূমিকা আছে। মালচিং-এর সাহায্যে মাটির উত্তাপ ও আর্দ্রতা ধরে রাখা যায়। সূর্যের উত্তাপ থেকে মাটির উপরি ভাগকে রক্ষা করা যায় এবং মাটির ক্ষয় রোধ করা যায়, সর্ব্বোপরি আগাছা দমনের জন্য ভাল মালচিং একটি বিরাট অস্ত্র। মালচিং নানান পদার্থ দিয়ে করা যায়, যেমন—কাগজ, প্লাসস্টিক, খড়, কাঠের গুঁড়ো এবং পলিথিন। অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের তেলও ব্যবহার করা হয়। সাধারণত লতানো শস্যের ক্ষেত্রে মালচিং-এর ফলে আগাছা জন্মাতে পারে না। অল্প কিছু জন্মালেও তা হাত দিয়ে তুলে ফেলা যায়। একটা কথা বলা দরকার মালচিং-এর জন্য ব্যবহৃত জিনিসগুলির দাম খুব বেশী হয় না।

(গ) **অগ্নের ব্যবহার ঃ** আগ্নের সাহায্যে আগাছা দমনের রেওয়াজ অনেকদিন থেকেই প্রচলিত আছে। এর ফলে অবাঞ্ছিত গাছপালা পুড়ে গেলেও সেগুলির বীজ সব সময় নষ্ট হয় না।

পরিমিত বা সীমিত আগুনেও আগাছা দমন করা যায়। সাধারণত, লাইন করে যে সব ফসল চাষ করা হয় সেই সব ফসলের জমিতে আগাছা দমন করার জন্য টক্‌টকে উজ্জ্বল আগুনের শিখা ব্যবহার করা হয়। ঐ শিখা ব্যবহার করার জন্য এক ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। যন্ত্রে আগুনের শিখা কমানো ও বাড়ানো যায়। যন্ত্রটিতে জ্বালানী হিসাবে বিউটান অথবা প্রোপেন গ্যাস অথবা দুই গ্যাসের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। আগুনের সাহায্যে, এভাবে মূল শস্যের ক্ষতি না করে, প্রায় 4—6 মাস আগাছার বৃদ্ধি পিছিয়ে দেওয়া যায়।

(2) **জীবের সাহায্যে আগাছা দমন ঃ** জীবের সাহায্যে আগাছা দমন মূলতঃ দমনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই পদ্ধতিতে আগাছাকে সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ করা যায় না। আগাছা দমনের প্রশ্নে পদ্ধতিগত দিকটি দেখা দরকার। জীবের সাহায্যে দমনের মূল কথা প্রতিযোগিতা এবং খাদ্য খাদক সম্পর্ক সৃষ্টি করা। জীবের সাহায্যে আগাছা দমন পদ্ধতিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা ঃ

(ক) **শস্য প্রতিযোগিতা ঃ** শস্য প্রতিযোগিতা এক প্রকার আগাছা দমন পদ্ধতি। কারণ আগাছা, শস্যের সাথে আলো, বাতাস, খাদ্য ইত্যাদির জন্য প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা করে। সাধারণত, আগাছার বৃদ্ধি ও সহনশীলতা শস্যের থেকে অনেক বেশী। যদি পরিচর্যার সাহায্যে শস্যের বৃদ্ধি আগাছার থেকে বেশী করা যায় তা হলে প্রতিযোগিতায় আগাছা পেরে ওঠে না। তাছাড়া মূলশস্য ঘন করে বপন করলেও আগাছা বাড়ার সুযোগ থাকে না। এভাবেই শস্য প্রতিযোগিতা পদ্ধতিতে আগাছা দমন করা হয়।

(খ) **শস্য পর্যায় ঃ** শস্য পর্যায় একটি অতি সহজ ও পুরোনো আগাছা দমন পদ্ধতি। কোন জমিতে পর্যায়ক্রমে শস্য উৎপন্ন করলে সেখানে আগাছা জন্মাতে পারে না। কারণ কোন সময়ই জমি খালি থাকে না। এছাড়া বার বার মাধ্যমিক পরিচর্যার ফলে, আগাছা নির্মূল হয়ে যায়। কিছু কিছু আগাছা আবার নির্দিষ্ট শস্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠতে পারে না। যেমন মূলোর মাঠে মুথা, ঘাস প্রভৃতি। শস্য পর্যায় ও সেই সাথে ফসলের মাধ্যমিক

পরিচর্যার মাধ্যমে যেমন আগাছা দমন করা যায়, ঠিক একই ভাবে আগাছার জন্মলগ্ন ও বংশবৃদ্ধির সময় মনে রেখে শস্য পর্যায় অনুসরণ করলে অতি সহজে ও অল্প খরচে আগাছা দমন করা যায়।

(গ) **ধ্বংসকারী জীব ও জীবাণু ব্যবহার ঃ** অনেক সময় কীটপতঙ্গ অথবা জীবাণুর সাহায্যে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় অপ্রয়োজনীয় গাছপালা নষ্ট করে ফেলা হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, অস্ট্রেলিয়ায় এক সময়ে শেয়াল কাটা ও ফণিমনষার চাষ, বাহারী গাছ হিসাবে প্রচুর পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করে। উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে এগুলি কিছু দিনের মধ্যে এত বেশী বংশ বৃদ্ধি করে যে, প্রায় 60 মিলিয়ন একর জমি দখল করে বসে এবং চাষের জমির উপর আধিপত্য বিস্তার করে, যার ফলে সেখানে শস্য চাষ বিপন্ন হয়। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আর্জেনটিনা থেকে এক রকম পোকা এনে সেগুলো আগাছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। পোকাগুলো শুধুমাত্র আগাছাগুলো খেয়ে ফেলে কিন্তু অন্যান্য ফসলের কোন ক্ষতি করে না। দেখা যায়, ছয় বছরের মধ্যেই পোকাগুলির এত বেশী বংশ বৃদ্ধি হয়েছে যে, খাবারের অভাবে সেগুলিও মারা যাচ্ছে। এভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য তৈরী হওয়ায় আগাছা ও পোকার বৃদ্ধি সীমিত হয়।

(3) **রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আগাছা দমন ঃ** জৈব অথবা অজৈব রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করেও আগাছা দমন করা যায়। এগুলিকে আগাছা দমনকারী ওষুধ বা "হারবিসাইড" বলে।

আগাছা দমনের জন্য দরকারী নানান ঔষধ বিগত 20—25 বৎসরের মধ্যে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করেছেন। 1859-87 সালে বৈজ্ঞানিক সাচ্ দেখেন যে, বিগোনিয়া এবং স্কোরাসের ক্ষেত্রে, এমন একটি রাসায়নিক পদার্থ কাজ করছে, সেটা মূল ও ফুল হওয়াতে সাহায্য করে। পরে 1880 সালে চারলস ডারউইন কয়েকটি ফসলের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানালেন যে, গাছের বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি জৈব পদার্থের দরকার হয়, সেগুলিকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় হরমোন বলা হয়। আরো পরে 1941 সালে পোকরনি নামে একজন বৈজ্ঞানিক 2, 4-ডি নামে একটি রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কার করেন এবং এটি 1942 সালে হরমোন হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। 2, 4-ডি, কিভাবে এবং কোথায় কোথায় ব্যবহার করা যায় তার ধ্যান ধারণা দেন বৈজ্ঞানিক মার্থ ও মিচেল এবং হামনার ও টাকি 1944 সালে। এর পর 1945 সালে টেমপেল

ম্যান জানালেন যে, 2, 4-ডি, কোন কোন আগাছা দমনের জন্য ব্যবহার করা যায়।

অপরপক্ষে বোনেট ও স্কোলটা 1897—1900 সালে এবং বোলি 1908 সালে জানালেন যে, বিভিন্ন প্রকার অজৈব লবণ দিয়েও আগাছা দমন করা যায়। যেমন তুঁতের জল দিয়ে চওড়া পাতাযুক্ত আগাছা দমন করা যায়। তেমনি খাবার লবণ, আয়রণ ফসফেট, এবং সোডিয়াম আরসেনাইট দিয়েও ভালভাবে আগাছা দমন করা যায়।

যাইহোক, প্রয়োগ ও প্রভাব বিস্তার অনুযায়ী আগাছা দমনকারী রাসায়নিক পদার্থকে মূলতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) স্পর্শকারী (খ) বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ও (গ) মৃত্তিকা শোধনকারী।

(ক) **স্পর্শকারী ঃ** এগুলির সংস্পর্শে এলেই আগাছার পাতা, শাখা, প্রশাখা প্রভৃতি মরে যায়। ফলে খুব দ্রুত আগাছার নিঃশেষ হয়। বর্ষজীবী আগাছার ক্ষেত্রে এগুলি খুবই কার্যকারী। এগুলি দুই প্রকারের হতে পারে—যেমন (i) নির্দিষ্ট (ii) অনির্দিষ্ট।

(i) নির্দিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্য বলতে বিশেষ শস্যের ক্ষেত্রে কার্যকরী দ্রব্যকে বোঝায়। এগুলি নির্দিষ্ট আগাছা ছাড়া অন্য কোন ফসলের ক্ষতি সাধন করে না। যেমন সয়াবিন, মটর ও সীম এর ক্ষেত্রে 2, 6-ডাইনাইট্রো-ও-সেক্, বিউটাইলফেনল (DNBP) প্রভৃতি এবং পেনটাক্লোরোফেনল (PCP), প্রভৃতি নির্দিষ্ট ঔষধ।

(ii) অনির্দিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করলে সম্পূর্ণ ফসল, বিক্রিয়ার ফলে মারা যেতে পারে। তেমনি তেলযুক্ত ডি, এন, বি, পি অথবা পি, সি, পি মূল ফসলে প্রয়োগ করলে আগাছা সমেত সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

(খ) **বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক রাসায়নিক ঔষধ** (Growth Regulators) ঃ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করার ফলে, আগাছা মূল ও কাণ্ডের সাহায্যে পুরোটাই গ্রহণ করে। এগুলি অভ্যন্তরিক রাসায়নিগ বিক্রিয়া ও উৎসেচক প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটায়। বৈজ্ঞানিক র‍্যাভেল ও চ্যাটার্জি 1972 সালে 2, 4-ডি এবং 2, 4, 5টি বেশী মাত্রায় (1000 পি, পি, এম) প্রয়োগ করে দেখলেন, আগাছার মধ্যে শর্করার ভাগ কমে গেছে। এইভাবে বেশী মাত্রায় বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক পদার্থ প্রয়োগ করলে, আভ্যন্তরীণ পদ্ধতি আক্রান্ত হয়ে গাছ মারা যায়। বর্ষজীবী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক রাসায়নিক

ঔষধ খুবই কার্যকারী। কিন্তু বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ এবং মাটির তলায় খাদ্য সঞ্চয়কারী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে, অল্প মাত্রায় প্রয়োগ দ্রব্যটিকে পাতার সাহায্যে মূলে পেঁছাতে সাহায্য করেও গাছটি মারা যায়। অবশ্য প্রয়োগের সাথে সাথেই ফলাফল আশা করা যায় না। কিছুদিন সময় লাগে (2—3 দিন থেকে 2—3 সপ্তাহ)।

বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক রাসায়নিক পদার্থ আগাছা বিশেষে বাছাই করে প্রয়োগ মাত্রা ঠিক করলে খুবই সুফল পাওয়া যায়। বাজারে বেশ কয়েকটি বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক দ্রব্য কিনতে পাওয়া যায় ; যেমন—2, 4-ডি ; এম্ সি পি এ ; 2, 4, 5টি ; 2, 4, 5টি পি প্রভৃতি।

(গ) **মৃত্তিকা পরিশোধক রাসায়নিক ঔষধ** (Soil sterilants) **ঃ** মৃত্তিকা শোধনকারী দ্রব্যও এক ধরনের রাসায়নিক ঔষধ যা স্পর্শকারী অথবা নিয়মানুগ আগাছা দমনকারী। মাটিতে প্রয়োগের ফলে মাটির বন্ধ্যাত্ব এনে দেয়, যার ফলে গাছের বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। এই বন্ধ্যাত্ব ক্ষণস্থায়ী (অর্থাৎ 48 ঘণ্টার কম সময়)। স্বল্পস্থায়ী (অর্থাৎ প্রায় 4 মাস), চিরস্থায়ী (অর্থাৎ 2 বৎসরের অধিক) হতে দেখা যায়। প্রয়োজনানুসারে নির্দিষ্ট স্থায়ীত্বে রাসায়নিক পদার্থ নির্বাচন ও প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যাবে ও চাষের খরচ অনেক কম হবে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগের পর নির্দিষ্ট সময়সীমা পার করে শস্য রোপণ বা বপন করা বাঞ্ছনীয়।

রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের সময় ঃ

সাধারণতঃ সময়মত ঔষধ প্রয়োগের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। এই দ্রব্য-গুলি নির্বাচনের উপর আগাছার পরিব্যাপ্তি, শস্যের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এবং প্রাকৃতিক অবস্থার বিশেষ প্রভাব আছে। ঔষধ প্রয়োগ পদ্ধতিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) প্রাক্ নির্গমন (খ) নির্গমনোত্তর।

(ক) **প্রাক্ নির্গমন ঃ** শস্য বা আগাছা বের হবার আগেই ঔষধ প্রয়োগকে প্রাক্ নির্গমন বলে। প্রাক্ নির্গমন পদ্ধতিতে শস্যের কিংবা আগাছার অথবা উভয়ের নির্গমনের আগে আগাছা দমনকারী রাসায়নিক ঔষধ প্রয়োগ একান্ত বাঞ্ছনীয়। শস্য চারা নির্গমন হয়ে গেলে, এগুলি প্রয়োগ করা যায় না এবং প্রয়োগ করলে শস্য সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার সম্ভবনা থাকে।

(খ) **নির্গমনোত্তর ঃ** নির্গমনোত্তর ঔষধ প্রয়োগের ফলে আগাছা ও মূল

শস্য উভয়েই মারা যেতে পারে। যেমন, নির্গমনোত্তর ভূট্টার জমিতে 2, 4-ডি ব্যবহার করলে প্রাক্ নির্গমন বড়পাতাযুক্ত আগাছা দমন করা যায়। সাধারণতঃ গাছ 60 —75 সেণ্টিমিটার লম্বা হলে দুই সারির মাঝখানে এগুলি প্রয়োগ করতে হয়। প্রাক্ নির্গমন অবস্থায় প্রয়োগ করলে এগুলির কার্যকারিতা থাকে না।

রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের পরিধি বা জায়গা ঃ

রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের পরিধি সূচিত করা প্রয়োজন, কারণ এর দ্বারা ঔষধের পরিমাণ ও সময়ের সাশ্রয় হয়। সাধারণত ঔষধ প্রয়োগের জায়গা বা পরিধি কয়েকটি জিনিষের উপর নির্ভর করে, যেমন শস্যের প্রকৃতি, চাষের ধারা এবং প্রয়োগের সময়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে সব শস্যে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব বেশী সে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জায়গা বেছে নিয়ে ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু অল্প পরিধিতে সেটা সম্ভব হয় না। ঠিক এইভাবে, শস্য চাষের ধারার উপর নির্ভর করে কতটুকু পরিমাণ জায়গায় ঔষধ প্রয়োগ করা হবে। কারণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে শস্য বপন বা রোপণের ক্ষেত্রে এবং শৃংখলাবদ্ধভাবে বা সারিতে চাষ করার ক্ষেত্রে প্রয়োগের পরিধির তারতম্য ঘটে। অপর পক্ষে ঔষধ প্রয়োগের সময় সূচিত করে কতটুকু জায়গায় প্রয়োগ করা হবে। কারণ যখনই ঔষধ ব্যবহার করা হবে, তখনই দেখতে হবে শস্য উদ্গমনের আগে না পরে। সাধারণতঃ শস্য উদ্গমনের আগে যে সকল আগাছা দমনকারী রাসায়নিক ঔষধ প্রয়োগ করা হয় সেটা প্রায়ই সমস্তটা জায়গায় ছাড়িয়ে করা হয়। কিন্তু নির্গমনোত্তর রাসায়নিক সব সময় বা সব ক্ষেত্রে সেভাবে করা হয় না।

রাসায়নিক ঔষধ প্রয়োগের জায়গা বা পরিধিকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় যেমন ঃ (ক) এলোমেলোভাবে (খ) দলগতভাবে (গ) সরাসরি অথবা (ঘ) একটি বিন্দুতে।

(ক) **এলোমেলোভাবে বা সাধারণভাবে জমিতে প্রয়োগ ঃ** এই পদ্ধতিতে দানাদার বা তরল রাসায়নিক পদার্থগুলো সরাসরি জমিতে প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতিতে লক্ষ রাখা হয় যাতে সমস্ত জায়গায় সমানভাবে রাসায়নিকের বিস্তৃতি ঘটে।

(খ) **দলগতভাবে বা সারিতে প্রয়োগ ঃ** সাধারণতঃ বাছাই করা আগাছা দমনের জন্য এই পদ্ধতি খুবই উপযুক্ত। নির্দিষ্ট সারিতে কিংবা দুই সারির মাঝে রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে তুলনামূলকভাবে খরচা কম হয়।

(গ) **সরাসরি প্রয়োগ ঃ** সরাসরি প্রয়োগ পদ্ধতিতে সাধারণতঃ আগাছার কাণ্ডে, গুঁড়িতে এবং শাখা প্রশাখায় রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। এর ফলে শস্যের সারিতে যে সব আগাছা থাকে সেগুলির উপর যান্ত্রিক উপায়ে সূক্ষ্ম নল দিয়ে রাসায়নিক দ্রব্য ছড়াতে পারলে আগাছা দমন করা যায়। এর জন্য বিশেষ ধরনের দুই পাশ ঢাকা দেওয়া ঔষধ ছড়ানোর যন্ত্র কিনতে পাওয়া যায়।

(ঘ) **বিন্দুতে স্থানিক প্রয়োগ ঃ** নির্দিষ্ট জায়গায় ঔষধ প্রয়োগকে স্থানিক প্রয়োগ বলা যায়। স্থানিক প্রয়োগে স্পর্শকারী অথবা মৃত্তিকা শোধনকারী রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। বহুবর্ষজীবী আগাছা, যেগুলি খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে সেগুলিকে দমন করার জন্য সীমিতভাবে এ পদ্ধতি কাজে লাগানো হয়।

আগাছা দমনকারী রাসায়নিক দ্রব্যগুলো বিভিন্ন আকৃতি (যেমন—তরল, দানা ও গুঁড়ো) ও রাসায়নিক যৌগ হিসাবে পাওয়া যায়। বাজারে 2, 4-ডি ; 2, 4, 5টি ; সিলভেক্স ; গোল ; ব্যাসালিন ; ব্যাসাগ্রান ; গ্যামক্সন, ইত্যাদি নানান ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য আগাছা দমনের জন্য ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এগুলির মধ্যে কিছু পাউডারের মত গুঁড়ো আবার কিছু তরল। প্রতিটির কার্যক্ষমতায় (Active Ingredient) নির্দেশ দেওয়া থাকে। নির্দিষ্ট কার্যক্ষমতাযুক্ত জলীয় দ্রবণ তৈরী করে মাটি বা আগাছার উপর প্রয়োগ করা হয়।

সপ্তম অধ্যায়

সব্জী চাষের সমস্যা

সব্জী চাষে নানান ধরনের অসুবিধা দেখা যায়। সব্জীর বেশ কিছু শত্রু আছে। এদের আক্রমণে সব্জীর বেশ ক্ষতি হয়। এই ধরনের ক্ষয় ক্ষতির কারণকে চার ভাগে ভাগ করা যায়— (ক) পারিপার্শ্বিক কারণ (খ) বংশগত দুর্বলতা (গ) বাহ্যিক প্রাণী ও উদ্ভিদ জনিত কারণ এবং (ঘ) ভাইরাস।

(ক) **পারিপার্শ্বিক বা প্রাকৃতিক কারণ ঃ** গাছের বৃদ্ধির উপর পারিপার্শ্বিক কারণগুলির নানা ধরনের প্রভাব দেখা যায়। গাছের বৃদ্ধির জন্য তাপমাত্রা একটি বড় কারণ। বিশেষ বিশেষ সব্জীর ক্ষেত্রে যেমন লংকা, তরমুজ, ঝিঙে খরমুজ, লাল কুমড়ো, পটল, উচ্ছে, কচু ইত্যাদি গাছের জন্য তাপমাত্রা একটি বড় উপাদান, এগুলি ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ভাল জন্মায় না। অন্যদিকে লেটুস, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি এবং অন্যান্য শীতকালীন ফসল গরম আবহাওয়ায় ভাল জন্মাতে পারে না অথবা উৎপাদনে উচ্চ তাপমাত্রা নানাভাবে অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করে।

পারিপার্শ্বিক কারণগুলির মধ্যে আদ্র্তাও গাছের বৃদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণস্বরূপ বেশী আদ্র্তার ফলে বাঁধাকপি ও লেটুস বাঁধতে চায় না। পাতাগুলি খুলে খুলে যায়। মে ও জুন মাসে বাতাসের অল্প আদ্র্তার ফলে উচ্ছে ও ঢেঁড়সে ঘন ঘন জল সেচ দিতে হয়। অন্যথায় গাছের বাষ্পোমোচন কম হয় ও গাছ ঠিকমত বাড়ে না এবং প্রতিকূল অবস্থায় গাছ শুকিয়ে মরে যায়।

আদ্র্তার মতই রোদ্রের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। কিছু গাছ ছায়া ভালবাসে। উদাহরণস্বরূপ আমআদা, ব্যাঙের ছাতা বা মারশুম, খামালু এবং হলুদ ইত্যাদি ছায়ায় ভাল হয়। কিন্তু খোলাখুলি রোদে চাষ করলে ঝলসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার কিছু সব্জী খোলা রোদ ছাড়া ভাল হয় না, যেমন—ওল ছায়াতে ভাল হয় না। এছাড়া স্বল্প ও দীর্ঘ দিনের গাছগুলি নির্দিষ্ট পরিমাণ আলো না পেলে পুষ্পিত হয় না।

বজ্রপাত গাছের নানা ক্ষতি করে, যেমন বজ্র পড়লে কাণ্ডের ছালের কোষ, অথবা মূল মরে যায় এবং পাতাও ঝিমিয়ে পড়ে। কারখানা বর্জিত ক্ষতিকর

গ্যাস বা তরল পদার্থ কাছাকাছি গাছের ক্ষতি করে। বাতাসে অধিক মাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস, গাছ ও ফলের ক্ষতি সাধন করে।

অতিরিক্ত ঘন রাসায়নিক ঔষধ ব্যবহার করলে অথবা ভুল ঔষধ ছড়ালে গাছের ক্ষতি হয়।

মাটির ভৌতিক, রাসায়নিক অথবা জৈব অবৈজ্ঞানিক পরিবর্তন গাছের ক্ষতি করে। ভৌতিক অবস্থা যেমন জলনিষ্কাশন, বায়ু চলাচল, জলধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি। কিছু কিছু সব্জীর জন্য ভাল নিষ্কাশনী ব্যবস্থা ও বায়ু চলাচল একান্ত প্রয়োজন। আবার কিছু কিছু সব্জী অপেক্ষাকৃত খারাপ অবস্থা সহনশীল। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের আনুপাতিক পরিমাণ এবং অণু পরমাণুর প্রাপ্যতার উপরেও সব্জী উৎপাদন নির্ভর করে। কিছু রাসায়নিক পদার্থ গাছের পক্ষে সহজলভ্য না হলে নানা ধরনের রোগ দেখা যায়। মাটি ও গাছের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে সার প্রয়োগ করলে এজাতীয় রোগের সম্ভাবনা থাকে না।

(খ **বংশগত দুর্বলতা ঃ** বংশগত দুর্বলতা সংশোধন করা একটু জটিল ও সময়সাপেক্ষ। এই দুর্বলতা কিছুটা আবহাওয়া নির্ভরও হতে পারে বা বংশগত গঠন জনিতও হতে পারে। কিছু কিছু সব্জী আবহাওয়ার পরিবর্তন সহ্য করতে পারে না। নির্দিষ্ট আবহাওয়া না পেলে কিছু জাতের টোম্যাটোর ফল ফেটে যায়। খুব কম জাতের ঢেঁড়সই দেখা যায় যা সাহেব রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। প্রতিরোধ ক্ষমতা মূলতঃ বংশগতি জনিত বৈশিষ্ট্য হলেও আবহাওয়া নির্ভর।

এ ভাবেই প্রতিটি জাতের সব্জীর কিছু কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে যা প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার মধ্যে পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। এ ধরণের বৈশিষ্ট্য সব্জী বিশেষে সম্পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট। এসব ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন পরিবেশ প্রয়োজনের তুলনায় উন্নত করলেও উৎপাদন-বৃদ্ধি হয় না।

(গ) **বাহ্যিক প্রাণী ও উদ্ভিদজনিত কারণ ঃ** সব্জী উৎপাদনের প্রতিবন্ধকতার কারণ বাহ্যিক প্রাণী বা উদ্ভিদ থেকে উদ্ভূত হতে পারে। প্রতিবন্ধক প্রাণীদের মধ্যে (অ) পতঙ্গ, (আ) নেমাটোড (কেঁচো জাতীয়) অথবা (ই) শামুক হতে পারে। এদের মধ্যে কিছু মাটিতে বাস করে, কিছু মাটির উপরে আবার কিছু মাটি ও বালুস্তর উভয়ের মধ্যেই বাস করে। (অ) পতঙ্গ বা পোকা প্রাণী জগতের বিরাট এক অংশ অধিকার করে আছে। এরা নানা জাতি ও প্রজাতিতে বিভক্ত। পতঙ্গ আহার্যের জন্য মূলতঃ উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল।

আহার্য সংগ্রহের জন্য এদের দুই ধরনের মুখাকৃতি দেখা যায়। আহার্য সংগ্রহ কালে এরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে গাছের ক্ষতি করে। এদের মুখাকৃতির গঠন অনুযায়ী দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন রস শোষণকারী ও ছিদ্রকারী। মুখায়বের গঠন অনুযায়ী পতঙ্গগুলিকে আরও বিশদভাবে চার ভাগে ভাগ করা যায় যেমন, চোষক, চর্বক, ছিদ্রক ও লেহ্যক। চোষক পতঙ্গের মুখাকৃতি সাধারণত সূচালো। এরা সূচালো মুখাবয়ব দিয়ে ভিতরের দ্রবণীয় রস শুষে নেয় এবং কাণ্ড ও পাতা নষ্ট করে ফেলে। শোষণের ফলে ক্লোরোফিল নষ্ট হওয়ায় সালোক সংশ্লেষক্ষমতা কমে যায় এবং গাছের বৃদ্ধি ও উৎপাদন ক্ষমতা ব্যাহত হয়। উদাহরণ স্বরূপ মটরের জাব পোকা, বাঁধাকপির জাব পোকা ইত্যাদি ; স্কোয়াস বাগ, বাঁধাকপির বাগ ইত্যাদি ; পেঁয়াজের থিপ্‌স ; আলুর লিপ হপার এবং স্কেলস ও মিলি বাগ ইত্যাদি। চুষে খাওয়া পতঙ্গ দমনের জন্য নিকোটিনিক সালফেট, রোটেনন, থায়োডন ফোলিডল এনড্রিন, রোগার ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। ছিদ্রক বা যে সকল পোকা-মাকড় গাছকে ফুটো করে, তাদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় (1) পাতাছিদ্রকারী, (2) মূল-ছিদ্রকারী, (3) কাণ্ডছিদ্রকারী, (4) ফলছিদ্রকারী ইত্যাদি।

(1) পাতাছিদ্রকারী পতঙ্গগুলির মধ্যে মথ ও প্রজাপতি দেখা যায় যেমন উইচিংড়ে, বাঁধাকপির ক্রিমি, টোমাট্যোর ক্রিমি ইত্যাদি ; বিটলস ও তাদের শুয়োপোকা—যেমন শতমূলীর বিটল, সীমের বিটল, এপিল্যাকণা বটলও এই বিভাগের অন্তর্গত। কিছু ফড়িং এবং তাদের কিড়াও এই বিভাগে দেখা যায়। এইসব পোকা-মাকড় সব্জীর মধ্যে লুকিয়ে থাকে এবং সব্জীর বিভিন্ন অংশ খেয়ে ফেলে। এগুলি ফসলের প্রভুত ক্ষতি করে। এদের দমন করতে হলে বি, এইচ সি অথবা যে কোন আন্ত্রিক ঔষধ প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

(2) মূলছিদ্রকারী পোকা, মূলে ছিদ্র করে জল চলাচলের ব্যাঘাত ঘটায়। পাতার সালোকসংশ্লেশ ও বাষ্পোমোচন ক্ষমতা কমে গিয়ে আক্রান্ত গাছগুলি দুর্বল ও অনুৎপাদী হয়ে পড়ে। আক্রমণের তীক্ষ্মতা বাড়লে গাছ ঝিমিয়ে পড়ে এবং অনেক সময় মরে যেতে পারে।

(3) কাণ্ডছিদ্রকারী পোকা আবার দু'রকমের যেমন—নরম কান্ডছিদ্রকারী এবং শক্ত বা কাষ্ঠ কাণ্ডছিদ্রকারী পোকা। বেশীর ভাগ সব্জী নরম কাণ্ডযুক্ত

হওয়ায় শক্ত বা কাষ্ঠ কাণ্ডছিদ্রকারী পোকার আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। ছিদ্রকারী পোকার ক্ষতির ধারণাটা ঠিক মূল ছিদ্রকারী পোকার ন্যায়। উদাহরণস্বরূপ লাল শাকের কাণ্ডছিদ্রকারী পোকা, বেগুনের কাণ্ডছিদ্রকারী পোকা ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়।

(4) ফল ও বীজ ছিদ্রকারী কিছু কিছু পতঙ্গ সরাসরি ফল বীজ ছিদ্র করে মনুষ্য ব্যবহারের অনুপযুক্ত করে দেয়। এরা সাধারণত ফুলের মধ্যে ডিম পাড়ে। ফুল থেকে ফল হওয়ার সাথে সাথে ডিম থেকে কিড়া উৎপন্ন হয় ও ফল বা বীজ খেয়ে ফেলে। পরে প্রজাপতি ফল ছিদ্র করে বেরিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, শশার ফল ছিদ্রকারী প্রজাপতি ফলের আকৃতি নষ্ট করে এবং মানুষের ব্যবহারের অনুপযোগী করে ফেলে।

(আ) নেমাটোড সাধারণত নিচু ধরনের প্রাণীর গোত্রের মধ্যে পড়ে এবং এরা সব্জীর ক্ষতি সাধন করে। এগুলির আকৃতি বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন রুট নট্, পিন, লিজন ইত্যাদি। কিছু কিছু নেমাটোড আবার মূলের স্ফিতি ঘটায় ও মূলে গুটি সৃষ্টি করে।

কতকগুলি সব্জী যেমন আলু, মূলো, ঢেঁড়শ্, শশা, তরমুজ, লেটুস, গাজর, টোম্যাটো, বেগুন এবং লংকা প্রভৃতি প্রায়শই নেমাটোড দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখা যায়। ব্রকোলি, ফুলকপি, ওলকপি, বীট, মটর প্রভৃতি সব্জীও যথেষ্ট পরিমাণে আক্রান্ত হয়। পেঁয়াজ, রসুন, লিক, প্রভৃতি সব্জী নেমাটোড আক্রমণ থেকে কিছুটা মুক্ত।

(ই) বিভিন্ন ধরনের শামুক সাধারণত সব্জী চারা কেটে নষ্ট করে দেয়।

ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া সব্জীর প্রভুত ক্ষতি সাধন করে।

(ঈ) ছত্রাক থ্যালোফাইটা শ্রেণীভুক্ত। এদের গঠন খুবই সাধারণ ও সবুজাংশ না থাকায় সালোকসংশ্লেষ করতে পারে না ও খাদ্যের ব্যাপার সম্পূর্ণ পরজীবী। সব্জী দেহে এরা সুতোর মত কাণ্ডে প্রবেশ করিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করে। এই পরগাছাগুলি মূল গাছের খাদ্যে ভাগ বসিয়ে তাদের দুর্বল করে দেয়। আক্রমণ বেশী হলে গাছ অনুৎপাদী হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়তে পারে। ছত্রাক এর বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ দেখা যায় এবং এগুলি বিভিন্ন সব্জীর নানা ধরনের রোগ সৃষ্টি করে। যেমন মিলডিউ, মরচে পড়া, স্মাট, মোল্ড এবং ধসা।

এগুলি ডিম্বাণুর মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে। ছত্রাক বাতাস, জল, প্রাণী, বীজ, অন্য গাছ ইত্যাদির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে।

(উ) ব্যাকটিরিয়া আকৃতিতে ছত্রাক অপেক্ষাও ছোট। ছত্রাক এর ন্যায় এগুলিও পরজীবী। খাদ্য সংগ্রহের জন্য এগুলিও গাছের মধ্যে প্রবেশ করে। এর ফলে নানা ধরনের রোগ দেখা দেয়। যেমন ক্যানকার, হলোইং ইত্যাদি।

(ঘ) **ভাইরাস ঃ** ভাইরাস একটি বহিরাগত রোগ, যা কিছু জীবন্ত জিনিষের মাধ্যমে নির্দিষ্ট উদ্ভিদ দেহে প্রবিষ্ট হলে সহজেই বিস্তার লাভ করে। এগুলি কিভাবে বিস্তার লাভ করে ও রোগের সৃষ্টি করে তা এখনো ঠিক ঠিক জানা যায় নি। অনেক ক্ষেত্রে অনুরূপ আগাছা থেকে সংক্রামিত ভাইরাস পাতার মোজাইক, কোঁচকান, ক্ষুদ্রাকৃতি ইত্যাদি ও গাছের বামনাকৃতি রোগ সংঘটিত করে। ভাইরাস সাধারণত ছড়ায় সংস্পর্শে। এছাড়া কিছু পোকা-মাকড়ের মাধ্যমেও যেমন, এফিড্, থ্রিপস্ অথবা ফড়িং রোগাক্রান্ত গাছ থেকে ভাল গাছে সংক্রামণ ছড়ায়।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ রোগ দমনের আগে রোগের উৎপত্তি, রোগ পরিবাহী পতঙ্গ নির্ধারণ ও প্রতিরোধের খরচ ইত্যাদি অনুসন্ধান করা দরকার।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সহজাত বিকৃতি প্রভৃতি দমন করা খুবই কষ্টসাধ্য, যতক্ষণ না কোন ফসল উপযুক্ত আবহাওয়ায় চাষ করা হয় অথবা ভাল ধরনের বীজ ব্যবহার করা হয়।

রোগ, পোকা-মাকড়, নেমাটোড, শামুক এবং ভাইরাস দুটি পদ্ধতিতে দমন করা যায়। (১) প্রাকৃতিক দমন পদ্ধতি (২) কৃত্রিম দমন পদ্ধতি।

(1) প্রাকৃতিক দমন পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য বংশ বৃদ্ধি সীমিত করা। প্রাকৃতিক পদ্ধতিগুলির উপর আলো, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং বৃষ্টিপাতের মূল্যবান প্রভাব দেখা যায়। প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে খাদ্য ও খাদক ভারসাম্যের উপর বংশবৃদ্ধি নির্ভর করে। ক্ষতিকারক পতঙ্গের ধ্বংসকারী বা আক্রমণকারী কিছু পতঙ্গ ও ছত্রাক আছে যা ক্ষতিকারক পতঙ্গগুলির সংখ্যা সীমিত করণের খুবই উপযোগী। এগুলি ব্যবহার করে আক্রমণ প্রতিহত করা আধুনিক জীবন-বিজ্ঞানের একটি নতুন দিক।

(2) রোগ, পোকা-মাকড় ও অন্যান্য প্রাণী দমনের জন্য মানুষ তার বুদ্ধির

দ্বারা পতঙ্গবিদ্যা, রোগবিদ্যা, ভাইরালজি ইত্যাদির সাহায্যে এগুলির বংশ বৃদ্ধি সীমিত করে। উপযুক্ত পরিবেশ না পাওয়ার ফলে বংশ বৃদ্ধির হার কমে যায়। প্রয়োগের দ্বারা দমন বা কৃত্রিম উপায়ে দমনকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) ব্যবহারিক ও (খ) রাসায়নিক।

(ক) **ব্যবহারিক ব্যবস্থা ঃ** এই ব্যবস্থার সাহায্যে যান্ত্রিক উপায়ে দমনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তাছাড়া চাষবাসের দ্বারাও আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। যেমন ঠিক সময়ে চাষ করা এবং নির্দিষ্ট শস্য উৎপাদন করা ইত্যাদি লাভজনক পদ্ধতি। সাধারণ চাষীরা এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

(1) **আক্রান্ত গাছ নির্মূলকরণ ঃ** হাতের সাহায্যে আক্রান্ত ও রোগগ্রস্থ গাছ তুলে নষ্ট করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য সংক্রমণ প্রতিহত করা ও সুস্থ গাছগুলি রক্ষা করা।

(2) **পতঙ্গ প্রাচীর ঃ** এই পদ্ধতিতে সুস্থ গাছগুলিকে আক্রান্ত গাছ থেকে আলাদা করে রাখা হয়। যেমন মোটা ছিদ্রযুক্ত সূতী, পলিথিন অথবা নাইলনের জালের সাহায্যে ঘর তৈরী করে, এগুলির মধ্যে শস্য চাষ করা হয়। এইভাবে আলাদা রাখার জন্য শুধুমাত্র পোকা-মাকড় ও রোগাক্রমণ ঠেকিয়ে রাখা যায় তাই নয় অন্যান্য অনেক অবাঞ্ছিত উৎপাত থেকেও গাছগুলিকে রক্ষা করা যায়।

(3) **শস্যপর্যায় ঃ** শস্যপর্যায় এর ফলে নানা ধরনের রোগও পোকা-মাকড় নানা ভাবে দমন করা যায়। শস্যপর্যায় অনুসরণ করলে একই জায়গায় বছরের পর বছর একই ফসল চাষ করা হয় না। শস্যপর্যায় এর মাধ্যমে পতঙ্গের নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ী বাস ও জীবনচক্র ধ্বংস করা হয়। শস্যপর্যায়ে একই ধরনের বা একই গোত্রের ফসল কখনোই রাখা উচিত নয়। অল্প সময়ের জন্য হলেও শস্যপর্যায় পালন করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ যেসব রোগের জীবাণু এক বছর বা তারও বেশী বেঁচে থাকে ও নির্দিষ্ট ঋতুতে শস্যের ক্ষতিসাধন করে, শস্যপর্যায় এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট শস্যের পরিবর্তন ঘটলে সেগুলি অনায়াসে মারা যায়। অনেক সময় কিছুদিন জমি খালি ফেলে রাখলেও ভাল হয়, যেমন বাঁধাকপির মূলস্ফীতি (Clubroot) এবং পেঁয়াজের ভুষোরোগ (Smut) ইত্যাদি এক দেড় বছর জমি ফেলে রেখে দমন করা যায়।

(4) **খামারের আবর্জনা ধ্বংস ঃ** খামারের পরিত্যক্ত আবর্জনা প্রায়শই রোগ

জীবাণু ও পোকার পরিবর্ত অবস্থান হতে দেখা যায়। শস্যের নির্দিষ্ট ক্রম শেষ হলে এরা পরিত্যক্ত আবর্জনায় আশ্রয় নেয় ও উপযুক্ত সময় ফিরে এলে বংশ বৃদ্ধি করে শস্যের উপর আক্রমণ চালায়। কাজেই খামারের আবর্জনা পুড়িয়ে কিংবা অন্য ভাবে নষ্ট করে ফেলা একান্ত দরকার। খামারের রাস্তাঘাট ও চতুর্দিক পরিষ্কার রাখাও দরকার।

(5) **ভূমি কর্ষণ ঃ** কিছু কিছু রোগের জীবাণু ও পোকার ডিম, শূককীট ইত্যাদি মাটির নিচে থেকে যায়। নির্দিষ্ট ঋতুতে উপযুক্ত আবহাওয়ায় এরা মাটির বাইরে আসে, শস্য ভক্ষণ ও বংশ বৃদ্ধি করে। আবার আবহাওয়ার পরিবর্তন হলে এরা মাটির নিচে আশ্রয় নেয়। ভূমি কর্ষণের মাধ্যমে জীবাণু গুলিকে পরিপন্থী আবহাওয়ায় উন্মুক্ত করা হয়। পরিপন্থী আবহাওয়ায় অর্থাৎ প্রখর সূর্য তাপ এবং ধ্বংসকারী প্রাণী অর্থাৎ পাখী ও ব্যাঙের আক্রমণে এগুলি নষ্ট হয়ে যায়।

(6) **ফাঁদ শস্যের চাষ ঃ** দেখা যায় একই শস্যের কিছু প্রকরণের উপর রোগ ও পোকার আক্রমণ বেশী। মূল প্রকরণ জমির মাঝে ও চারিদিকে উপরিউক্ত নির্দিষ্ট প্রকরণ লাগিয়ে ঘিরে দিলে এটিকে ফাঁদ শস্যের চাষ বলা হয়। ফাঁদ শস্য চাষে বিশেষ পরিচর্যা করা যায় না। কেবল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য অনেক সময় এগুলির চাষ করা হয়। পোকা-মাকড় ও রোগ প্রভৃতির আক্রমণ প্রথমে ঐ সব ফাঁদ শস্যে ঘনীভুত হয়। মূল ফসলে সংক্রামিত হওয়ার আগেই বেশী মাত্রায় ও পুনঃ পুনঃ ঔষধ প্রয়োগ করে এগুলি ধ্বংস করা হয়। ফাঁদ শস্যের উৎপাদন আহারের জন্য ব্যবহার করা হয় না। এইসব ফসলে ওষুধের মাত্রা অনেক বেশী থাকে। অন্য দিকে দূষণ মুক্ত, মূল ফসল স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী। বাঁধাকপির শোষক পোকা দমন করার জন্য পাশে রাই, সরষে, লাগালে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ প্রথমে ফাঁদ শস্যে ঘনীভুত হয়। পরে ফাঁদ শস্যের উপর শুধু কেরোসিন ছড়িয়ে পোকাগুলিকে মেরে ফেলা যায়।

(7) **প্রতিরোধ-ক্ষমতাযুক্ত ফসলের চাষ ঃ** বিভিন্ন ফসলের আজকাল প্রতিরোধ-ক্ষমতাযুক্ত নানান প্রজাতি উদ্ভাবিত ও উৎপাদিত হচ্ছে। এদের কিছু কিছু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাযুক্ত। আবার কিছু কিছু পতঙ্গের আক্রমণ প্রতিরোধ-সম্পন্ন আবার কিছু প্রজাতি অস্বাভাবিক অবস্থা মোকাবিলায় সক্ষম। প্রয়োজনমত নির্দিষ্ট প্রজাতি নির্বাচন করে চাষ করলে সুফল পাওয়া যায়। ধসা

শতমূলীর মরিচা, বাঁধাকপির হলদে, ফরাসবীনের ভুষো ইত্যাদি রোগ নিম্নলিখিত প্রজাতিগুলো চাষ করলে প্রতিরোধ করা যায়।

পরিসংখ্যান 7 : বিভিন্ন রোগ ও প্রতিরোধক্ষম প্রজাতি।

সব্জীর নাম	প্রতিরোধক্ষম প্রজাতি	প্রতিহত রোগের নাম
শতমূলী	মেরী ওয়াশিংটন, মারথা ওয়াশিংটন	মরিচা রোগ
ফরাসবীন	ওয়েস্ রেড কিডনী, হোয়াইট ইমপি-রিয়াল, মিচিগান রোবার্ট, ওয়ানডার পেন, সিংখামী।	ভুষোরোগ
শশা	বালাম খিরা, নিউএরা, শ্যাণ্ডি পামার।	ধসা ও পাতা পচা
ফুলকপি	ডি-১৬ স্নোবল, দীপালী।	পাতা পচা
বাঁধাকপি	পুষা ড্রাম হেড, ইক্লিপস ড্রাম হেড।	গোড়া পচা
	হল্যাণ্ডার	হলদে লাগা
পালং	ডারজিলিয়া স্যাভয়, ব্যানার্জী জায়েণ্ট পুষা জ্যোতি।	কানা লাগা
টোম্যাটো	মারগ্লোব, এস, এল—১২০, নেম্যাটেকা	কানা লাগা
	ইউনুস, মালিমেকার, রূপালী।	নেম্যাটোড

(8) **সব্জী চাষের সময় পরিবর্তন :** চাষের সময় পরিবর্তনের মাধ্যমে রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে, নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরে সব্জী চাষ করলে রোগ-পোকার আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভবপর হয়। সব্জী আগে চাষ করলে, আক্রমণের আগেই গাছগুলি পুষ্ট হয়ে আক্রমণের অনুপযুক্ত হয়ে যায়। পরে চাষ করলে, পোকা-গুলি সময়ে খাদ্য না পেয়ে, স্থানান্তরে গমন করে। পরীক্ষার ভিত্তিতে বলা যায়, নভেম্বর অপেক্ষা সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরে মটরশুঁটি লাগানোর ভাল সময়। একমাস আগিয়ে বা পিছিয়ে চাষ করলে মটরশুঁটিতে রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়।

(9) **বীজ শোধন :** রোগ ও পোকা দমনের জন্য বীজ শোধন ও পরিচর্যা একটি বড় হাতিয়ার। গরম জল ও নানান ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য, কীট ও ছত্রাক দমনের জন্য ব্যবহার করা হয়। এগুলি ব্যবহারের একমাত্র লক্ষ্য বীজের বহির্গাত্রে

লেগে থাকা শত্রু দমন করা। উপযুক্ত তাপমাত্রায় অথবা রাসায়নিক বিষক্রিয়া দ্বারা এগুলি ধ্বংস করা হয়। কিন্তু বীজ এর ভ্রূণ নষ্ট করা হয় না। বীজকে 5—15 মিনিট ওষুধে ডুবিয়ে রাখতে হয়। যেসব পরিচর্যার মাধ্যমে রোগ ও পোকার আক্রমণ থেকে বিভিন্ন সব্জী বীজ রক্ষা করা যায় তার কিছু কিছু নিচে দেওয়া হল।

পরিসংখ্যান—8 : রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রতিহত করতে সব্জী বীজ সংশোধনের জন্য ব্যবহৃত ওষুধ।

পরিচর্যা	বীজ	পোকামাকড় ও রোগ
গরম জল পরিচর্যা	বাঁধাকপি, ফুলকপি, শালগম, ব্রুসেলস স্প্রাউট ইত্যাদি।	কালো পচন, মূল পচা, অলটারনেরিয়া লিফ্ স্পট।
কেরোসিভ সাব্লিমেট	শশা, স্কোয়াস্ লাউ।	স্ক্যাব এবং এংগুলার লিফ স্পট।
টেট্রাসাইক্লিন	সেলারী।	ধসা রোগ।
এগ্রোসান এবং সেরোসান, টেরসান	লিমাবীন, স্ন্যাপবীন, বীট, বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজর, বেগুন, মুলো, পালং, টোমাটো শশা, ইত্যাদি।	ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ।
জিঙ্ক অক্সাইড, কার্বন ডাই-সালফাইড্	বীন।	পেন উইভিল।

(10) **পতিতকরণ :** জমি পতিত, ফেলে রেখে পোকা-মাকড় ও রোগের প্রতিরোধ করা যায়। সাধারণত কোন উপায় না থাকলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এর জন্য বিশেষ কোন কৌশল অবলম্বন করতে হয় না। শুধু কিছুদিন জন্য জমিকে ফেলে রাখতে হয়। মাঠে কোন ফসল না থাকলে, রোগ ও পোকার আক্রমণের প্রশ্ন আসে না। পতিতকরণ বেশী দিন প্রবর্তিত রাখলে রোগ ও পোকা সমূলে ধ্বংস করা যায়। এই পদ্ধতিতে পোকা-মাকড় এক বছরের মধ্যে মারা যায় কিন্তু ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও নেমাটোডকে মারতে 2—3 বছর সময় লাগে।

(গ) **কেমিকেল কনট্রোল** ঃ রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগে নানাধরনের রোগ পোকা দমন করা যায়।

(1) যেসব রাসায়নিক দিয়ে পোকা দমন করা হয় তাদের ইনসেকটিসাইড বলে।

(2) যে রাসায়নিক দিয়ে পোকা তাড়িয়ে দেওয়া হয় তাদের রিপেলেণ্ট বলে।

(3) যে রাসায়নিক দিয়ে পোকা আকর্ষণ করা হয় তাদের এ্যাট্রাকটেণ্ট বলে।

পোকা-মাকড়ের উপর প্রতিক্রিয়ার প্রকার ভেদে রাসায়নিক ওষুধকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। কিছু রাসায়নিক পদার্থ পাকস্থলীতে গেলে বিক্রিয়ায় পোকার মৃত্যু হয়। এগুলি সাধারণত পাউডার হিসাবে গাছের উপর ছড়ানো হয়। কিছু পোকা আছে যাদের সহজাত-অভ্যাস, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বিশেষ করে, পাগুলি মুখ দিয়ে পরিষ্কার করা। এসব পোকা ওষুধ ছড়ানো গাছে বসলে এদের পায়ে ওষুধের গুড়ো লাগে। সহজাত পদ্ধতিতে পা পরিষ্কার করার সময় ওষুধের গুড়ো মুখ দিয়ে পেটে চলে যায়। কিছু পরেই পোকাটির পাকস্থলীতে প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় ও যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পোকাটি মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ে। বি, এইচ, সি ইত্যাদি এ ধরণের ওষুধ। মাছি জাতীয় পোকা দমনের জন্য এই জাতীয় ওষুধগুলি খুবই উপযোগী।

কিছু ওষুধ আছে, যেগুলি পতঙ্গের শরীরে পড়লেই কাজ হয়। এগুলি পতঙ্গের শরীরের ভেতর প্রবেশ করে স্নায়ুতন্ত্রের উপর ক্রিয়া করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ করে ও শেষে মৃত্যু ঘটায়। এগুলিকে স্নায়বিক বা সিস্টেমিক ওষুধ বলা হয়। এছাড়া শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে যেসব ওষুধে পতঙ্গ নিধন করা হয় হয় তাদের বলে ফিউমিগেন্ট।

পোকা-মাকড় রোগ ইত্যাদি দমনের জন্য নানান পদ্ধতি প্রচলিত আছে। পোকা-মাকড়ের ধরন শস্যের প্রকার ও প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে দমন পদ্ধতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

(1) রোগ পোকার উপর ওষুধ ছাড়িয়ে (2) রোগ পোকার শ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন ঘটিয়ে (3) মাটিতে ওষুধ ব্যবহার করে রোগ পোকার ডিম ইত্যাদি দমন করা হয়।

(1) **ওষুধ ছড়ানো পদ্ধতি** ঃ আগেই আলোচনা করা হয়েছে মুখের আকৃতিগত প্রভেদ দেখে পতঙ্গগুলিকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা যায়। যেমন

চিবিয়ে বা কামড়ে খাওয়া পতঙ্গ এবং চুষে খাওয়া পতঙ্গ। যেসব পতঙ্গ চিবিয়ে ফুটো করে বা কামড়িয়ে খায় তাদের ক্ষেত্রে আন্ত্রিক এবং স্নায়বিক বিষ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু চোষক পোকার জন্য স্নায়বিক বিষ খুবই কার্যকরী হয়। আন্ত্রিক বিষ গুঁড়ো ও তরল উভয় অবস্থাতেই পাওয়া যায়।

ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া দমনের জন্য স্প্রেয়ার বা ডাস্টারের সাহায্যে ওষুধ ছড়ানো যায়। ঠিকমত ওষুধ ছড়ালে রোগ ও পোকা ধ্বংস হলেও শস্যের ক্ষতি হয় না। ভাইরাস রোগের জন্য সোজাসুজি কোন ওষুধ নেই। তাই ভাইরাস জাতীয় রোগ দমন করতে হলে যেসব পোকা-মাকড়ের মাধ্যমে ভাইরাস সংক্রামিত হয় তাদের দমন করা বাঞ্ছনীয়। যাইহোক, বৃষ্টির আগে কখনো ওষুধ ছড়ানো উচিত নয়। এতে বৃষ্টির জলে ওষুধ ধুয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(2) **ধূমায়িত করণ ঃ** গ্রীন হাউস, গ্লাস হাউস বা চারিদিক বন্ধ ঘরে ধূমায়িত করণের মাধ্যমে পোকা-মাকড় অতি সহজে মেরে ফেলা যায়। সাধারণতঃ ফিউমিগেসানের জন্য যেসব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়, তাদের মধ্যে সালফার, কার্বনডাই-সালফাইড, হাইড্রোসায়ানিক এ্যাসিড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ওষুধগুলিকে ফিউমিগ্যাণ্ট বলে। সাধারণত, এগুলি বায়বীয় অবস্থায় ব্যবহৃত হয় ও শ্বাসপ্রশ্বাস বিষাক্ত করে। এগুলি মানুষের বা জীবজন্তুর ক্ষেত্রে অত্যন্ত মারাত্মক। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়।

(3) **মৃত্তিকা শোধন ঃ** মৃত্তিকা শোধন আর কিছুই নয়, মাটিকে রোগ ও পোকা-মাকড় থেকে মুক্ত রাখা। মাটিতে বিভিন্ন পোকা-মাকড়, রোগজীবাণু এবং ক্রিমি জাতীয় জীব বাস করে এবং সেখানেই তাদের জীবনচক্র সম্পূর্ণ করে। এদের মৃত্তিকা জাত বলা হয়। মৃত্তিকা জাত পোকা-মাকড় ও রোগ জীবাণুকে মৃত্তিকা শোধনের সাহায্যে দমন করা হয়। মৃত্তিকা শোধনের জন্য গরম বাষ্প, উত্তপ্ত বাতাস, ফরমালিন, ক্লোরোপিকরিন, ইথিলিন-ডাইব্রোমাইড, ডাইক্লোরো-প্রোপেন, ডাইক্লোরো-প্রোপাইলিন প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে মৃত্তিকা শোধন করা হয়। ফরমালিন বা ফরমালডিহাইড 40 শতাংশ জলীয় দ্রবণ করে 10-15 লিটার দ্রবণ এক স্কোয়ার মিটার মাটিতে 15—20 সেঃ মিঃ গভীরতা পর্যন্ত প্রয়োগ করতে হয়। এরপর ঐ মাটিকে কাগজ দিয়ে 24—36 ঘণ্টা ঢেকে রাখতে হবে। এভাবে রাসায়নিকের গ্যাস ভালভাবে মাটির সাথে মিশে যায়। বীজ বপন করতে হলে ঐ মাটিকে কম করে 10 দিনের মত বিশ্রাম দিতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ সব্জীর প্রধান প্রধান কীট পতঙ্গ ও রোগ এবং তাদের দমন ঃ

বেগুন জাতীয় সব্জী ঃ

(1) **ফল ও কান্ড ছিদ্রকারী পোকা ঃ** এক ধরনের বাদামীকীড়া কাণ্ড ও ফলকে ছিদ্র করে। আক্রান্ত কাণ্ড ও পাতা ঝুলে যায় ও ঝিমিয়ে পড়ে। কাণ্ডের গায়ে লম্বা সুড়ঙ্গ দেখা যায়। অপরিপক্ক অবস্থায় ফল শুকিয়ে যায় এবং ঝরে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে পচেও যায়।

দমন ঃ ফল কাণ্ডছিদ্রকারী পোকা দমনের জন্য নানান বৈজ্ঞানিক নানান দমন পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। 0·08 ভাগ এনড্রিন প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়। এছাড়া ডায়াজিনন, মেলাথিয়ন, সেভিন ও প্যারাথিয়ন, লিনডেন এবং তামাক মিশ্রিত ওষুধ প্রয়োগ করেও একই ধরনের উপকার পাওয়া যায়। আন্ত্রিক অপেক্ষা স্নায়বিক কীটনাশক অধিক ফলপ্রসু। তবে দেখা গেছে ফসফামিডন (0·03%) খুবই ভাল।

(2) **এপিল্যাকনা বিটল ঃ** এগুলি শক্ত পাখাযুক্ত পোকা। পাখার রঙ হলদে থেকে ব্রোঞ্জ লালের উপর গোলাকৃতি কালো কালো দাগ আছে। শুককীটগুলি হাল্কা হলুদ রং-এর হয় ও তাদের গায়ে রোঁয়া রোঁয়া থাকে। প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ শুককীট ও পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় গাছের প্রভুত ক্ষতি করে। পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে ও শীর্ণকায় করে দেয়।

দমন ঃ এ্যাপিল্যাকনা বিটল দমন করার জন্য বি, এইচ, সি-৫ শতাংশ, ম্যালাথিয়ন, প্যারাথিয়ন, সেভিন এবং পাইরিথ্রাম প্রয়োগ করে খুব ভাল ভাবে এ্যাপিল্যাকনা বিটল দমন করা যায়।

(3) **বেগুনের কান্ড ছিদ্রকারী পোকা ঃ** এই পোকা মথ অবস্থায় বেগুনের নরম কাণ্ড ছিদ্র করে দেয় এবং রস ও গাছের ভিতরের শাঁসাল অংশ খেয়ে ফেলে। ফলে গাছ বাড়ে না ঝিমিয়ে পড়ে।

দমন ঃ বেগুনের কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা দমন পদ্ধতি আগে বর্ণিত কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা দমন পদ্ধতির মতই।

(4) **লঙ্কার মাকড়সা ঃ** এগুলি লঙ্কা গাছের পাতা, কাণ্ড ও ফল থেকে রস শুষে গ্রহণ করে ফলে গাছের অবয়ব পাল্টে যায়। যার ফলে গাছের পাতা কুঁকড়ে যায় ; অনেক সময় কাণ্ডেরও একই অবস্থা হয়।

দমন ঃ বি এইচ সি 5 শতাংশ, হেক্টর পিছু 20 কেজি প্রয়োগ করে খুব ভাল ভাবেই এদের দমন করা যায়। এছাড়া শতকরা 2·02 ভাগ নিকোটিনিক সালফেট ব্যবহার করেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

টমাটো ওয়াম´ঃ টমাটোর এই জাতীয় পোকা প্রথমে মথের আকারে গাছের বিভিন্ন অংশে বাস করে। পরে, ফলের ভিতরে প্রবেশ করে ও প্রভুত ক্ষতি সাধন করে।

দমন ঃ এগুলি দমন করতে হলে আক্রান্ত ফল হাত দিয়ে তুলে ফেলতে হবে ও দরকার মত নষ্ট করে ফেলতে হবে। এর ফলে পোকার বংশ বৃদ্ধি কিছুটা রোধ করা যায়। সার প্রয়োগের সাথে সাথে দানাদার স্নায়বিক ওষুধ জমিতে প্রয়োগ করলেও এগুলির আক্রমণ প্রতিহত করা যায়।

(6) **টমাটো ফলছিদ্রকারী পোকা ঃ** এই পোকার আক্রমণে টমাটো ফলের প্রায় 40—50 শতাংশ ক্ষতি হয়। কারণ যখন ফল পাকে তখন এরা ফল ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে পড়ে ও খেতে আরম্ভ করে। ফলে অনেক ফল পচে যায় ও ছিদ্র হওয়ার দরুণ নষ্ট হয়।

দমন ঃ টমাটো ছিদ্রকারী পোকা দমন করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

(a) আক্রমণ রোধকারী টমাটো ভ্যারাইটি যেমন—এইচ-123, এইচ-622 এবং এইচ-430 ইত্যাদির চাষ করা যায়।

(b) 15 দিন অন্তর এনড্রিনের 0·02 শতাংশ জলীয় দ্রবণ গাছে প্রয়োগ করা যায়। ফল মার্বেল আকৃতিতে আসার তিন সপ্তাহের মধ্যে ফেনিট্রোথিয় ন ছিটিয়ে আক্রমণ রোধ করা যায়। এছাড়া কার্বারিলও এনডোসালফান প্রয়োগ করলে অনেকাংশে আক্রমণ রোধ করা যায়।

(7) **গাছ ঢলে পড়া এবং গাছের গোড়া পচা রোগ ঃ** গাছ ঢলে পড়া এবং গাছের গোড়া পচা রোগ হলে চারার তন্তুতে আক্রমণ ঘটে। সেগুলি সংকুচিত হয়ে যায় ও গাছ ঢলে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে পচেও যায়। আক্রমণ বীজ অংকুরিত হওয়ার আগে বা পরেও হতে পারে।

দমন ঃ এই ধরনের রোগ দমনের জন্য প্রধানতঃ বীজ শোধন করে নিতে হয়। এক হাজার বীজে তিন ভাগ ওষুধ মিশিয়ে শোধন করে নিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। শতকরা এক ভাগ বোর্দ মিশ্রণ নার্সারিতে বীজ বপনের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ছড়ালে সুফল পাওয়া যায়। আবার গাছের ঢলে পড়া রোগ সাধারণতঃ বীজ থেকেই ছড়ায়। সুতরাং বীজ শোধন একান্ত দরকার। তাই সেরেসান, কপার-অক্সিক্লোরাইড, অথবা ব্রাসিকল 0·2% হারে অংকুরোদ্গম হওয়ার আগে প্রয়োগ করে বীজ শোধন করতে হয়। আবার বীজতলার মাটিকে

ব্রাসিকল, ডায়াথিন এম-45 অথবা অক্সিকার্বোক্সিন দিয়ে শোধন করে নিলেও ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়া অংকুরোদ্গমের পরে, রোগ দমনের জন্য, মাটিতে দু'বার করে ডায়াথিন-এম 45, ডায়াথিন জেড্-78, মিলটাস্ অথবা থিরাম 0·2% প্রয়োগ করা যায়।

(8) **জলদি ধসা ঃ** এই রোগে আক্রান্ত গাছ সাধারণতঃ বাড়ে কম। গাছের পাতায় ও ফলে বাদামী রঙের দাগ দেখা যায়। এর ফলে গাছের ফল ঝরে যায়, আক্রমণ বেশী হলে গাছ মারা যায়।

দমন ঃ লাগানোর আগে তুঁতে অথবা এ্যানটিবাইওটিকস্ দিয়ে ভালভাবে বীজ শোধন করে নিতে হবে। বড় হলে গাছ ও পাতায় রোদ মিশ্রণ (4-4-50) ছড়াতে হবে। এভাবে আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

(9) **নাবী ধসা ঃ** এই ধরনের রোগ সাধারণতঃ গাছ বেড়ে ওঠার পর পাতায়, কাণ্ডে, এবং ফুলে বা ফলে সর্বত্র দেখা যায়। এই রোগের আক্রমণের ফলে গাছে, পাতায়, কাণ্ডে, ফলে একটা কালো কালো পচা দাগ দেখা যায়। বাদামী সবুজ রঙের একটা আস্তরণ ফলের উপর দেখা দেয়। কাণ্ডের উপরও দেখা দিতে পারে কিন্তু ফল কিছুতেই পাকে না অথচ দেখে মনে হয় পেকে গেছে।

দমন ঃ জলদি ধসা রোগ যেভাবে দমন করা হয় ঠিক একই উপায়ে এই রোগ দমন করা যায়।

(10) **শুকিয়ে যাওয়া ঃ** এটি একটি মারাত্মক রোগ। গাছের যে কোন অবস্থায় অর্থাৎ ছোট থেকে বড় গাছ অবধি এই রোগের আক্রমণ হলে নানান উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন গাছে তলার দিকের পাতা প্রথমে আক্রান্ত হয়। পাতা হলদে হয়ে যায়, সেই সংগে গাছও হলদে হতে থাকে। বেশী আক্রান্ত গাছ শুকিয়ে মরে যায়।

দমন ঃ শস্য পর্যায় প্রবর্তন বা রোগ প্রতিরোধক্ষম প্রজাতি ব্যবহার করে এই রোগ বহুলাংশে রোধ করা যায়। তবে শস্য পর্যায়ের ক্ষেত্রে গুটি জাতীয় শস্যের ব্যবহার না করাই উচিত। মাঝে মাঝে ছত্রাক ঘটিত ওষুধ প্রয়োগ করলেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

(11) **ভাইরাস রোগ ঃ** এটি একটি সংক্রামক রোগ। সাধারণতঃ কয়েকটি শস্যে-এর মারাত্মক প্রকোপ দেখা যায়। (ক) টোমাটো মোজাইক, (খ) লংকা মোজাইক, ও পাতা কোঁচকান।

বিভিন্ন প্রকার ভাইরাস রোগের আক্রমণের ফলে গাছের বিভিন্ন প্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। যেমন গাছ হলদে হয়ে যায়। পাতা ও কাণ্ড কুঁকড়ে যায়, গাছ ছোট হয়ে যায় ও গাছের পাতাও কমে যায়। ভাইরাস আক্রমণ সাধারণত সংস্পর্শে ও পতঙ্গের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হয়।

দমন ঃ ভাইরাস আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়া যায়। (ক) প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রজাতি চাষ, (খ) আক্রান্ত গাছ ধ্বংস (গ) পরিবাহী পতঙ্গের দমন। এছাড়া শস্যের ক্রম ও পর্যায় পরিবর্তন করেও উপকার পাওয়া যায়।

(12) তুলসি রোগ ঃ বেগুন ও লংকা গাছের পাতা ছোট হয়ে পত্র বিন্যাস খুব কাছাকাছি হলে, এগুলি তুলসি রোগ বলে নির্দ্দিষ্ট করা যায়। এটি মাইক্রোপাজমা জনিত রোগ। সবুজ রং-এর ছোট ছোট ফড়িং এই রোগ আক্রান্ত গাছ থেকে সুস্থ গাছে বহন করে।

দমন ঃ এই রোগ দমনের ক্ষেত্রে ডাই-মিথাইল-ক্লোরো টেট্রাসাইক্লিন—হাইড্রোক্লোরাইডই একমাত্র ওষুধ যেটার দ্বারা এইরোগ দমন করা যায়। এছাড়া পরিবাহী পতঙ্গ দমন করেও আক্রমণ কিছুটা প্রতিহত করা যায়।

(13) নেমাটোড্ ঃ বেশ কিছু শস্যের ক্ষেত্রে নেমাটোড আক্রমণ অত্যন্ত মারাত্মক। এর ফলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। গাছের মূলে গুটি দেখা দেয় এবং পাতায় সবুজ কণার স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়।

দমন ঃ নেমাটোড দমনের জন্য ডি, ডি খুবই ফলপ্রসূ ওষুধ।

কিন্তু প্রতি একরে ৯ লিটার নেমাগন প্রয়োগ করলেও ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়া গাছ লাগানোর ৩০ দিন পর ডিডি, ইবিসিপি একইভাবে প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া যায়। এছাড়া সাধারণভাবে পাতা পচা সার, কাঠের গুঁড়া, নিমখোল, সোডিয়াম নাইট্রেট, প্রভৃতি ব্যবহার করলে নেমাটোড আক্রমণ কম হয়। যাইহোক নেমাটোড প্রতিরোধকারী শস্যের চাষ বাঞ্ছনীয়। এস, এল-120 এরকম একটি নেমাটোড প্রতিরোধকারী টোম্যাটো প্রজাতি।

শীতকালীন কপিজাতীয় শস্য ঃ

(1) করাত মাছি ঃ এই মাছি দেখতে কালো রঙের হয়। এরা পাতার ওপর ডিম পাড়ে। লম্বা লম্বা কিড়াগুলিও দেখতে কালো রঙের হয়। এরা চারার ও গাছের কচিপাতা খেয়ে ফেলে। গাছের পাতা বেঁকে যায় ও পরে ঝরে যায়। কপি জাতীয় শস্যে এদের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

দমন ঃ যদি 5% বি এইচ সি অথবা শতকরা 0·2 ভাগ আর্সেনেট ব্যবহার করা যায়, তাহলে এই পোকা দমন করা যায়।

(2) **জাব পোকা ঃ** বাঁধাকপি ও অন্যান্য শীতের শস্যে ধূসর রঙের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা দেখা যায়। আকাশ মেঘলা থাকলে এদের আক্রমণ বেশী হয়। এরা গাছের রস শোষণ করে। এর ফলে, গাছ ঝিমিয়ে পড়ে ও বাড়ে না।

দমন ঃ জাব পোকা দমনের জন্য শতকরা 2 ভাগ মাছের তেল, রেজিন এবং সাবান মিশিয়ে ওষুধ তৈরী করে গাছে ছড়ানো উচিত। অথবা শতকরা 0·05 ভাগ নিকোটিনের জলীয় দ্রবণ খুবই কার্যকারি। যাই হোক, শতকরা 0·1 ভাগ বি এইচ সি অথবা 0·05 ভাগ মেলাথিয়ন প্রয়োগ করলেও দমন করা যায়।

(3) **বাঁধাকপি ছিদ্রকারী পোকা ঃ** বাঁধাকপি ছিদ্রকারী পোকা দেখতে ফ্যাকাসে বাদামী রঙের। এরা বাঁধাকপির পাতা ছিদ্র করে ও কাণ্ড খেয়ে ফেলে। বাঁধাকপির বলের মধ্যে ঢুকলে পুরো কপিটায় ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায়। গাছটি মরেও যেতে পারে।

দমন ঃ যান্ত্রিক উপায়ে যদি প্রথম অবস্থায় পোকাগুলিকে বেছে ফেলা যায়, তা হলে খুবই ভাল হয়। তাছাড়া শতকরা 0·04 ভাগ ফলিডল প্রয়োগ করেও ভাল ফল আশা করা যায়।

(4) **বাঁধাকপির মাছি ঃ** বাঁধাকপির মাছি প্রথমে কাণ্ড ও পরে মূল আক্রমণ করে। এরা কপির মাথার ভিতরের অংশ খেতে আরম্ভ করে এবং সেগুলি ধীরে ধীরে পচে নষ্ট হয়ে যায়।

দমন ঃ দমনের জন্য মার্কিউরিক ক্লোরাইড (0·07% দ্রবণ) হেক্টার প্রতি 441—510 লিটার হিসাবে আক্রান্ত গাছে প্রয়োগ করলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়।

(5) **কপির শোঁয়াপোকা ঃ** শোঁয়া পোকার উৎপত্তি উত্তর আমেরিকায়। এরা সাধারণতঃ শুঁটি জাতীয় গাছ ও টোম্যাটো, আলু, বিট, লেটুস, পালং প্রভৃতি খেয়ে বেঁচে থাকে। গাছের পাতার টিস্যু খেয়ে ফেলে ও গাছ নষ্ট করে ফেলে।

দমন ঃ শোঁয়া পোকাকে রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগ করে মারা খুবই কষ্ট-সাধ্য। যাই হোক ভাইরাস দ্বারা এই পোকা কিছুটা দমন করা যায়। থাইল্যাণ্ডে, এক প্রকার ভাইরাস (নিউক্লিয়ার-পলিহেড্রোসিস) ব্যবহার করে ভাল ভাবেই পোকা দমন করা হয়েছে। এই ভাইরাস ব্যবহার করলে পরে কোন প্রকার

ভাইরাসজনিত ক্ষতি হয় না। মহীশূরেও এই ভাইরাস প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া গেছে।

(6) **কালো পচন রোগ ঃ** ফুলকপি ও বাঁধাকপির মাথায় কালো কালো পচা দাগ দেখা যায়। ফলে ফুলকপির ও বাঁধাকপির রঙের আমূল পরিবর্তন হয়। পাতার পার্শ্ব রেখা হলদে হয়ে যায়। শিরাগুলি কালো হয়ে যায়। এটি বীজঘটিত রোগ।

দমন ঃ যেহেতু এটি বীজঘটিত রোগ সুতরাং বীজ শোধন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। গরম জলে (50° সেঃ উত্তাপে) 30 মিনিট রেখে বীজ শোধন করলে সুফল পাওয়া যায়। এছাড়া শতকরা 1 ভাগ মারকিউরিক ক্লোরাইড দ্রবণে আধ ঘণ্টা বীজ ডুবিয়ে শোধন করলেও ভাল ফল পাওয়া যায়। শস্য পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকারে শস্য চাষ করলেও উপকার পাওয়া যায়।

(7) **ধসা রোগ ঃ** ধসা রোগ ফুলকপি ও বাঁধাকপিকে আক্রমণ করলে বাদামী বা কালো রঙের ছাতাযুক্ত আস্তরণ দেখা যায়।

দমন ঃ এটিও বীজঘটিত রোগ, সুতরাং আগের মতই বীজ শোধন করলে উপকার পাওয়া যাবে।

(8) **গদাকৃতি মূলঃ** অত্যধিক অম্ল জমিতে চাষ করলে গদাকৃতি মূল দেখা যায়। মূলের সাধারণ আকৃতি বৃদ্ধি পেতে পেতে গদাকৃতি ধারণ করে।

দমন ঃ এই রোগ দমনের জন্য মাটির অম্লত্ব কমিয়ে আনা দরকার। জমি শোধনের জন্য পরিমাণমত কলিচুন ব্যবহার করা যায়। এই রোগ দমনের জন্য বিশেষ করে ফুলকপি ও বাঁধাকপির ক্ষেত্রে "ক্যালেথেল 8" (0·01% জলীয় দ্রবণ) একর পিছু 3—4 লিটার ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

(9) **নেমাটোড ঃ** সাধারণতঃ শীতকালীন শস্যের মধ্যে নেমাটোড আক্রমণ বেশী দেখা যায়। আক্রান্ত গাছের মূলে ছোট বড় গুটি দেখা যায় এবং গাছের খাদ্য চলাচল ও বৃদ্ধি বন্ধ করে দেয়।

দমন ঃ এটি মৃত্তিকাবাহী রোগ। নেমাটোড দমন পদ্ধতি পূর্বেই বলা হয়েছে। সেই মত মাটি শোধন করা বাঞ্ছনীয়।

(10) **মূল পচন ঃ** কাণ্ডের নিচের দিকে ও গাছের মূলে কালচে দাগ দেখে এই রোগ চেনা যায়। আক্রান্ত জায়গা পচতে আরম্ভ করে এবং গাছ আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়ে।

দমন ঃ বীজ শোধন এই রোগ দমনের একমাত্র উপায়।

মূল জাতীয় শস্য :

(1) **জাবপোকা :** মূলা, শালগম প্রভৃতিতে জাবপোকার আক্রমণ দেখা যায়। জাবপোকার আক্রমণ সংক্রান্ত বিষয় আগেই আলোচনা হয়েছে।

দমন : জাব পোকা দমন পদ্ধতি আগেই বলা হয়েছে।

(2) **অন্যান্য ক্ষুদ্র পোকা মাকড় :** মূল জাতীয় শস্যে কিছু ক্ষুদ্র পোকা মাকড়ও দেখা যায়, যেমন কীড়া, ডোম আকৃতির পোকা, উইপোকা, পাতাছিদ্রকারী পোকা ও মাছি। এরা অবশ্য জাবপোকার মত এত বেশী ক্ষতি করে না।

দমন : নানান ধরনের স্নায়বিক বা আন্ত্রিক কীটনাশক ব্যবহার করে এগুলি দমন করা যায়। এ সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে।

(3) **ক্ষতিকারক রোগ :** কিছু কিছু অল্প ক্ষতিকারক রোগ দেখা দেয় যেগুলো গাছের অল্প ক্ষতি করে যেমন, ব্লাইট, গাছের পাতার দাগ, গদাকৃতি মূল ইত্যাদি।

দমন : এগুলি দমন করার জন্য ব্লাইটকস্, ব্লুকপার ক্যাপটেন (0.03% জলীয় দ্রবণ) মারকিউরিক ক্লোরাইড (0·07% জলীয় দ্রবণ) ব্যবহার করা যায়।

কুমড়ো জাতীয় সব্জী :

(1) **ফল ছিদ্রকারী মাছি :** এই ধরনের মাছি পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় ফুলের গর্ভাশয়ে ডিম পাড়ে। কালক্রমে ডিম থেকে কীট বেরিয়ে ফলের ভেতর যেতে আরম্ভ করে। আস্তে আস্তে ফলটিকে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে, ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে।

দমন : মাছি দমনের জন্য নিকোটিনিক সালফেট (0·1% জলীয় দ্রবণ) অথবা এনড্রিন (0·02% জলীয় দ্রবণ) প্রয়োগ করা যায়। অবশ্য ঝিঙে গাছকে ফাঁদ শস্য হিসাবে ব্যবহার করে শতকরা 50 ভাগ গ্যামাক্সিন প্রয়োগ করলে পোকা মারা যায়। কারণ যখন কড়া রোদ ওঠে অর্থাৎ সকাল 9টা থেকে বিকাল 4টার মধ্যে ঐ পোকা ঝিঙে গাছের ছায়ার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। তাই মারতে সুবিধা হয়। এছাড়া মাছি প্রতিরোধকারী সব্জীর চাষ করলেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

(2) **গুবরে পোকা :** কুমড়োর গুবরে পোকা পূর্ণাঙ্গ ও লার্ভা অবস্থায় ছোট ছোট গাছের কচি পাতা খেয়ে ফেলে, গাছ বড় হলে ফুল ও ফল নষ্ট করে প্রভুত ক্ষতি করে।

দমন ঃ কুমড়োর এই ধরনের পোকা দমনের জন্য বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছেন। সাধারণভাবে এক লিটার কেরোসিনের সঙ্গে ছাই অথবা রাস্তার ধুলো মিশিয়ে গাছের উপর ছড়িয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। অন্যান্য কীটনাশক ওষুধের মধ্যে কারাবারিল ফসফোমিডন, এনড্রোসালফান এবং ম্যালাথিয়ন এই পোকা দমনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। অবশ্য ওষুধের প্রতিক্রিয়া প্রায় 5—10 দিন থাকে। এই সময় ফল সংগ্রহ করা উচিত নয়।

(3) **পাউডারি মিলডিউ ঃ** এই রোগ সাধারণতঃ পাতায় ও কাণ্ডে দেখা দেয়। যখন এই রোগের প্রকোপ বেড়ে যায় তখন পাতায় ও কাণ্ডে সাদা সাদা গুঁড়োর মত দেখা যায়, এর ফলে গাছের পাতা ঝরে পড়ে ও গাছের বাড় কমে যায়। স্বাভাবিক ভাবে গাছে ফল ধরে না। যদিও বা ধরে, ফল পুষ্ট হওয়ার আগে ঝরে পড়ে।

দমন ঃ এই রোগ দমন করার জন্য ক্যারাথেন (0·025% জলীয় দ্রবণ) 10 দিন অন্তর প্রয়োগ করলে খুব ভাল হয়। অথবা গন্ধক গুঁড়ো প্রয়োগ করলেও খুব ভাল ফল পাওয়া যায়।

(4) **ডাউনি মিলডিউ ঃ** গাছের পাতার উপরের অংশে হলদে ও নীচের অংশে বেগুনী দাগ দেখা যায়। পরে পাতা জ্বলে যায়। গাছও জ্বলে যেতে পারে। ফল উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে না।

দমন ঃ এই রোগ দমন করার জন্য তামা ঘটিত ওষুধ (0·6% জলীয় দ্রবণ) প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। বোর্দো মিশ্রণ (3ঃ3ঃ50 বা 2ঃ2ঃ50) খুবই কার্যকারী। এছাড়া ডাউনি মিলডিউ রোধক্ষম প্রজাতি ব্যবহার করেও এই রোগ দমন করা যায়।

(5) **অ্যানথ্রাক নোজ ভূষো রোগ ঃ** রোগটির আক্রমণের ফলে গাছের পাতা ও ফলে লম্বা লম্বা বাদামী থেকে কালো কালো দাগে ভরে যায়। পাতাগুলিকে দেখলে মনে হয় প্রচণ্ড রোদে পুড়ে গেছে। পরে ফলও পচতে আরম্ভ করে।

দমন ঃ এই রোগ দমনের জন্য পেরেনক্স অথবা বোর্দো মিশ্রণ (অনুপাত আগেই বলা হয়েছে) গাছে ছিটালে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়া "এ্যাগ্রোসান-জি-এন" দিয়ে বীজ শোধন করলেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

(6) **ভাইরাস ঃ** ভাইরাস সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে। তবে আক্রান্ত

কুমড়ো গাছে এই রোগের বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন। পাতার মোজাইক রঙ, ডাঁটা ও পাতা কুঁকড়ে যাওয়া, ফুল ও ফল উৎপাদন কমে যাওয়া উল্লেখযোগ্য।

দমন ঃ দমন পদ্ধতি আগেই বলা হয়েছে।

শুটি জাতীয় শস্য ঃ

(1) **এফিড (জাব পোকা) ঃ** আক্রমণ ও দমন পদ্ধতি আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

(2) **শুঁটি ছিদ্রকারী পোকা ঃ** এই ধরণের পোকা সীম জাতীয় শুটি ও মটরের শুটিকে ছিদ্র করে তার ভিতর ঢুকে পড়ে এবং সমস্ত দানা খেয়ে ফেলে। এমন কি গাছের কচি ও শাঁসাল অংশও খেয়ে ফেলে।

দমন ঃ শুটি ছিদ্রকারী পোকা দমনের জন্য পাইরিথ্রাম (0·06% জলীয় দ্রবণ) গাছে প্রয়োগ করা উচিত। 0·2% বি, এইচ, সি, প্রয়োগ করেও ভাল ভাবে এই পোকা দমন করা যায়।

(3) **ল্যাব্ ল্যাব্ বাগ (সীমের ছারপোকা) ঃ** এই ধরণের পোকা দেখতে ডিম্বাকৃতির হয়। এরা পূর্ণাঙ্গ ও কীড়া অবস্থায় গাছের রস শুষে খায়, ফলে পাতার রঙ নষ্ট হয়ে যায় এবং শিরা উপশিরাগুলি শুকিয়ে যায়।

দমন ঃ 50 শতাংশ বি, এইচ, সি, 10 গ্রাম 8 লিটার জলে গুলে গাছে ছড়ালে ছারপোকাজাতীয় পোকা দমন করা যায়।

(4) **এ্যানথ্রাক নোজ (ভুষো) ঃ** আক্রমণ ও দমন পদ্ধতি আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

(5) **পাউডারি মিলডিউ ঃ** আক্রমণ ও দমন পদ্ধতি আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

(6) **মরচেপড়া ঃ** এটি একটি ছত্রাক ঘটিত রোগ। গাছের পাতার নিচের দিকে প্রথমে লালচে ও পরে কালোদাগ হয়। রোগের সংক্রামণ বেশী হলে পাতা হলদে হয়ে ঝরে পড়ে।

দমন ঃ প্রতি হেক্টারে 20—30 কেজি সালফার প্রাথমিক অবস্থায় বা আক্রমণের ঠিক পরে ছড়ালে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়া বোর্দ্দ মিশ্রণ (5:5:50) ছড়ালে রোগের সংক্রমণ কমে যায়।

(7) **ভাইরাস ঃ** পাতা হলুদ ও সবুজ রঙের মিশ্রণে মোজাইক বর্ণ ধারণ করে। এ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

দমন ঃ পূর্ব্বে দমন পদ্ধতি সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

ঢেঁড়স জাতীয় সব্জী :

(1) **গাছের কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা :** এই ধরণের পোকাগুলির রঙ কিছুটা কালো ও বাদামী ছোপযুক্ত হয়। গাছের কাণ্ড ও ফুলের গর্ভাশয়ে ছিদ্র করে এরা ভিতরে ঢুকে যায় ও ভিতরের সমস্ত শাঁস খেয়ে ফেলে। কাণ্ড ছিদ্র করার ফলে গাছ দুর্বল হয়ে যায়।

দমন : দমনের জন্য সোডিয়াম অথবা লেড আর্সেনেট (0·3% জলীয় দ্রবণ) এবং প্যারিস-গ্রীণ গুঁড়ো (পাউডার) জলে গুলে ছড়ালে পোকার বংশ-বৃদ্ধি কমান যায়। এছাড়া বি-এইচ-সি শতকরা 5 ভাগ পাউডার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

(2) **জ্যাসিড্ :** জ্যাসিড এক ধরণের মাকড়সার মত পোকা। এগুলির রঙ সাদা সবুজ মেশান। সাধারণত এরা পাতার নিচের অংশে একজায়গায় জড় হয়ে থাকে। চারা অবস্থায় এদের আক্রমণ দেখা যায় এবং গাছের রস শোষণ করে। এদের আক্রমণে পাতা কুঁকড়ে যায়।

দমন : এই পোকা নির্মূল করতে হলে নিকোটিনিক সালফেট প্রয়োগ করে খুবই ভাল ফল পাওয়া যায়। ডাই-এলড্রিন, এনড্রিন এবং ইথাইল-প্যারাথিয়ন বিভিন্ন মাত্রায় ছড়িয়ে ছোট ছোট মাকড়সা মেরে ফেলা যায়। মেটাসিসটক্স (0·05% জলীয় দ্রবণ) অথবা ফলিডল (0·025% জলীয় দ্রবণ) প্রয়োগ করেও খুব ভালভাবে এগুলি দমন করা যায়। দানা জাতীয় কীটনাশক ওষুধ যেমন ফোরেট খুবই কার্যকারী। এটি প্রয়োগ করলে অনেক দিন পোকার আক্রমণ প্রতিহত হয়। এ্যাসিড কার্ব এবং কারবো ফিউরান ব্যবহার করেও এ জাতীয় মাকড়সার আক্রমণ রোধ করা যায়।

(3) **সাহেব রোগ :** ভাইরাস ঘটিত এই রোগটিকে অনেকে সাহেব রোগও বলে। ছোট ছোট মাকড়সার দ্বারা এই রোগ ছড়ায়। ভাইরাসজনিত রোগ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

দমন : সাধারণভাবে পরিবাহী পতঙ্গ প্রতিরোধ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অন্যথায় গাছ ধ্বংস করা ছাড়া উপায় থাকে না।

পেঁয়াজ জাতীয় শস্য :

(1) **পেঁয়াজের থ্রিপস :** এটি একটি পেঁয়াজের পাতা আক্রমণকারী পোকা। দেখতে খুবই ছোট এবং হলদে রঙের। এরা গাছের রস শুষে খায়।

এদের ছোট ছোট পাখনা থাকে। যখন গাছে আক্রমণ করে তখন গাছের পাতায় সাদা সাদা গোল গোল দাগ দেখা যায়, পরে ঐগুলি বাদামী রঙের হয়ে যায় ও গাছ ঝিমিয়ে পড়ে।

দমন : এই পোকাকে দমন করার জন্য 15 দিন অন্তর ফলিডল (0·02% জলীয় দ্রবণ) প্রয়োগ করা উচিত। এছাড়া লিনডেন প্রয়োগ করেও এ ধরণের পোকা মাকড় দমন করা যায়।

(2 **ধসা :** ধসা রোগে আক্রান্ত গাছে নানান ধরণের উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন গাছের পাতার উপরে ছোট ছোট সাদা দাগ দেখা যায় ; ঐ সাদা দাগের ভিতরের দিকটা আবার খয়েরী রঙের হয়। দাগগুলি খুব বেড়ে যায়। গাছের কাণ্ডে খাদ্যবাহী নালীকে আক্রান্ত করে ফেলেও গাছ মাটিতে শুয়ে পড়ে। এছাড়া সেটারে রাখার সময় পচে নষ্ট হয়ে যায়।

দমন : এই রোগ দমনের জন্য 1% বোর্দ্দ মিশ্রণ (5:5:50) ব্যবহার করা উচিত।

(3) **ভুষো রোগ :** পেঁয়াজ জাতীয় গাছে এটি একটি মারাত্মক রোগ। সাধারণত পুরাতন পেঁয়াজের গোড়ার দিকে, খোসার নিচে এক ধরণের কালো গুঁড়ো পাউডারের মত দেখা যায় এগুলিই রোগের বীজাণু। এছাড়া ছোট ছোট গাছের অঙ্কুরিত পাতায় কালো অথচ মোটা ধরণের একটা আস্তরণের সৃষ্টি করে, এগুলিই ভুষো রোগের লক্ষণ।

দমন : যেহেতু রোগটি বীজ পরিবাহিত সেজন্য বীজ শোধন অত্যন্ত জরুরী। এই রোগ দমন করার জন্য 60—90 গ্রাম তুঁতে 4 কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে শোধন করে নিলে ভাল হয়। এছাড়া বীজতলায় শোধনের জন্য 40% ফরম্যালডিহাইড 4-5 লিটার জলে গুলে 46 বর্গমিটার পরিমাণ জায়গা শোধন করা যায়।

(4) **ডাউনি মিলডিউ :** ডাউনি মিলডিউ-এর আক্রমণ ও প্রতিরোধ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়

সব্জী বিপণন ও বাজারজাতকরণ

লাভজনক ভাবে সব্জী চাষ করতে গেলে কতকগুলি বিশেষ দিকের প্রতি নজর রাখতে হবে। যেমন ঠিক সময়ে তোলা, সব্জী হিসাবে গ্রহণ যোগ্য কিনা দেখা, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা ও শেষে বাজারজাত করা। ভারতীয় কৃষি ভাল বাজারের অভাবে শোচনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন। ভারতীয় কৃষি বিপণন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক এবং যে কোন সময়ে এটিকে সংশোধন করা যায়। সব্জী একটি সজীব পদার্থ। সব্জীর অভ্যন্তরে শ্বাসপ্রশ্বাস, বাষ্পোমোচন এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নানান পরিবর্তন চলতে থাকে।

প্রকৃত অর্থে আর্থিক উন্নতি করতে হলে অধিক ফলন একান্ত প্রয়োজন। এবং অধিক ফলন পাওয়ার জন্য চাই উন্নত জাতের বীজ, উৎকৃষ্ট পরিচর্যা, নির্দিষ্ট সময়ে ফসল সংগ্রহ এবং আকার অনুসারে (ছোট, মাঝারি, ও বড়) ফসল বাছাই। বাছাই-এর পর সুন্দরভাবে বস্তা, ঝুড়ি বা কাঠের বাক্সে ভর্তি করলে স্থানান্তরে নিতে সুবিধে হয়। উপযুক্ত সময়ে শস্য সংগ্রহ করে বাজারজাত করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে বিক্রি করলে, শস্যের উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায়। বাজারজাতকরণ ও বিপণনের দক্ষতা, চাষীর নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে।

যাইহোক, বাজার কথাটির অর্থ নানাজন, নানা ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে সঠিক জিনিষ, নির্দিষ্ট পরিমাণে উপযুক্ত সময়ে উচিত মূল্যে বিক্রি করাকেই প্রকৃত বাজারজাতকরণ বলা যায়। উৎপাদক বাজারে শস্য এনে আকৃতি অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ ও মূল্য নির্ধারিত করে। দালালরা শস্য সংগ্রহ করে, প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানান্তরে প্রেরণ করে। কাজেই বাজারজাতকরণ একটি কেন্দ্রীয় সমন্বিত প্রচেষ্টা ; কোন একক ব্যবস্থার সাহায্যে সম্পূর্ণ হয় না। বাজারজাতকরণের প্রতিটি স্তরেই ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য থাকলেও, ক্রেতাদের সুবিধা ও সংরক্ষণের প্রাথমিক ব্যবস্থা অবহেলিত নয়।

সব্জীর বাজারজাতকরণ যদিও অনেকগুলি উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল তবুও নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলিই মুখ্য।

(1) উৎপাদিত সব্জী উৎপাদকের কাছ থেকে গ্রাহকের কাছে আনতে হবে।

(2) চাষীকে উপযুক্ত ও ন্যায্য দাম বজায় রাখতে হবে।

(3) বাজারজাত সব্জীগুলিকে বিক্রয়যোগ্য ও আকর্ষণীয় অবস্থায় নিয়ে আসতে হবে। সেই সংগে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে বিক্রয়যোগ্য জিনিষের আকৃতিগত ও গুণগত মান নষ্ট না হয়।

(4) বিক্রয়যোগ্য জিনিষ, প্রকরণ অনুযায়ী, আকৃতিগত ও গুণগতভাবে ভাগ করে নিতে হবে।

(5) বাজারজাত করার জন্য যতদূর সম্ভব কম খরচ করতে হবে।

(6) বিক্রয়যোগ্য জিনিষের দাম যাতে গ্রাহকের ধরা ছোঁয়ার বাইরে না চলে যায় তার দিকে নজর রাখতে হবে।

(7) সরবরাহ যাতে যথাযথ ভাবে বজায় থাকে তার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

আগেই বলা হয়েছে যে, বাজারজাত করতে গেলে বেশ কয়েকটি মাধ্যমিক পর্যায় অনুসরণ করতে হয়। এই পর্যায়গুলি যদি সঠিকভাবে পর্যালোচনা না করা হয়, তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা ধাঁধার মধ্যে থেকে যাবে। তাই পর্যায়-গুলি যথাক্রমে আলোচনা করা হল। পর্যায়গুলি হল—

(ক) শ্রেণীবিন্যাস, (খ) গুণগত বিন্যাস, (গ) আধার জাতকরণ, (ঘ) চিহ্নিতকরণ, (ঙ) পরিবহণ, (চ) গুদাম জাতকরণ, (ছ) গুণগত-মান রক্ষা।

(ক) **শ্রেণী বিন্যাস ঃ** বাছাই করা হয়ে থাকে সাধারণত প্রকারগত ও আকৃতিগত ভাবে। কারণ বিভিন্ন জাতের সব্জীর ভিতর বিভিন্ন রকম আকার, লক্ষণ ও গুণগত দিক থেকে যায়। প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক ভাবে বেছে নেওয়া দরকার, যেমন পুষা শাওনী এবং পুষা মখমলী জাতের ভিণ্ডি বা পুষা রুবী এবং অক্সহার্ট জাতীয় টোম্যাটো আলাদা আলাদা ভাবে বাছাই করে রাখলে, ক্রেতার আকর্ষণের পক্ষে সুবিধা হয় ও কেনার আগ্রহ বাড়ে। ঠিক একই ভাবে, যদি একই ধরনের সব্জীর বিভিন্ন আকৃতি দেখা যায় তবে সেগুলি আকৃতি অনুসারে ছোট, মাঝারি ও বড় হিসাবে বাছাই করে রাখা হয়। এই ভাবে বিন্যাস বা বাছাই করলে ক্রেতার আকর্ষণ ছাড়াও বাজারদর বেশী পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বাছাইয়ের কাজ ভিন্ন ভিন্ন জায়গাতে হতে পারে। যেমন, যেখানে সব্জী উৎপাদন হয় সেই জায়গাতে চাষী ফসল তোলার পর নিজে বাছাই করে রাখতে পারে ; অথবা যেখানে আধারবন্দী করা হয় সেখানেও বিন্যাস করা যেতে পারে।

আবার বাজারে সব্জী এলে দালাল বা ফোড়েরাও এ ধরনের বিন্যাস করে থাকে। বাছাইয়ের যেটা সুবিধা সেটা হচ্ছে ভালভাবে দেখাশুনা করা যায় এবং সমান-ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা যায়। যার ফলশ্রুতি হিসাবে ভাল দাম পাওয়া যায়।

বাছাইয়ের কাজ নানান ভাবে করা যায়—যেমন হাত দিয়ে ও যন্ত্রের সাহায্যে। হাত দিয়ে সাধারণত বড়, মাঝারি ও ছোট বেছে নেওয়া যেতে পারে। যন্ত্রের সাহায্যে বাছাইয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের মেশিন পাওয়া যায়; একই মেশিনে যেমন ছোট, বড় ও মাঝারি বাছাই হয় তেমনি কোন কোনটিতে শুধু একই ধরনের, যেমন শুধুই বড় বাছাই হয়। শ্রেণীগত ভাবে সব্জী বাছাই করতে হলে সাধারণত হাতের সাহায্যেই করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আলু প্রথমে হাত দিয়ে শ্রেণীগত ভাবে বেছে নেওয়া হয়। তারপর ছিদ্র যুক্ত পরিবহন ফিতার সাহায্যে আকৃতি অনুসারে বাছাই করে নিতে হয়। মেসিনে দাগী বা কাটা আলু বাছাই করা সম্ভব নয়। টোম্যাটোও একই ভাবে বাছাই করা হয়। ভাল সব্জীর সাথে দাগী সব্জী মিশে থাকলে ভালগুলি নষ্ট হবার ভয় থাকে। দূরে পাঠাতে হলে পাকার আগেই সব্জীগুলি সংগ্রহ করা উচিত। অবশ্য বরবটী, সীম, মটর প্রভৃতি মেসিনের সাহায্যে বাছাই করা খুবই দুরূহ ব্যাপার।

(খ) গুণগত বিন্যাস: শ্রেণী ও গুণগত বিন্যাস নিয়ে নানা ধরনের ভ্রমের অবকাশ দেখা দেয়। যদিও আপাতদৃষ্টিতে উভয়ই প্রথাগতভাবে বাছাই, কিন্তু বাছাইয়ের ভিন্নতা অনুযায়ী বাছাইকে ভাগ করা হয়। বাছাই-এর ক্ষেত্রে যে যে জিনিষগুলি লক্ষণীয় তা হচ্ছে আকৃতি ও পক্কতা, রং, গুণগত মান ও অন্যান্য গুণগত বৈশিষ্ট্য। সাধারণত দেখা যায়, চাষীরা যখন মাঠ থেকে ফসল তোলে তখনই সে তার মত করে বিশেষ বাছাই বা গ্রেডিং পর্ব শেষ করে দেয়। বাছাই বিশেষ ভাবে নির্ভর করে চাষীর লাভ-লোকসানের উপর। কারণ ক্রেতা যত পছন্দসই জিনিষ পাবে, ততই তাদের কেনার আগ্রহ বাড়বে ও বেশী পয়সা দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। এতে চাষী দামের দিক থেকে উপকৃত হবে। বাছাই জিনিষ, অপেক্ষাকৃতভাবে পাঁচ-মিশেলি জিনিসের থেকে, বেশী দাম পায়। এছাড়া আধার জাত করার ক্ষেত্রেও অনেক পয়সা বেঁচে যায়। এবং সেই সাথে দূরে পাঠানোর খরচ কমে। এছাড়া পাঁচ মিশেলি জিনিস, ভাল জিনিসের সাথে মিশে গেলে, নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দেখা দেয়; যার ফলে ভাল জিনিস নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই বিশেষ ভাবে বাছাই জিনিষ বাজারদরের সমতা রাখে। সেই সাথে বাজারজাত করার খরচও কম পড়ে।

বাছাইয়ের কয়েকটি বিশেষ লক্ষ্য আছে। যা সমস্ত উদ্যানজাত ফসল বাছাই-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

(1) **বাছাই খরচ ঃ** বিশেষ বাছাইয়ের জন্য দুই ভাবে খরচ হতে পারে। প্রথমত বাছাইয়ের জন্য যে ব্যক্তি বা যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তার খরচ এবং দ্বিতীয়ত বাছাইয়ের খরচ। আগেই বাছাই যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বাছাইয়ের জন্য দামি মেসিন তখনই ব্যবহার করা যেতে পারে, যখন দেখা যায় মেসিনের উৎপাদন অনেক বেশী এবং অল্প সময়ে নিখুঁত ভাবে অনেক বেশী কাজ করে। বাছাইয়ের সময় আকৃতির সমতা একান্ত দরকার। বাছাইয়ের জন্য খরচা, উৎপাদিত জিনিষের মূল্য অপেক্ষা বেশী হবে না।

(2) **যন্ত্রের গঠন পদ্ধতি ঃ** বাছাই যন্ত্রের গঠন এমন হবে, যাতে যন্ত্রে আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাছাইয়ের সুযোগ থাকে। তাড়াতাড়ি নিখুঁত কাজ হয় ও বাছাইয়ের খরচা কমিয়ে আনা যায়। কোন ভাবেই, বাছাইয়ের সময় সব্জী নষ্ট না হওয়াও, ভাল যন্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য।

(গ) **আধারজাতকরণ ঃ** ঝাড়াই ও বাছাইয়ের পর উৎপাদিত বস্তুকে বাক্সবন্দী, ঝুড়িবন্দী বা বস্তাবন্দী করাকে আধারজাতকরণ বলে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় বাক্সবন্দী করার আগে উৎপাদিত বস্তুর কিছু পরিচর্যা করা দরকার হয়। সব্জী বস্তাবন্দী বা বাক্সবন্দী করার আগে বিশেষ পরিচর্যা করা বর্তমানে খুব প্রয়োজনীয়। টাটকা সব্জীকে খাওয়ার উপযোগী করে তৈরী করে নিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে প্যাকেট বা ঠোঙা-জাত করার কাজ অল্প কিছুদিন হল প্রচলিত হয়েছে। ঠোঙা-জাত করার আগে অপ্রয়োজনীয় বা অব্যবহার্য অংশ বাদ দেওয়া উচিত। ঠোঙা-জাত করলে দূরে পাঠানোর জন্য বেশী জায়গার প্রয়োজন হয় না। এবং ক্রেতারা অল্প সময়ে নির্দিষ্ট জিনিষ ঠিক মত কিনতে পারে। ভাল বস্তু উপরে ও খারাপ বস্তু নিচে রাখা আধার-জাত করার উদ্দেশ্য নয়। কয়েকটি বস্তু প্রয়োজনের তাগিদে আধার-জাত করা হয়।

(1) উৎপাদিত বস্তু ঠিকভাবে পরপর সাজান হয়।

(2) উৎপাদিত বস্তু দূরে পাঠানোর সুবিধে হয়।

(3) আধারে থাকার ফলে সব্জীর কোন প্রকার গুণগত মান নষ্ট হয় না।

(4) আধারের মধ্যে রোগ ও পোকার আক্রমণের সম্ভবনা থাকে না।

(5) সব্জী শুকিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না ও ওজনে কমে না।

(6) এছাড়া বহন করার সুবিধে হয়।

আধার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে এবং নানান উপকরণ দিয়ে তৈরী করা হয়। তাদের মধ্যে কয়েকটির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন—কাগজ, পাট, বাঁশ, কাঠ এবং কৃত্রিম আবরণ। আকৃতিগত ভাবে আধারগুলি, ঝুড়ি, বস্তা, বাক্স ইত্যাদি হতে পারে।

ঝুড়ি, সাধারণত বাঁশের বা বেতের তৈরী। অনেক জায়গাতে নরম কাঠের পাতলা ও সরু ফালি দিয়েও ঝুড়ি তৈরী করা হয়। থলে তৈরী হয়, পাট, তুলো, কাগজ অথবা কৃত্রিম সুতোর সাহায্যে। এগুলি সাধারণত এক মুখ খোলা ও বড় মাপের হয়। পাটের থলে আলু ও পেঁয়াজ দূরে পাঠানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। কাগজের ঠোঙা বা কাপড়ের থলেতে বিভিন্ন ধরনের বীজ রাখা হয়।

এছাড়া কাঠের জালা আস্ত সব্জী রাখার অনুপযুক্ত হলেও পাকা সব্জীর রস রাখা ও পাঠানোর জন্য উপযুক্ত আধার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য জালা ঢাকের মত আকৃতি হওয়ায় গুদামে বেশী জায়গা নেয়। বাক্স তৈরী করা হয় কাঠ, কাগজ, বেত, লোহা অথবা পলিথিন দিয়ে। এই বাক্সগুলি নানান ধরনের হয়। যেমন কোনটি গোল, কোনটি চারকোণা, কোনটি লম্বাটে। সাধারণত প্রয়োজনবোধে এগুলির আকৃতির রকমফের করা হয়। এই বাক্সগুলির ভিতর খোপ থাকবে না সমান হবে সেটা নির্ভর করে কি ধরনের বস্তু তাতে থাকবে বা পাঠানো হবে তার উপর। অনেক সময় বাক্সের ভিতর টিসু কাগজ দিয়ে টোম্যাটো ইত্যাদি মুড়ে দেওয়া হয়। কাঠের ও কাগজের বাক্স বহুল পরিমাণে কব্যবহৃত হয়—টোম্যাটো, ফরাসবীন, গাজর, বীট ও শশা প্রভৃতি আধারজাত রার জন্য।

বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের প্যাকেট পাওয়া যায়। এগুলি সাধারণত কাগজ বা পলিথিন দিয়ে তৈরী। অনেক জায়গায় পাতলা রঙিন পলিথিনের প্যাকেটে সব্জী বিক্রি হতে দেখা যায়। সব্জী সাধারণত সরস হয়। বাস্প বিমোচন কমানোর জন্য সব্জীর উপরে একটা পাতলা মোমের আবরণও দেওয়া যেতে পারে। সব্জী রপ্তানী ব্যবসাতে এই পদ্ধতি কাজে লাগানো যেতে পারে। তবে দেশের মধ্যে বিক্রির জন্য এই পদ্ধতির খরচ বেশী পড়ে যায়।

সাধারণত বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতি জাল যুক্ত থলেতে রাখা হয়। তা না হলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় মাঠ থেকে চাষীরা কাপড়ের তৈরী থলেতেও সব্জী আনে। আলু ও পেঁয়াজের ক্ষেত্রে চটের ও নাইলনের

থলেও ব্যবহার করা হয়। আধারজাত করার জন্য সব সময় নতুন ব্যাগ ব্যবহার করা উচিত। মটরশুঁটি ও বীনের জন্য অনেক সময় বেতের বা বাঁশের তৈরী বড় বড় ঝুড়ি ব্যবহার করা হয়। অপরপক্ষে টোমাট্যোর জন্য কাঠের অথবা বাঁশের বাক্স লাগে। বাক্স বা ঝুড়ির উপর কাগজ অথবা গাছের পাতা দিয়ে ঢাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করা হয়।

আধারজাত করার অন্যান্য সুবিধে ছাড়াও এতে ফোড়েরা বেশ কিছুদিন সব্জী ধরে রাখার সুযোগ পায়।

(ঘ) **চিহ্নিতকরণ ঃ** কোন সব্জীকে নিখুঁতভাবে চেনার জন্য তার গুণাগুণ জানার জন্য চিহ্নিতকরণ দরকার হয়। যে পাত্রে বস্তু রাখা হয় তার উপরের অংশে অথবা পাত্রটির গায়ে চিহ্নিতকরণ পত্র লাগিয়ে দেওয়া হয়। লেবেলে সাধারণত কয়েকটি জিনিষের উল্লেখ করতে হয়। যেমন পাত্রে আবদ্ধ সব্জীর নাম লিখতে হয় ; কোন মানের অর্থাৎ ছোট, বড়, মাঝারি, কোন্‌টা তাও উল্লেখ করতে হয়। তার গুণগত বৈশিষ্ট্য, কোথায় উৎপন্ন হয়েছে ও কবে সংগ্রহ করা হয়েছে সমস্তই চিহ্নিতকরণ পত্রে লিখে দিতে হয়। বিশেষ করে সব্জীর ক্ষেত্রে তোলার তারিখটি দেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

(ঙ) **সব্জী পরিবহণ ঃ** সব্জী বাজারজাত করার জন্য পরিবহণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। ভারতবর্ষে রেল পরিবহণের সাথে সড়ক পরিবহণের বেশ প্রতিযোগিতা চলে। সড়ক পরিবহণের অনেক সুবিধা আছে। সব্জীর ক্ষেত পর্যন্ত সড়ক পরিবহণের সুযোগ নেওয়া যায়। আবার প্রায় সমস্ত বাজারই সড়ক পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক উৎপাদকের অল্প সব্জীর জন্য পরিবহণের ব্যবস্থা প্রচলিত। তবে সড়ক পরিবহণের খরচ অপেক্ষাকৃত বেশী। রেল পরিবহণে সমস্ত জিনিষ বয়ে স্টেশনে আনলে তবেই রেলে পরিবহণ সম্ভব হয়। অন্যান্য পরিবহণের মধ্যে জল পথে প্রচুর জিনিষ বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। এছাড়া এখনো অবধি অন্য কোন মাধ্যম পরিবহণের জন্য বহুল প্রচলিত হয়নি। তবে সাইকেল রিক্সা, ভ্যান, গোগাড়ী ও কুলির মাধ্যমে পরিবহণ দুরূহ গ্রামাঞ্চলে প্রায়শই দেখা যায়।

তাপ নিয়ন্ত্রিত রেল পরিবহণ খুব সীমিতভাবে ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়েছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সড়ক পরিবহণও প্রচলিত হয়নি বললেই চলে। ফলশ্রুতি হিসাবে টাটকা সব্জী বেশী দূরে পাঠান যায় না।

উন্নত পরিবহণের ক্ষেত্রে আমেরিকার নাম সর্বাগ্রে। সেখানে শীতাতপ

নিয়ন্ত্রিত ট্রাকে, রেলে এমন কি আকাশ পথেও সব্জী পরিবহনের ব্যবস্থা আছে। এরপরে জাপান ও ইউরোপের নামও উল্লেখ করা যায়।

(চ) **গুদামজাতকরণঃ** গুদামজাতকরণের উদ্দেশ্য হল, সব্জী সরবরাহের ধারা ও দামের সমতা স্থির রাখা। সাধারণত সব্জীর গুদামজাতকরণের কোন নির্দিষ্ট সময় থাকে না। যাইহোক গুদাম জাতকরণ সম্বন্ধে, নবম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(ছ) **গুণগত মান রক্ষাঃ** সব্জীর বাজার দর ধরে রাখা, ভাল বাজার দর পাওয়া ও ক্রেতার চাহিদা পূরণ এ সবই নির্ভর করে সব্জীর গুণগত মান রক্ষার উপর। অবশ্য এই গুণগত মান কথাটি বহুল অর্থে ব্যবহার করা হয়। কারণ বস্তুর বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এই গুণগত মানের সঙ্গে জড়িত। যেমন বস্তুর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গুণাগুণ। তাদের গঠন, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি।

সব্জীর গুণগত মান রক্ষা করতে হলে সে বিষয়টির উপর বিশেষ নজর দিতে হবে সেটি হল, সব্জী সংগ্রহের সময়। কারণ সব্জী যদি উপযুক্ত অর্থাৎ ব্যবহার উপযোগী অবস্থায় না তোলা হয় তাহলে যেমন বেশী দিন গুদামজাত করা যায় না, তেমনি ঠিকমত ফলনও পাওয়া যায় না। আবার বেশী দিন মাঠে রেখে ডাঁসা বা পাকা অবস্থার সব্জী সংগ্রহ করার চেষ্টা করলে নানান রোগ ও পোকার উপদ্রবের সম্ভবনা থাকে। এতে সব্জীর গুণগত মান নষ্ট হয়। এছাড়া, অনেক সময় প্রাকৃতিক কারণেও ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। আবার অনেক সব্জী বেশী দিন মাঠে রাখলে বীজ ও অন্যান্য গুণগত মান নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কাজেই ঠিক সময়ে সব্জী তোলা একান্ত দরকার। অবশ্য বিভিন্ন সব্জী তোলার সময় ভিন্ন। সব সব্জী এক রকম অবস্থায় তোলার উপযুক্ত হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আলু এমন একটি সব্জী যে তার সার্বিক গঠন দেখে ঠিক করতে হয় আলু তোলার উপযোগী হয়েছে কিনা। নির্দিষ্ট সময়ের আগে তোলা আলু ভাল দাম পায় ঠিকই কিন্তু তাতে যেমন ফলন কম হয় তেমনি আলুর স্বাদ ও গন্ধের তারতম্য ঘটে। এছাড়া অপুষ্ট আলু গুদাম-জাত করাও যায় না। আবার বেশী দিন মাঠে রাখলে রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ দেখা দেয় এবং আলুর গুণাবলী নষ্ট হয়। ঠিক সময়ে আলু তুলে ছায়ায় শুকিয়ে নিলে আলুর উপরের পাতলা খোসা ভালভাবে শুকিয়ে যায়।

ফলে দূরে পাঠান বা অনেক দিন গুদামজাত করা যায়। এগুলির গুণাগুণ নানানভাবে বিচার করা হয়। যেমন খোসার রং। খোসা মোটা না পাতলা, ভিতরের শাঁশের রং কিরকম, শাঁশের গঠন কিরকম, কত বেশী রস ধারণ করে। শাঁশের আঁশ ভাবটা কি পরিমাণ, মিষ্টত্ব কি পরিমাণ ও কি ধরনের গন্ধ পাওয়া যায়। এছাড়াও আগে বীজ পেতে গেলে মোটামুটি গাছ ভাল হওয়া দরকার। আবহাওয়া গরম ও রৌদ্রজ্বল হওয়া দরকার এবং সম্পূর্ণভাবে পাকলে সেটিকে তোলা হয়।

সংগ্রহের সময়ের উপরে গুদামজাতকরণ বা সংগ্রহের সময়ের উপর তাপ-মাত্রার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন সব্জী, বাজারদর ও ক্রেতার আগ্রহ যেমন বাড়ায়, গুণাগুণ অপরিবর্তিত রেখে গুদামজাতকরণের সময়ও তেমনি বৃদ্ধি করে। বাইরের চেহারা ও খাদ্যগুণ এদুটি বৈশিষ্ট্যই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাহ্যিক আকৃতি বা বাইরের চেহারা বলতে বোঝায় সব্জীর গঠন বৈশিষ্ট্য এবং স্বাদ ও গন্ধ। এগুলি নির্ভর করে সব্জীর সঠিক পক্কতা পরিচর্যা, জলীয় বাষ্প ধারণ এবং কিছুটা জন্মসূত্রের উপর। যদিও সব্জী ঠিকমত পুষ্ট না হলে, স্বাদ ও গন্ধ আসে না, তবুও অনেক সময় 2/4 দিন আগে বা পরে তোলার জন্য তা নষ্ট হয় না। আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি ফুলকপির রং খারাপ করে দেয়। তাই তোলার পর ফুলকপিকে পাতা বা রঙ্গিন ফিল্ময়ের সাহায্যে মুড়ে দিলে ফুলকপির রং সাদা থাকে।

সব্জ র গুণগত মান রক্ষা ও বিক্রির উপযোগী করতে গেলে সব্জীকে অনেক সময় কৃত্রিম উপায়ে পাকানোর দরকার। কৃত্রিম উপায়ে পাকানো সব্জীর গুণগত মান ঠিক রাখার জন্য সেগুলিকে 20° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রাখা হয়। এ সময় রাসায়নিক পরিবর্তন দেখা দেয়। 27° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সব্জীর রং পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু ভিতরের শাঁসের কোন পরিবর্তন ঘটে না। তবে সব্জীর রং খুব লোভনীয় হয়। কিছু কিছু খুচরা বিক্রেতা ও ফোড়েরা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বাজারে চাহিদা দেখে এভাবে সব্জী বাজারজাত করে। কিন্তু টোমাট্যোতে এই পদ্ধতি একেবারেই চলে না। কারণ এর ফলে টোমাট্যোতে ছত্রাক জাতীয় রোগের আক্রমণ বেড়ে যায়, ফলে টোমাট্যো পচতে শুরু করে। এছাড়াও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে সব্জী পাকানো যেতে পারে। সব্জী পাকানোর জন্য যে রাসায়নিক দ্রব্যটি বহুল ব্যবহৃত সেটি অদ্রবণীয় হাইড্রোকার্বন

(C_2H_2)। অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিকই এই অদ্রবণীয় হাইড্রোকার্বনের প্রতিক্রিয়া নিয়ে কাজ করেছেন। টোমাটোর উপর অদ্রবণীয় হাইড্রোকার্বন বা ইথিলিন ব্যবহার সর্বাধিক হয়েছে বলা যেতে পারে। এই গ্যাস খুব অল্প সময়ে টোমাটোতে রং ধরায় ও পাকিয়ে দেয়। খরমুজ পাকানোর জন্য ইথিলিন এক-চেটিয়া ব্যবহার করা হয়। সাধারণত অদ্রবণীয় হাইড্রোকার্বন ও বাতাসের অনুপাত 1 ঃ 1000 না রাখলে সব্জী নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে।

উপরিউক্ত অনুপাতে গ্যাস ও বাতাস রাখলে 2-6 দিনের মধ্যেই সব্জী পেকে যাবে। অনেক সময় আবার গ্যাসের সাথে তাপমাত্রা বাড়িয়ে সব্জী রাখার আধার গুলিতে অল্প গ্যাসে সব্জী পাকানো হয়।

নবম অধ্যায়

সব্জী গুদামজাতকরণ

সব্জীর গুদামজাতকরণের লক্ষ্য হল পণ্য দ্রব্যকে একত্রিকরণ ও সুষ্ঠুভাবে রাখা, যাতে ভবিষ্যতে চাহিদা অনুসারে সরবরাহ করা যায়। বর্তমান বাজারের বিক্রি পদ্ধতি অনুসারে গুদামজাতকরণের খুবই দরকার। এর ফলে উৎপাদনকারী, ক্রেতা এবং ঠিকাদার সবারই খুব সুবিধে হয়। কোন ফসল বেশী উৎপন্ন হলে, তখন উৎপাদনকারীরা অর্থাৎ চাষীরা অল্পদামে ফসল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কারণ একসংগে অনেক সব্জী বাজারে আসায় বাজার দর কমে যায়।

গুদামজাতকরণের পদ্ধতি ঃ

নানান ধরনের ও নানান আকৃতির গুদাম দেখা যায়। বিভিন্নতার কারণ নির্ভর করে গুদামজাত বস্তু ও তার পরিমাণ ; গুদামজাতকরণের সময় অর্থাৎ কতদিন পর্যন্ত রাখা হবে ; এবং জায়গার অবস্থা ও লভ্য সুযোগ সুবিধার উপর। গুদামজাত পদ্ধতি নিয়ে নানান কথা বলা হলেও সঠিকভাবে বলা হয়নি। গুদামজাতকরণের পদ্ধতিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (1) প্রাকৃতিক (2) কৃত্রিম পদ্ধতি। কৃত্রিম পদ্ধতিকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) যান্ত্রিক পদ্ধতি (খ) রাসায়নিক পদ্ধতি ও (গ) সৌর পদ্ধতি।

(1) প্রাকৃতিক পদ্ধতি বলতে বোঝায় ফসল সংগ্রহের সময় সম্প্রসারণ। এতে কোন প্রকার কৃত্রিম ব্যবস্থাপনা থাকে না। অন্যদিকে কৃত্রিম পদ্ধতির সাহায্যে সব্জীগুলিকে উন্মুক্ত প্রকৃতির হাত থেকে বাঁচানো হয়। বিভিন্ন ধরনের ঘর বা আচ্ছাদনের নীচে এগুলি রাখা হয়। ঘরগুলি গুদামও হতে পারে। গুদামের চরিত্র অনুসারে গুদাম ঘরকে চার ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) মাটির উপর গুদামজাতকরণ (খ) মাটির তলায় গুদামজাতকরণ (গ) নালা কেটে অথবা মাঠে গাদা দিয়ে গুদামজাতকরণ (ঘ) সাধারণ ঘরের মধ্যে গুদাম। এছাড়াও বর্তমানে গুদামের নানান উন্নতি সাধন হয়েছে। রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে এবং সূর্য রশ্মির (গামা রশ্মি) সাহায্যে গুদামজাত করা হয়।

(ক) **মাটির উপর গুদামজাতকরণ ঃ** আবহাওয়া ভাল থাকলে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, আলু, খামালু, কচু, মিষ্ট আলু, রসুন, পেঁয়াজ,

ইত্যাদি ফসল তোলার উপযুক্ত হওয়ার পরও কয়েক সপ্তাহ জমিতে রেখে দেওয়া হয়। এইসব সব্জী সাধারণত বর্ষা আসার আগেই তুলে নেওয়া হয়। কেননা বর্ষা আরম্ভ হলে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় না।

এভাবে গুদামজাত সব্জীগুলি চাষীর দরকার মত তোলা হয়। সাধারণ চাষীর পক্ষে এই পদ্ধতি খুবই কার্যকারী। এই পদ্ধতি খুবই সহজ এবং এর জন্য আলাদা টাকা খরচ করতে হয় না। মাঠে নানান অসুবিধার জন্য বেশীদিন এই পদ্ধতিতে গুদামজাত করা যায় না। অনেক সময় রাখার জন্য আবার কখনো কখনো তোলার পক্ষে অনুকুল আবহাওয়া পাওয়া যায় না। যে সব জায়গায় সারা বছরই প্রায় বৃষ্টিপাত হয় সেখানে এই পদ্ধতিতে সব্জী গুদামজাতকরণ সম্ভব নয়। বৃষ্টির জলে কোথাও সব্জী পচে যাওয়ার সম্ভবনা আবার কোথাও রাখা সব্জীর কল গজিয়ে যেতে পারে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য কোন বাধা নিষেধ নেই। চাষী অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনমত এই পদ্ধতিতে সব্জী গুদামজাত করতে পারে।

(খ) **মাটির তলায় গুদাম ঘর :** মাটির থেকে কিছুটা নিচে ঘর তৈরী করে ছাদটা সাধারণত ঢালু রাখতে হয়। ছাদটি ঘাসের চাপড়া ও মাটি দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়। এই ধরনের ঘর পাহাড়ের পাশে মাটির আবরণ দিয়ে তৈরী করা হয়, এবং পাহাড়কে একটি দেওয়াল হিসাবে অনেক সময় ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে তাপ দিয়ে এবং হাওয়া চালিয়ে ঘরটির উষ্ণতা ও শুষ্কতা রক্ষা করা যায়। ঘরের ভিতর ঠাণ্ডা ও মোটামুটি আর্দ্রতা রক্ষারও ব্যবস্থা করা যায়। ঘরে সব সময় ভাল আলো বাতাস খেলে তার ব্যবস্থা করতে হয়। বাড়ীর চৌহদ্দির ভিতর অপেক্ষা বাড়ীর বাইরে ঘর তৈরী করলে ভাল হয়।

পেঁয়াজ, আলু, শালগম, গাজর, বীট, আদা, ওল, কচু, রসুন জাতীয় সব্জী এই ঘরের ভিতর খুব ভালভাবে বেশ কিছুদিন রাখা যায়।

অনেক সময় নাবি ফসল, কিছুদিন এসব ঘরে রেখে আগাম বাজার ধরে চাষী বেশী দাম পেতে পারে। এছাড়া দ্বিবর্ষজীবী সব্জীগুলিও বীজ তৈরীর জন্য এসব ঘরের ভিতর রাখা যেতে পারে, যাতে উপযুক্ত আবহাওয়াতে ফের মাঠে চাষ করা সম্ভব হয়। তবে এসব ঘরে আর্দ্রতা বেশী হলে সব্জী বা সব্জী বীজ যাই রাখা থাকে না কেন, নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(গ) **নালা কেটে বা মাঠে গাদা দিয়ে গুদামজাতকরণ :** এই পদ্ধতিতে সাধারণত বীট, আলু, গাজর, শালগম, বাঁধাকপি, আদা, ওল ইত্যাদি কিছু

দিনের জন্য রেখে দেওয়া যায়। উপরি উল্লিখিত সব্জীর মধ্যে বাঁধাকপি ছাড়া আর সব কটি সব্জী নালা বা গাদা করে অপেক্ষাকৃত বেশী দিন রাখা যায়। রাখার সময় শুকনো ঘাস, খড়, কিংবা গমের খড় দিয়ে তার উপর মাটি চাপা দিতে হয়, যাতে কোন ভাবেই জল প্রবেশ করতে না পারে।

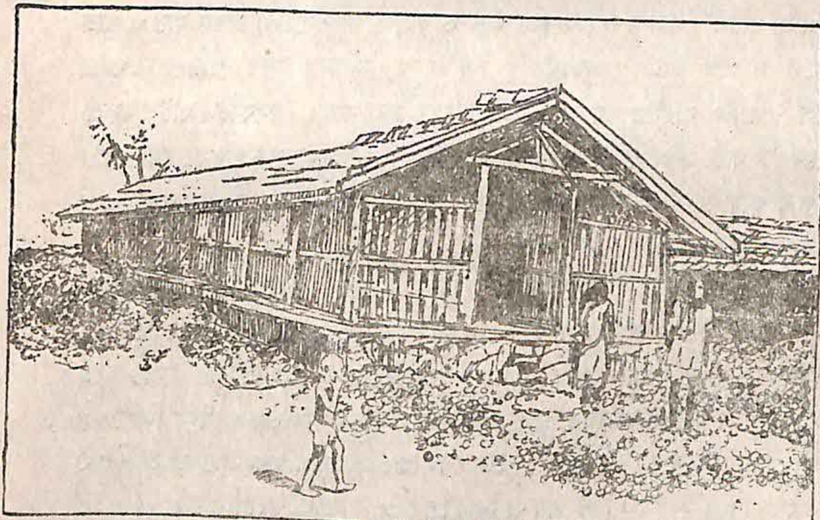
ছোট ছোট দুটি নালা পরস্পরকে ছেদ করবে এমন সমকোণ করে গর্ত খুঁড়তে হবে। এর ফলে বায়ু চলাচল ভাল হয়। নালার উপর কাঠের তক্তা ফেলে ঢেকে দিতে হয়। এরপর 4—5 ইঞ্চি উঁচু করে মাটির সঙ্গে খড়, শুকনো ঘাস মিশিয়ে কাঠের তক্তার উপর চাপা দিতে হয়। চাপা দেওয়ার আগে সব্জী নালার ভিতর রেখে দিতে হয়। একটি বড় নালার থেকে অনেকগুলি নালা থাকলে ভাল হয়। প্রতিটি নালা খোলার সময় একই সংগে সব ফসল বের করে নিতে হবে। নালার নীচ ও ওপর সমপ্রস্থ হবে। সাধারণত উঁচু জমিতে এগুলি করা উচিত। এই গুদামের কাছাকাছি জলবাহী নালা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

নালার গভীরতা 1·5 ফিট এবং চওড়া 3—4 ফিট ও প্রয়োজন মত লম্বা হতে পারে। শাঁটি জাতীয় সব্জী নালার ভিতরে সমস্তটা ছাড়িয়ে রাখতে হয়। নালার ভিতর মাঝে মাঝে 2—2½ ফুট অন্তর ফাঁকা কাঠের বাক্স বসিয়ে রাখলে বায়ু চলাচল বেশী হয় ও নালাটি ঠাণ্ডা থাকে। শীতকালে বাইরের ঠাণ্ডা বাড়লে বাক্সগুলি শুকনো ঘাস বা খড় দিয়ে ভর্ত্তি করে দিলে নালার ভিতরটা গরম হয়। অনেক সব্জী আছে যাদের দু'বছরে ফুল আসে। এগুলো, প্রয়োজন হলে, মাঠ থেকে তুলে এনে সরাসরি নালার ভিতর মাটিতে বসিয়ে দেওয়া হয়। প্রয়োজন মত জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। পরের বছর আবার প্রয়োজনীয় ঋতু এলে এগুলো নালা থেকে বাইরে এনে মাঠে লাগানো হয়। এসব সব্জীর বীজ করতে হলে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচাবার এটিই প্রকৃষ্ট উপায়। তবে গাছগুলিকে সব সময়ই মাটি সমেত তুলতে হবে ও নালার ভিতর ঝুরঝুরে মাটির মধ্যে লাগাতে হবে। নালার ভিতরের পরিবেশ কৃত্রিম উপায়ে কিছুটা প্রভাবিত করা যায়। নালা গভীর করে কাটার সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। নালার উপরে কাঠের চওড়া তক্তা দিয়ে তার উপর কাদা ও খড় দিয়ে প্রলেপ দিতে হবে। নালা সেই সব মাটিতে করতে হয় যেখানে ভাল সব্জী হয় এবং জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত আছে।

(ঘ) **সাধারণ ঘরের মধ্যে গুদামজাতকরণ :** মাটির উপরে যে গুদামঘর

তৈরী করা হয় সেগুলির গঠন শৈলী সাধারণত বসত বাড়ীর মত। এ ধরনের ঘর বিশেষভাবে গ্রাম-গঞ্জে চাষীরা ব্যবহার করে থাকেন। অনেক সময় একই রকম ঘর উভয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এইসব ঘরে আর্দ্রতা বা উষ্ণতা রক্ষার কোন ব্যবস্থা থাকে না। ঘর তৈরীর আগে লক্ষ্য রাখা দরকার কি রকম জায়গাতে ঘরটি তৈরী হচ্ছে এবং কি ধরনের সব্জী সেখানে রাখা হবে। ঠাণ্ডা জায়গায় উষ্ণতা রক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। কিন্তু গরম জায়গা হলে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

এ ধরনের গুদাম ঘরের কতকগুলি সুবিধা আছে, যেমন এগুলি তৈরির খরচ অপেক্ষাকৃত কম। এগুলি প্রয়োজনে বাসগৃহ বা গুদামঘর হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ঘরের মধ্যেই সব্জীর শ্রেণী বিন্যাস, ঝাড়াই, বাছাই ইত্যাদি সম্ভব। গুদামজাত সব্জী সহজেই নাড়াচাড়া বা পরিচর্যা করা যায় এবং প্রয়োজনে এ ঘরগুলি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত করাও সম্ভব। তবে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত না হলে এ ধরনের গুদামঘরে শাক জাতীয় সব্জী রাখলে নষ্ট হবার ভয় থাকে।



চিত্র 3 : সাধারণ গুদামঘর

(ঙ) **হিমঘর :** পেঁয়াজ, আলু, মিষ্টি আলু এবং অন্যান্য প্রায় সব রকম সব্জীই হিমঘরে রাখা হয়। চাষীর কাছে হিমঘরের ব্যবহার দিনের পর দিন জনপ্রিয় হচ্ছে। হিমঘরে গুদামজাতকরণের ফলে সব্জী ব্যবসার নানা

রাস্তা খুলে গেছে। বিগত কয়েক দশকে পশ্চিমবঙ্গের সমতলে সব্জী চাষের পরিধি অনেক বেড়ে গেছে। এলাকা ও ফলন বাড়ার জন্য মোট উৎপাদনও অনেক বেড়েছে। সম্ভবতই হিমঘরের অনেক প্রসার হয়েছে। আর হিমঘর থাকার জন্য চাষী, ব্যবসায়ী ও ফড়ে সবাই যথেষ্ট উপকৃত হচ্ছেন।

হিমঘরের তাপমাত্রা ও আদ্র'তা কৃত্রিম উপায়ে রক্ষা করা হয়। হিমঘরের বাড়ীও সেই ভাবে তৈরী করতে হয়। হিমঘরে, কৃত্রিম উপায়ে সব্জীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার মাত্রা কমিয়ে আনা হয়। এটা প্রথমে অল্প তাপমাত্রার সাহায্যে করা হয়। পরে হিমঘরের বাতাসে কম অম্লজান ও বেশী পরিমাণ অঙ্গার অম্লজান রাখলে সব্জীর শ্বাস প্রশ্বাসের পরিমাণ আরো কমে যায়। কাজেই ঠাণ্ডা অবস্থা ছাড়াও বাতাসের গুণগত পরিবর্তন করলে সব্জী আরও বেশী দিন হিমঘরে রাখা যায়।

এ ছাড়া, অল্প তাপমাত্রায়, সব্জীর অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন আস্তে আস্তে ঘটে। তাই হিমঘরের লক্ষ্য সর্বদা তাপমাত্রা কম রাখা, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বরফ জমে না যায়। ফল সব্জী পাকতে আরম্ভ করলে কোষগুলি ভেঙে যায় ও পরে পচতে আরম্ভ করে। অভ্যন্তরীণ শর্করা ও অন্যান্য বস্তুর পরিবর্তন ঘটার ফলে এগুলি বহিস্তর থেকে ভিতরের স্তরে চলে যায়। পেকটিন ঘটিত বস্তুর পরিবর্তন ঘটে, ফলে সামগ্রিক শর্করা কমে যায়। নাইট্রোজেন প্রথমত বেড়ে যায় ও পরে কমে যায়। সঙ্কুচিত জায়গায় বাদামী ধরনের দাগ দেখা যায়। এবং ঐ দাগগুলি পরে গর্তে পরিণত হয়।

অবশ্য এ রকম দাগ, বরফ জমলে বা অন্য কারণেও হতে পারে। তবে বরফ জমার ফলে, ফলের বহিত্ব'কের ঠিক নিচের কোষ ভেঙ্গে যায়। এবং ছোট ছোট সিক্ত বিন্দু দেখা যায়। যদি হিমঘরের তাপমাত্রা 0° সেঃ গ্রেঃ-এর নিচে নেমে যায় তবেই এ ধরনের জলসিক্ত বিন্দুর আবির্ভাব ঘটে। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা গেছে, হিমঘরের উষ্ণতা 6°—10° সেঃ গ্রেঃ ও আপেক্ষিক আদ্র'তা 87—90 শতাংশ রাখলে 7—10 দিন পর্যন্ত নির্বিঘ্নে বেগুন রেখে দেওয়া যায়।

ফুলকপি ও বাঁধাকপি রাখতে হলে তাপমাত্রা 0° সেঃ গ্রেঃ ও আদ্র'তা 90—95 শতাংশ হওয়া দরকার। এ অবস্থায় 3—4 মাস কপি ভালভাবে রাখা যায়। অবশ্য হিমঘরে রাখার আগে ফুলকপি বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করলে ভাল হয়।

পেঁয়াজ গুদামজাত করার জন্যও 0° সেঃ গ্রেঃ তাপমাত্রা ও সমপরিমাণে আদ্র'তা দরকার। কিন্তু দেখতে হবে যাতে জলীয় বাষ্প জমে না যায়।

অবশ্য সাধারণভাবে তাপমাত্রা বা আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকেই পেঁয়াজ ভালভাবে 60—120 দিন অব্দি রাখা যায়।

ডাঁসা সবুজ টোমাট্যো $10^\circ-14^\circ$ সেঃ গ্রেঃ তাপমাত্রায় 2—3 সপ্তাহ সুন্দরভাবে গুদামজাত করা যায়। কিন্তু হিমঘরের তাপমাত্রা 10° সেঃ গ্রেঃ এর নিচে নেমে গেলে অভ্যন্তরীণ গঠনের ব্যাঘাত ঘটায় ফল পচে যায়।

(2) **রাসায়নিক প্রয়োগে গুদামজাতকরণ :** রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করেও সব্জী গুদামজাত করা হয়। রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন হরমোন বা জৈব রাসায়নিক পদার্থ। এগুলি ব্যবহারের একমাত্র লক্ষ্য গুদামের ভিতর সব্জীর শ্বাস-প্রশ্বাস কমিয়ে দেওয়া ও অংকুরিত হওয়া বন্ধ করা। হরমোন প্রয়োগে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কিছু কিছু হরমোন সব্জী তোলার আগে আবার কিছু সব্জী তোলার পরে ব্যবহার করা হয়। তোলার আগে ফুলকপিকে ন্যাপথলিন এ্যাসিটিক এ্যাসিড স্প্রে করে নেওয়া হলে অনেক দিন গুদামজাত করা যায়। ফুলকপি তোলার আগে ন্যাপথলিন এ্যাসিটিক এ্যাসিড জলীয় দ্রবণে 5% হারে গুলে পাতায় ছড়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়। ম্যালিক হাইড্রাজাইড 2% জলীয় দ্রবণ ফসল তোলার আগে পেঁয়াজে ছড়ালেও অংকুরোদ্গম বন্ধ হয়। আলু বেশী দিন গুদামজাতকরণের জন্য 3·5% ন্যাপথলিন এ্যাসিটিক এ্যাসিড বা 2, 4, 5 TP—ট্রাইক্লোরো ফেনক্সি এ্যাসিটিক এ্যাসিড অথবা 1% ম্যালিক হাইড্রাজাইড জলীয় দ্রবণে তোলার 4—5 সপ্তাহ আগে আলু গাছে ছড়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়া অংকুরোদ্গমের ভয় থাকে না।

পচন প্রতিরোধক্ষম ঔষধ যেমন সোডিয়াম অর্থ ফিনাইল ফিনেট, বোরাক্স, ক্লোরিণ, সালফার ডাই-অক্সাইড ব্যবহারের ফলে সব্জী বেশী দিন গুদামে রাখা যায়। তুঁতে বা গরম জল ব্যবহার করলেও অনেকদিন গুদামজাত করা যায়। সংরক্ষিত সব্জী বেশী দিন ব্যবহার্য রাখার জন্য নানা ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। তাদের মধ্যে লবণ জল, চিনির দ্রবণ, অম্ল দ্রবণ, পটাসিয়াম মেটা-বাই-সালফাইড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। রাসায়নিকগুলির সাহায্যে সংরক্ষণের পদ্ধতি, ইত্যাদি আলোচ্য সূচীর অন্তর্গত না হওয়ায় এখানে আলোচনা করা গেল না।

(3) **রশ্মির সাহায্যে গুদামজাতকরণ :** উজ্জ্বল গামা রশ্মির দ্বারা আলু ও পেঁয়াজের অংকুরোদ্গম কমান যায় বা বন্ধ করা যায়। গামা রশ্মি 10,000 র‍্যাড আলুর অংকুরোদ্গমে বাধা দেয় এবং 4,000 র‍্যাড পেঁয়াজের অংকুরোদ্গমে বাধা

দেয়। এই রশ্মি 1,50,000 – 2,50,000 র‍্যাড মাত্রায় আলু ও পেঁয়াজের পচন বন্ধ করে। সব্জীকে কৃত্রিম আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখলে অস্থায়ী ভাবে বেশ কিছুদিন তাজা অবস্থায় সংরক্ষণ ও বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায়। আবরণ বিভিন্ন রকমের হয়—যেমন মোম, তেল ও পলিথিনের সাথে ছত্রাক ঘটিত ঔষধ মিশিয়ে কিংবা কিছু না মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়। মোম আবরণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃস্বরণ এবং জলীয় বাষ্প বিমোচন কমে যায়। সব্জীর মধ্যে শশা, লংকা, মিষ্টি আলু, টোমাট্যো, তরমুজ ইত্যাদি মোম দ্বারা আবরণ দেওয়া যেতে পারে।

পলিথিন অথবা পলিভিনাইল ক্লোরাইড-এর আস্তরণও সব্জীর জীবনী শক্তি বাড়ানোর জন্য সাহায্য করে। যখন সব্জীকে এই আস্তরণ দিয়ে আবৃত করা হয় তখন সব্জীর শ্বাস প্রশ্বাসের কোন অসুবিধা হয় না।

গুদামজাতকরণের শর্ত :

সফল ও সুন্দর ভাবে গুদামজাত করতে হলে কয়েকটি বিশেষ দিকে লক্ষ্য দিতে হবে যেমন—(ক) সঠিক সময়ে ফসল তোলা (খ) গুদামে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ (গ) গুদামের তাপমাত্রা (ঘ) গুদামের আবহাওয়া ও (ঙ) গুদামের বায়ু চলাচল ব্যবস্থা।

(ক) **সঠিক সময়ে ফসল তোলা :** গুদামজাতকরণের জন্য সঠিক সময়ে ফসল তোলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একথা আগেই বলা হয়েছে। অপুষ্ট বা অধিক পুষ্ট সব্জী বেশী দিন গুদামজাত করা যায় না বা গুদামজাত করলেও অপুষ্ট সব্জী (বিশেষত ফল সব্জী) গুদামজাতকরণের পর পাকতে চায়না আর বেশী পাকা ফল ফেটে বা পচে যায়। এছাড়া এগুলি দূরে পাঠাবার উপযোগী থাকে না। মৃত্তিকার গুণগত তারতম্য, সেচ ও সার প্রয়োগের পরিমাণও গুদাম-জাতকরণের কালকে প্রভাবিত করে। রোগ গ্রস্থ বা অব্যবহার্য সব্জী গুদামজাত করলে ভাল সব্জী নষ্ট হবার ভয় থাকে।

ফসল তোলার নির্দিষ্ট সময়ও একই রকমভাবে সব্জীর গুদামজাত কালকে প্রভাবিত করে। সাধারণত প্রখর রোদে জমি থেকে সব্জী তোলা উচিত নয়। হয় সকাল বা বিকেলের দিকে সব্জী তোলা গুদামজাতকরণের পক্ষে প্রশস্ত। বাইরের আবহাওয়া গরম থাকলে, সব্জী তুলে, ছায়ায় ঠাণ্ডা করে গুদামজাত করা বাঞ্ছনীয়।

(খ) **গুদামের তাপমাত্রা :** নিজস্ব অবস্থান থেকে অন্য জায়গায় আনলে সব্জীর অভ্যন্তরে কিছু পরিবর্তন হয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সব্জীকে নিয়ে

ঠাণ্ডা জায়গায় বাছাই করা দরকার। সাধারণত শীতকালীন সব্জীর যে পরিমাণ তাপমাত্রা দরকার গরমকালীন সব্জীর তার থেকে তফাৎ দেখা যায়। শীতকালীন সব্জীর 0° সেঃ গ্রেঃ তাপমাত্রায় ভাল থাকে। আলুই একমাত্র ব্যতিক্রম। আলু 5° সেঃ গ্রেঃ তাপমাত্রার নিচে গুদামজাত করলে শর্করা জাতীয় দ্রব্য জমে যায়, ঢেলা পাকিয়ে যায় ও গুণগতমান নষ্ট হয়। বেশীর ভাগ গরমকালীন সব্জীকে ভাল ভাবে গুদামজাত করা যায় 10° সেঃ গ্রেঃ-এর উর্ধ্বে। তার নীচে রাখলে বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় পরিবর্তন দেখা যায়। কিছু কিছু সব্জীর গুদামজাতকরণের জন্য কি পরিমাণ তাপমাত্রা দরকার এবং কত দিন গুদামজাত করা যায় নিচের পরিসংখ্যানটি থেকে জানা যাবে।

পরিসংখ্যান—৭ঃ

গুদামে সব্জী সংরক্ষণের তাপমাত্রা ও সময়

সব্জী	অনুমোদিত তাপমাত্রা (সেঃ গ্রেঃ)	কত মাস গুদামজাত করা যায়
শতমূলী	0·0	1/3
বীন (ফরাস)	7·5	1/3
বীট	0·0	5—6
বাঁধাকপি	3·0	5—6
ফুলকপি	0·0	1
গাজর	0·0	5—6
রসুন	0·0	6—12
লেটুস	3·0	1/3
পেঁয়াজ	0·0	6—11
আলু	5·0	5—6
টোম্যাটো (ডাঁসা-সবুজ	16·0	1/2
টোম্যাটো (পাকা)	9·0	1/3
শীতকালীন শাকসব্জী	0·0	1/4
গ্রীষ্মকালীন শাকসব্জী	4·0	1/5

উপরিলিখিত পরিসংখ্যান আবার সব্জীর জাত, তোলার সময়, বৃদ্ধির অবস্থা এবং অন্যান্য কারণের উপর নির্ভরশীল। পেঁয়াজ হঠাৎ তাপমাত্রার পরিবর্তনে সহ্য করতে পারে না। পেঁয়াজ তোলার সময় (চৈত্র বৈশাখ মাস) হঠাৎ বৃষ্টি হয়ে প্রাকৃতিক তাপমাত্রা কমে গেলে জমিতেই পেঁয়াজ পচতে আরম্ভ হয়।

(গ) **গুদামের আর্দ্রতা ঃ** গুদামের ভিতর জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অবশ্যই গুদামজাতকরণের জন্য একটি দরকারী সর্ত। গুদামের ভিতর প্রয়োজনীয় জলীয় বাষ্প থাকলে সংরক্ষিত সব্জীর বহিরঙ্গ কুঁচকে যায় না। এছাড়া অল্প বাষ্প মোচনের ফলে ওজনও বিশেষ কমে না। বিভিন্ন ধরনের সব্জীর আর্দ্রতার প্রয়োজন বিভিন্ন। কোন কোন ক্ষেত্রে অল্প আর্দ্রতা দরকার। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণ। লাউ, চাল কুমড়ো, ঝিঙে, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি সব চাইতে ভাল রাখা যায় শুষ্ক আবহাওয়ায়। শীতকালীন সব্জী সাধারণত 90—95 শতাংশ আর্দ্রতায় রাখা হয়। আবার গরম সময়ের সব্জী গুদামজাত করার জন্য 80—90 শতাংশ আর্দ্রতা দরকার।

যে ভাবেই হোক আর্দ্রতার সাথে তাপমাত্রার যোগাযোগ স্থাপন দরকার। অধিক আর্দ্রতা সব্জীর পচন, অংকুরোদ্গম, মূলের বৃদ্ধি, ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করে।

(ঘ) **গুদামের আবহাওয়া ঃ** গুদামের আবহাওয়া বলতে বোঝায় বাতাসের গুণগত মান। গুদামের ভিতরের বাতাসের একটা বিরাট ভূমিকা আছে যেটা সব্জীর শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করে। গুদামের ভিতর অধিক অক্সিজেন থাকলে সব্জীর শ্বাস প্রশ্বাস বাড়ায়। বেশী কার্বন-ডাই অক্সাইড অথবা নাইট্রোজেন থাকলে বিপরীত ক্রিয়া দেখা যায়। কিন্তু অধিক কার্বন ডাই-অক্সাইড অথবা নাইট্রোজেন কোনটাই উপকারে আসে না, যদি না কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের অনুপাত ঠিক থাকে। অধিক কার্বন ডাই-অক্সাইড অথবা নাইট্রোজেন থাকার ফলে নানান ধরনের গোলযোগ দেখা দেয়।

অধিক মাত্রায় কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন শ্বাস প্রশ্বাস কমিয়ে দেয় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগের আক্রমণ থেকে বাঁচায়। কিন্তু মোটামুটিভাবে ঐগুলি তাজা ও ভবিষ্যতে ব্যবহার্য রাখার জন্য বাতাসে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় অক্সিজেনের প্রয়োজন। তা না থাকলে এগুলি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায়। সাধারণত কার্বন ডাই-অক্সাইড 5—10 শতাংশের বেশী হওয়া উচিত নয়। এবং অক্সিজেনও 4—10 শতাংশের কম হওয়া উচিত নয়।

(ঙ) **গুদামের বায়ু চলাচল ঃ** আর্দ্রতা, তাপমাত্রা এবং আবহাওয়া সকলই নিয়ন্ত্রণ হয় গুদামের বাতাস চলাচলের ব্যবস্থায়। বায়ু চলাচলের দ্বারা বাহিরের আর্দ্র বাতাস গুদামের ভিতর ঢোকে। শুষ্ক বাতাসের সংগে জলীয় বাতাস একত্রে গুদামের ভিতরের বাতাসে আর্দ্রতার সৃষ্টি করে ও আর্দ্রতা বাড়িয়ে দেয়।

বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস ঢোকার ফলে ভিতরের গরম বাতাসকে কিছুটা ঠাণ্ডা করে ও ভিতরের তাপমাত্রা কমে যায়। এভাবেই বায়ু চলাচল ব্যবস্থার বিরাট একটা ভূমিকা আছে। এছাড়া ঘুলঘুলি দিয়ে ভিতরের নানা রকমের অবাঞ্ছিত গ্যাস বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা থাকলে সব্জী বেশী দিন গুদামজাত করা যায়।

বিভিন্ন সব্জীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকম বায়ু চলাচল ব্যবস্থা দরকার হয়। কারণ বিভিন্ন সব্জীর শ্বাস প্রশ্বাস ও জলীয় বাষ্প নিষ্কাশন একই ধরনের নয়। যেমন পাতা জাতীয় সব্জীর শ্বাস প্রশ্বাস ও জলীয় বাষ্প নিঃসরণ দ্রুত হয়। শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার ফলে দেখা যায় যে, গরম বাতাসের সৃষ্টি হয়। তা সাধারণত গুদামের মাঝেই জমা হয়। সেই গরম বাতাসকে পাখার সাহায্যে সমান ভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া একান্ত দরকার। তা না হলে সব্জীর কোষগুলি ভেঙ্গে যায়, নিস্তেজ হয়ে যায় ও তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

প্রকৃত বায়ু চলাচল ব্যবস্থা ঠিক ঠিক নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে প্রাথমিক ভাবে গুদামের ভিতরে পাখার ব্যবস্থা করতে হবে। সম্ভব হলে দেওয়ালের গায়ে নিক্রমণী পাখার ব্যবস্থা করা দরকার। এটি ভিতরের গরম বাতাস বের করে দেয় কিন্তু ঠাণ্ডা করার পদ্ধতির উপর এর কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া নেই।

দশম অধ্যায়

মরসুমী সব্জীর চাষ

সাধারণত ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশে যে সব বর্ষজীবী সব্জী বহুল পরিমাণে চাষ হতে দেখা যায় সেগুলিকেই মরসুমী সব্জী হিসাবে আলোচনা করা হবে। এগুলির মধ্যে যে সব সব্জীর চাষ পদ্ধতি অনেকটা একই ধরনের সেগুলিকে একই অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুবিধার এভাবে প্রচলিত সব্জীগুলোকে, কপি জাতীয় সব্জী, শুটি জাতীয় সব্জী, ফল জাতীয় সব্জী, কন্দ জাতীয় সব্জী, মূল জাতীয় সব্জী, শাক জাতীয় সব্জী, বাল্ব জাতীয় সব্জী ও লতানো সব্জী ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হল। এই ভাগগুলির মধ্যে বহুবর্ষজীবী সব্জী অন্তর্গত করা হয় নি ; কারণ এগুলি মরসুমী সব্জীর মধ্যে পড়ে না।

কপি জাতীয় সব্জী :

এই ভাগের মধ্যে, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, চীনেকপি, ব্রুকোলী, ব্রুসেলস স্প্রাউট ইত্যাদি অনেক সব্জী অন্তর্ভুক্ত হলেও, সাধারণত প্রথমোক্ত, তিনটি সব্জীই পূর্ব ভারতের সমতলে চাষ হতে দেখা যায়। কাজেই এই তিনটি সব্জীই আলোচনা করা হবে।

বাঁধাকপি :

বিভিন্ন ধরনের কপির মধ্যে বাঁধাকপির চাষ সব থেকে বেশী। বাঁধাকপির ফলনও বেশী। মূলত বাঁধাকপির পাতা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

জাত প্রকরণ : প্রচলিত বাঁধাকপির প্রকরণগুলিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হলেও চার ধরনের বাঁধাকপি পূর্বাঞ্চলে চাষ হতে দেখা যায়। প্রতিটি ধরনের মধ্যে বিভিন্ন জাত প্রকরণ সন্নিবেশিত।

গোল : গোল্ডেন একর, প্রাইড অফ্ ইণ্ডিয়া ইত্যাদি।

চ্যাপ্টা : নাবি ড্রাম হেড, জলদি ড্রাম হেড, পুষা ড্রাম হেড, সিলেকশন্—৪ ইত্যাদি।

ছুঁচলো : এক্সপ্রেস, ইত্যাদি।

স্যাভয় : চেপটেইন, ইত্যাদি।

লাল : ম্যামথ রক, ইত্যাদি।

এগুলির মধ্যে লাল বাঁধাকপি সালাদের জন্য ব্যবহৃত হয় ও মাঝে মধ্যে

চাষ হলেও, স্যাভয় বাঁধাকপির চাষ দেখাই যায় না। অবশ্য স্যাভয় বাঁধাকপির চাষের জন্য যে আবহাওয়া দরকার পূর্বাঞ্চলের সমভূমিতে তা অনুপস্থিত। এগুলির মধ্যে এক্সপ্রেস জলদি জাত। ড্রামহেড ও স্যাভয় নাবি জাত এবং বাকী সবই মাঝারি জাতের বলা যায়।

জল হাওয়া ও মাটিঃ ঠাণ্ডা ও আর্দ্র আবহাওয়া বাঁধাকপি চাষের উপযোগী। উত্তরবঙ্গ, মেঘালয়, অরুণাচল, ত্রিপুরার কিছু অংশ, আসাম ও মণিপুরের উত্তরাঞ্চল এবং বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলে বছরে দুবার বাঁধাকপির চাষ করা যেতে পারে। সাধারণতঃ 10—15° সেঃ গ্রেঃ তাপমাত্রা বাঁধাকপি চাষের উপযুক্ত হলেও 5—20° সেঃ গ্রেঃ তাপমাত্রায় বাঁধাকপির চাষ হতে পারে।

উর্ব্বর বেলে দোয়াঁশ মাটি বাঁধাকপি চাষের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তবে সব রকম মাটিতেই বাঁধাকপির চাষ দেখা যায়। মাটির অম্লত্ব বাঁধাকপির চাষ কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করে। সাধারণত 5·5—6·5 পি, এইচ যুক্ত মাটিই বাঁধাকপির চাষের জন্য নির্বাচন করা উচিত।

বীজ ও চারা রোপণঃ জলদি জাতের জন্য আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে 500 গ্রাম বীজ ও নাবি জাতের জন্য 350 গ্রাম বীজ অক্টোবর নভেম্বর মাসে বীজ তলায় বপন করা উচিত। পাহাড়ী এলাকায় মার্চ থেকে আগষ্ট মাসের মধ্যে বীজ বপন করা হয়।

জমিতে জলদি জাতের চারা 50 × 75 সেঃ মিঃ দূরত্বে ও নাবি জাতের চারা 60 × 90 সেঃ মিঃ দূরত্বে বপন করা হয়। চারা শক্ত করার জন্য, সেগুলি অনেক সময় মাধ্যমিক বীজ তলায় রোপণ করে কিছু দিন বাদে মূল জমিতে লাগানো হয়। বিকেলের দিকে চারা রোপণ করা ভাল। চারা লাগানোর পরই যথেষ্ট সেচ দেওয়া দরকার।



চিত্র 4ঃ সংগ্রহের উপযোগী বাঁধাকপি

জমি তৈরী ও সার প্রয়োগঃ বার বার চাষ দিয়ে জমি তৈরী করা উচিত। ঘাস ও আগাছা বেছে হেক্টর প্রতি 20—25টন জৈবসার 75 কেজি পটাশ সালফেট 270 কেজি সুপার ফসফেট ও 130 কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করে

শেষ চাষ ও মই দেওয়া দরকার। চার সপ্তাহ বাদে চারা লেগে গেলে আরও 130 কেজি ইউরিয়া চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। প্রয়োজনমত অনুখাদ্য দেওয়া উচিত।

মাধ্যমিক পরিচর্যা ও সেচ্ঃ বাঁধাকপির জমি পরিষ্কার রাখা দরকার। পরিষ্কার রাখা ব্যায়-বহুল হলে, সাথী ফসল হিসাবে ওলকপি চাষ করা যায়। যাইহোক, কপি বড় হতে আরম্ভ করলে গোড়ার মাটি তুলে দেওয়া হয়।

প্রথম অবস্থায় সপ্তাহে দুটো সেচ্ দরকার হলে চারা লেগে যাওয়ার পর 10—15 দিন অন্তর সেচ্ দিলে চলে। বাঁধা শক্ত হতে আরম্ভ করলে সেচ্ দেওয়া চলবে না। সেচ্ দিলে ফেটে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে।

শস্য সংগ্রহ ও ফলনঃ বাঁধাগুলো শক্ত হলেই এগুলি তুলে নিতে হয়। এ সময় মাটিতে রস থাকবে কিন্তু মাটি ভিজে হবে না। এ সময় বাঁধাগুলো টোকা মারলে ফাঁপা আওয়াজ হবে না।

জলদি জাতগুলোর হেক্টর প্রতি গড় ফলন 30—35 টন এবং এবং মাঝারি ও নাবি জাতগুলোর হেক্টর প্রতি গড় ফলন 40—45 টন হতে দেখা যায়।

ফুলকপিঃ

জাত প্রকরণঃ জলদি জাত—কুঁয়াচী, জলদি পাটনা, পুষা কার্ত্তিক, পুষা দিপালী, পুষা সিনথেটিক ইত্যাদি।

মাঝারি জাত—আশ্বিনী, পৌষী, পাটনা ইত্যাদি।

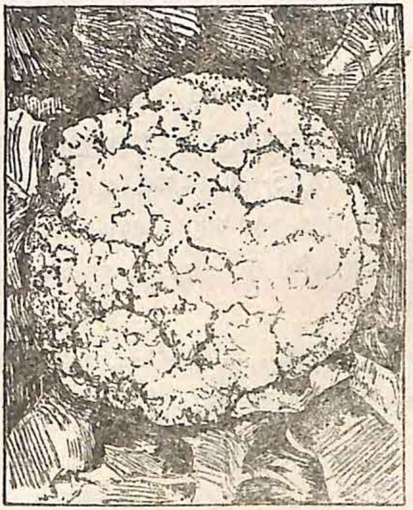
নাবি জাত—দানিয়া, জলদি স্নোবল, স্নোবল ডি-16, স্নেবোল-1, স্নোবল-2, ইত্যাদি।

(ক) **আবহাওয়া ও মাটিঃ** জলদি জাতগুলো 25° সেঃ গ্রেঃ উষ্ণতা ও দীর্ঘ দিনেও হতে দেখা যায়। মাঝারি ও নাবি জাতগুলো বেশী ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে। 15—20° সেঃ গ্রেঃ উষ্ণতায় ভাল হয়। তাপমাত্রা 8 সেঃ গ্রেঃ নেমে গেলেও চাষের অসুবিধা হয় না। হালকা গভীর ও ঈষৎ অম্ল মাটিতে ফুলকপি হতে পারে। কিন্তু অম্লত্ব বেশী হলে মালিবডেনামের অভাবজনিত রোগে চাবুকের ডগার মত পাতা দেখা যায়। ক্ষারত্ব বেশী হলেও সোহাগার অভাব জনিত রোগে ফুল হলদে হওয়া বা কাণ্ড ফাঁপা রোগ দেখা যায়। মাটির পি, এইচ 5·5—6·5 হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাধারণ ভাবে হালকা বেলে দোয়াঁশ মাটি ফুলকপি চাষে প্রকৃষ্ট হলেও সব ধরনের মাটিতেই ফুলকপি চাষ হতে দেখা যায়।

বীজ বপন ও চারা রোপণ ঃ জলদি জাতের বীজ মে থেকে জুন মাসের মধ্যে বীজতলায় ফেলা হয়। 600—700 গ্রাম বীজের চারায় এক হেক্টর জমি রোপন করা যায়। বীজ বপনের ছয় সপ্তাহ পরে চারা লাগানো হয়। জলদি জাতের চারা 40—45 সেঃ মিঃ দূরে লাগানো হয়। সারির দূরত্বও একই থাকে। মাঝারি ও নাবি জাতগুলোর বীজ জুলাই থেকে নভেম্বর-এর মধ্যে ফেলা হয়। এক হেক্টর জমির জন্য 400—500 গ্রাম বীজের প্রয়োজন। গাছ ও সারির দূরত্ব যথাক্রমে 45 ও 60 সেঃ মিঃ রাখা হয়।

ক্ষেত তৈরী ও সার প্রয়োগ ঃ বার বার চাষ দিয়ে জমি তৈরী করা হয়। হেক্টর প্রতি 15—20 টন জৈব সার, 100 কেজি ইউরিয়া, 400 কেজি সুপার ফসফেট ও 40 কেজি মিউরিয়েট অফ পটাস প্রয়োগ অনুমোদন করা হয়। এছাড়া চারা বসানোর ছয় সপ্তাহ পরে 120 কেজি ইউরিয়া চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। প্রয়োজন মত 1—2 কেজি সোহাগা দিলে অভাবজনিত রোগ দেখা যায় না। মলিবডেনাম অভাব পূরণ করতে হেক্টর প্রতি 1000—1500 গ্রাম সোডিয়াম মলিবডেথ দেওয়ার নিয়ম।

মাধ্যমিক পরিচর্যা ঃ চারা লাগানোর পর প্রয়োজন মত সপ্তাহে দুটি



চিত্র 5 ঃ তোলার উপযোগী ফুলকপি

সেচ দেওয়া হয়। পরের দিকে 7—10 দিন অন্তর সেচ দিলে চলে। সার প্রয়োগের পরও সেচ দেওয়ার নিয়ম। আগাছা দমন করে জমি পরিষ্কার রাখতে

হবে। তবে খুব গভীরে নিড়ানী চালিয়ে গোড়া আলগা করা চলবে না। দরকার মত গোড়ায় আল তুলে দেওয়া হয়। ফুলের রং সাদা করতে হলে ফুল আসার পর এটিকে পাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

শস্য সংগ্রহ ও ফলন ঃ ফুলের রং পরিবর্তন হওয়ার আগেই এগুলো তুলে ফেলা দরকার। ফুলকপি তোলা হয়ে গেলে ফুলটিকে পাতা দিয়ে ঢেকে রাখলে ফুলের রং সাদা থাকে ও সতেজ দেখায়। সাধারণত রোদের তেজ কম থাকার সময় জমি থেকে ফুল সংগ্রহ করা উচিত।

জলদি ফুলকপি হেক্টর প্রতি ফলন 20—30 টন বা 62,500টি ফুল (40 × 40 সেঃ মিঃ দূরত্বে)। মাঝারি ও নাবি ফুলকপির ফলন প্রায় 30 টন বা প্রতি হেক্টর প্রায় 30,000 ফুল।

ওলকপি ও চীনেকপি ঃ

ওলকপির দুটো জাত চাষ হয়--সবুজ ভিয়েনা ও লাল ভিয়েনা। পরের জাতটি একটু নাবি।

এক হেক্টর জমি ওলকপি লাগাতে 1—1·5 কেজি বীজ আগষ্ট—সেপ্টেম্বর মাসে বীজতলায় ফেলতে হয়। ওল কপি চাষ করতে বাঁধাকপির মত মাটি ও আবহাওয়া প্রয়োজন হয়। জমি তৈরী করার সময় বাঁধাকপির মতই সার দিতে হয়। চাপান হিসাবে, হেক্টর পিছু 100 কেজি ইউরিয়া দেওয়া হয়।

ওলগুলোর ব্যাস 5—7 সেঃ মিঃ হয়ে গেলেই তুলে নেওয়া হয়। দেরী হলে শক্ত হয়ে যায়। হেক্টর প্রতি 25—30 টন ফলন পাওয়া যায়।

চীনে কপির দুটি জাত দেখা যায়। একটির বাঁধা হয় অন্যটির বাঁধা হয় না। প্রকৃতপক্ষে চীনে কপি বাঁধা হয়। পাকচৈ বলে যে অন্য জাতটি আছে তার মাথা বাঁধে না।

চীনে কপি চাষে আবহাওয়া, মাটি, বীজের পরিমাপ, সার, গাছ ও সারির দূরত্ব, সেচ ও মাধ্যমিক পরিচর্যা সবই বাঁধাকপির মত প্রয়োজন হয়। ফলনও বাঁধাকপির মত।

একাদশ অধ্যায়

শুঁটিজাতীয় সব্জী

শঁুটিজাতীয় সব্জীগুলি প্রায় সবই লতানে। এগুলির মূলে অর্বুদ থাকায়, শঁুটিগুলি আমিষ জাতীয় খাদ্যাংশে সমৃদ্ধ হওয়া ছাড়াও জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। শঁুটি জাতীয় সব্জীর মধ্যে মটরশঁুটি, ফরাসবীন, বরবটী, সীম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মাখন সীম, লিমা বীন, থোকা সীম ও সয়াবীন শঁুটি জাতীয় সব্জীর মধ্যে পড়ে। এই সব্জীগুলির বীজ উৎপাদন, আগাছা দমন, শস্য রক্ষা ও গুদামজাতকরণ পদ্ধতি আগেই বলা হয়েছে।

মটর শঁুটি ঃ মটরশঁুটি লাগানো থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত 60-120 দিন সময় লাগে। কিছু জাতের দানা মসৃণ, আর কিছু জাতের কোঁচকানো। কোঁচকানো দানাগুলি বেশী মিষ্টি।

জাত প্রকরণ ঃ আশাওহি ও মেটিওর জলদি জাত দুটির দানা মসৃণ। বপনের 60-65 দিন পর ফল পুষ্ট হয়ে যায় ও সংগ্রহ করা চলে।

আরলি বাজার জাতটিও জলদি, গাছ ছোট হয় এবং 60-65 দিনে ফল পুষ্ট হয়ে তোলা চলে, তবে ফল কোঁচকানো। আরকেল জলদি জাত, 60-65 দিনে ফল তোলা যায়। এটি একটি উচ্চফলনশীল ও বেঁটে জাত। এর দানাগুলিও কোঁচকানো। আরকেল, জওহর-মটর-4, আরলি ডিসেম্বর (জাত দুটি জব্বলপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভাবিত) ও পিত্রম-2 (মিলডিউ প্রতিরোধক) ইত্যাদি জলদি জাত।

বোনাভেল জাতটির দানাও কোঁচকানো। লতার উচ্চতা মাঝারি এবং 80-85 দিনে শঁুটি তোলার উপযোগী হয়। এক সাথে দুটো করে শঁুটি ধরে। এছাড়া জওহর মটর-1, ডি. এল.-3, পি-88, পন্থ উপহারের উল্লেখ করা যায়।

এছাড়া নিউলাইন পারফেকসেন, টেলিফোন, ম্যারোফ্যাট, লিনকন, এন. পি-29, টি-19, টি-17, পি-8, পি-35 ইত্যাদি জাতও উচ্চফলনশীল। তবে এ সবগুলিই নাবি জাত এবং ফসল তৈরী হতে 100 দিনের উপর লাগে।

আবহাওয়া ঃ আগেই বলা হয়েছে মটরশঁুটি ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে ভাল হয়। গাছ ছোট অবস্থায় ঠাণ্ডা সহ্য করার ক্ষমতা বেশী থাকে। 5° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতাতেও অংকুরোদ্গম হয়। যে সব জায়গায় হঠাৎ ঠাণ্ডা ও গরম পড়ে যায়

সেখানে মটরশুঁটি ভাল হয় না। আবহাওয়া গরম ও খুব শুকনো হলে শুঁটি কম ধরে এবং শুঁটিতে দানা নাও থাকতে পারে।

মাটি তৈরী ও বীজ বোনা ঃ মটর শুঁটি যে কোন মাটিতে হতে পারে, তবে না—অম্ল ও হাল্কা বেলেদোঁয়াশ মাটিই সব থেকে উপযোগী। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে দানা ছড়ানোর আগে মাটি ভালভাবে তৈরী করা দরকার। ভাল রস আছে এমন জমিতে 2/3 বার লাঙ্গল ও মই দিয়ে সমস্ত ঢেলা ভেঙ্গে ফেলতে হবে ও আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। রসের তফাৎ হলে গাছ বেরোবে না ও ফসল এক সাথে তৈরী হবে না। এরপর জীবাণু সার মেশানো বীজ সমানভাবে ছড়িয়ে আরো একটা চাষ দিতে হবে। যাতে করে বীজগুলো মাটির ভিতর চলে যায়। বীজ উপরে থাকলে পাখীতে খেয়ে নেবে। তাছাড়া রস না পেলে বীজ বেরহবে না। শেষ চাষ হয়ে গেলে, জমিতে 2-3 মিঃ অন্তর অন্তর ভাওড় (দাগ) দিতে হবে কিংবা কোদাল দিয়ে 10 সেঃ মিঃ গভীরতায় 2-3 মিঃ অন্তর নালা দেওয়া যেতে পারে। এতে বৃষ্টির জল বা সেচ দেওয়ার সুবিধে হয়। বীজ ছড়াবার আগে এরাটন 3 গ্রাম/কেজি বীজে মিশিয়ে শোধন করা যেতে পারে। জলদি জাতের জন্য হেক্টর প্রতি 75-100 কেজি ও নাবি জাতের জন্য হেক্টর প্রতি 70-80 কেজি বীজের দরকার হয়।

সার প্রয়োগ ঃ যেহেতু মটর শুঁটি ডাল জাতীয় ফসল এবং এগুলি শেকড়ের অর্বুদের সাহায্যে আবহাওয়া থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করতে পারে। সেইজন্য মটর শুঁটিতে নাইট্রোজেন সারের বিশেষ দরকার হয় না। পরন্তু এরা নাইট্রোজেন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে জমিকে উর্বর করে। ফসফেট সার মটর শুঁটির দানা মোটা করে ও ফলন বাড়ায়। তাছাড়া অর্বুদ বাড়াতেও সাহায্য করে। নাইট্রোজেন সদব্যবহারের জন্য পটাশ সারের দরকার হয়। এছাড়া হেক্টর প্রতি 25-26 টন জৈবসার দিলে ভাল হয়। হেক্টর প্রতি 80 কেজি ইউরিয়া, 300 কেজি সুপার ফসফেট ও 120 কেজি পটাশ সালফেট এবং জৈবসার সবটুকু মাটি তৈরী করার সময়ই জমিতে সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে।

মাধ্যমিক পরিচর্যা ঃ মটর শুঁটির দানা সারিতে ছড়ানো থাকলে আগাছা দমন করা সহজ হয়। অবিন্যস্তভাবে ছড়ানো হলে আগাছা নষ্ট করা দুরূহ হয়ে পড়ে। গাছ ছোট থাকতেই আগাছা হাত দিয়ে বা নিড়ানির সাহায্যে তুলে ফেলা হয়। অনেক সময় ডাইনাইট্রো (Dinitro) বলে একরকম উদ্ভিদ নাশক ছড়িয়েও আগাছা দমন করা হয়। প্রথম অবস্থায়, 50 লিটার জলে 150 সিসি ডাই-

নাইট্রো গুলে সারিতে ছড়ালে আগাছা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু গাছ বড় হলে আগাছা দমন করা যায় না।

মাটিতে যথেষ্ট রস না থাকলে, চাষ দেওয়ার আগেই একটি হালকা সেচ দেওয়া দরকার। অথবা দেরী হয়ে গেলে দানা বোনার পরেও হালকা সেচ দেওয়া যায়। গাছ বেরিয়ে যাওয়ার পর, প্রয়োজন মত, শুকনো আবহাওয়ায়, 10-15 দিন অন্তর সেচ দরকার হতে পারে।

মাঠে লাগালে মটরশুঁটি গাছে ঠেকা দেওয়া হয় না এবং সম্ভবও নয়। তবে বাড়ীতে লাগালে অনেক সময় ঠেকা দেওয়া হয়। কঞ্চি, পাট বা সরকাটির ঠেকা দিয়ে প্রতিটি গাছকে উপরে উঠতে সাহায্য করা হয়।

ফলন ঃ জলদি জাতগুলি হেক্টর প্রতি 10-12 টন ও উচ্চফলনশীল নাবি ও মাঝারি জাতগুলি হেক্টর প্রতি 12-15 টন শুঁটি উৎপাদন করতে পারে। অবশ্য বীজের বা দানার উৎপাদন অনেক কম। হেক্টর প্রতি গড়ে 5-6 টন।

ফরাসবীন ঃ

শিম জাতীয় সব্জীর মধ্যে মটরশুঁটির পরেই ফরাস বীন-এর নাম করা যায়। সব্জীটি ক্রমশই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে ; কারণ এটি খুব তাড়াতাড়ি ফলন দেয়। খাদ্য গুণ বেশ ভাল। এবং ফলনও খারাপ নয়। যাঁরা নিরামিষ খান তাঁদের পক্ষে সব্জীটি বেশ পুষ্টিকারক। সব্জীতে প্রচুর আমিষ জাতীয় খাদ্য, চুন ও লোহা জাতীয় উদ্ভিজ খনিজ ও নানান খাদ্য প্রাণ থাকে।

ফরাস বীনের সাধারণত দুটো জাত দেখা যায়—(1) ছোট ও ঝোপাকৃতি, (2) বড় ও লতানো। ছোট ও ঝোপাকৃতি গাছগুলো জলদি ফলন দেয়। অবশ্য ফলের আকৃতি ও রং অনুসারে ছোট গাছগুলোকে আবার নানা জাতে ভাগ করা হয়েছে। যাইহোক উন্নত জাতের মধ্যে ভারতে কনটেনডার, শুঁড়ীবিহীন, পুষা পারবতী ও টেনডার গ্রীণ-এর চাষ বেশী হতে দেখা যায়। এছাড়া ডি. এল., বোনি-1, আর্কা কোমল, পন্থ অনুপম ইত্যাদি উন্নত জাত, আলমোরা, বাঙ্গালোর ও পন্থনগর থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে।

আবহাওয়া ঃ ফরাসবীনের জন্য নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া খুব উপযোগী। অবশ্য লতানে জাতগুলোর ঠাণ্ডা সহনশীলতা বেশী এবং দিন ছোট না হলে এগুলোর ফুল হয় না। ছোট গাছগুলো সাধারণত 15° থেকে 25° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় ও শুকনো আবহাওয়াতে ভাল হয়। এগুলো বেশী শীত সহ্য করতে

পারে না। শীত বেশী হলে ও মাটি খুব ঠাণ্ডা হলে গাছে ফল আসতে চায় না। পশ্চিম বাংলার সমতলে শরৎ, হেমন্ত ও বসন্তকালে ফরাসবীন চাষ হতে দেখা যায়। পাহাড়ী এলাকাতে, বিশেষত কালিমপঙ মহকুমাতে গ্রীষ্মকালে বীজ লাগানো হয় এবং শরৎ ও হেমন্তকাল থেকে ফলন পাওয়া যায়।

মাটি তৈরী ও বীজ লাগানো ঃ যে কোন মাটিতেই ফরাসবীন হতে পারে, তবে বেশী অম্ল হলে চলবে না। মাটি হালকা হলে চাষ দিতে সুবিধে হয় ও তাড়াতাড়ি ফলন আশা করা যায়। সাধারণত মাটির অম্লতা 5-6 পি. এইচ-এর মধ্যে থাকা চাই।

হেক্টর প্রতি 25-30 টন জৈবসার দিয়ে জমি চাষ দিতে হবে। মাটি ঝুরঝুরে করে শেষ চাষের সময় হেক্টর প্রতি 70 কেজি ইউরিয়া, 400 কেজি সুপার ফসফেট, ও 105 কেজি মিউরেট অফ পটাশ মেশাতে হবে। এরপর 50-60 সেঃ মিঃ দূরে দূরে সারিতে, 50 সেঃ মিঃ অন্তর অন্তর বীজ বসাতে হবে। বীজ লাগানোর আগে অর্বুদ সৃষ্টিকারী জীবাণু সার মিশিয়ে বীজ উজ্জীবন করা যেতে পারে। সাধারণত হেক্টর প্রতি 75-90 কেজি বীজ লাগে। এবং এই পরিমাণ বীজ-এর জন্য 1250-1600 গ্রাম জীবাণু সার হলেই যথেষ্ট। বীজ লাগানোর আগে লক্ষ্য রাখতে হবে মাটিতে যেন যথেষ্ট রস থাকে, এবং খুব বেশী ঠাণ্ডা না থাকে।

সেচ ঃ ফরাসবীন চাষে সেচের বিশেষ দরকার হয় না। অপ্রয়োজনীয় সেচ দিলে গাছ মরে যেতে পারে। ফুল আসার আগে অবশ্য প্রয়োজন মত হালকা সেচ দিলে প্রচুর ফুল আসে ও ফলন ভাল হয়।

মাধ্যমিক পরিচর্যা ঃ জমি অবশ্যই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। ফুল আসতে দেরী হলে বা ফুল ঝরে গেলে পাতলা করে (2-15 ppn) উদ্ভিদ হরমোন (NAA) স্প্রে করা যেতে পারে। ফলন বাড়ানোর জন্য বা তাড়াতাড়ি ফলন পেতে হলে 5 নিযুতাংশ ন্যাপথলিন এসিটিক এ্যাসিড (NAA) গাছে ছড়ানো হয়।

বীজ সংগ্রহ ও ফলন ঃ ফরাসবীনের সীমি, পুষ্ট হয়ে গেলে, শক্ত হবার আগেই সংগ্রহ করা হয়। সাধারণত পুষ্ট অথচ নরম সীমিগুলি হাত দিয়ে সংগ্রহ করে মাপ অনুযায়ী বিন্যাস করা হয়।

অবশ্য দানা হিসাবে ব্যবহারের জন্য সিমীগুলিকে পুষ্ট ও যথেষ্ট শক্ত হতে

দেওয়া হয়। এবং গাছ সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবার আগেই এগুলো সংগ্রহ করে মাড়াই করে দানা আলাদা করা হয়।

জলদি জাতগুলো থেকে হেক্টর প্রতি 30—40 কুইণ্টাল সিমী বা বীন পাওয়া যায়। দানা অবশ্য কিছুটা কম অর্থাৎ 15—20 কুইণ্টাল পাওয়া যায়।

বরবটী ঃ

জাত প্রকরণ ঃ বরবটীর বেশ কয়েকটি উন্নত জাত চাষ হতে দেখা যায়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পুষা ফাল্গুনী, পুষা বরসাতী, পুষা দো-ফসলী ইত্যাদি। জাতগুলোর নাম খানিকটা চাষের সময় উল্লেখ করে। এছাড়া, এল-1552 জাতটিও উচ্চ ফলনশীল। পুষা কোমল জাতটি ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ প্রতিরোধক।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ বরবটী মার্চ থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে যে কোন সময়ে লাগানো যায়। যে কোন ধরনের মাটিতেই বরবটীর চাষ হতে পারে। তবে জমি খুব অম্ল বা নিচু হলে বরবটী চাষ করা যাবে না বা চাষ করলে ভাল ফলন পাওয়া যাবে না।

জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ ঃ সাধারণভাবে সার প্রয়োগ করার রীতি নাই। তবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে চাষ করতে হলে হেক্টর প্রতি জৈবসার ছাড়াও 100 কেজি ইউরিয়া, 200 কেজি সুপার ফসফেট ও 150 কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। সমস্ত সারটুকুই প্রাথমিক অবস্থায় জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ করা হয়।

বীজ বপন ও মাধ্যমিক পরিচর্যা ঃ জমি তৈরী হয়ে গেলে 60—75 সেঃ মিঃ অন্তর অন্তর সারি কেটে, 15—25 সেঃ মিঃ দূরে দূরে প্রতিটি খুপিতে 3-4টি বীজ দেওয়া হয়। এভাবে চাষ করলে হেক্টর প্রতি 12—20 কেজি বীজ লাগে। চারা বেরোলে দুটি চারা রেখে বাকী তুলে ফেলা হয়। বীজ লাগানোর আগে, সম্ভব হলে, বীজে অবর্বুদ বৃদ্ধিকারী জীবাণু মিশিয়ে নিলে গাছ তাড়াতাড়ি তৈরী হয়। গাছ একটু বড় হলে, লতিয়ে যাওয়ার আগেই মাচা করে দেওয়া উচিত। এতে পরিচর্যা ও ফসল তোলার সুবিধে হয়।

যেহেতু প্রাক্ বর্ষাকালেই বরবটীর চাষ করা হয়, সেই জন্য সেচের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। তবে প্রয়োজনে এক-আধটা সেচ লাগতে পারে। প্রয়োজন মত ফুল ফোটার আগে একটা বৃষ্টি বা সেচ পেলে শুঁটি ধরে। এছাড়া ফুল

আসার আগেই গাছে 15 নিযুতাংশ ম্যালিক হাইড্রাজাইড বলে একটি হরমোন ছড়ালে লতা না বেড়ে ঝাকড়া হয়ে যায় ও ফুল আসতে আরম্ভ করে, এবং প্রায় 35% বেশী ফলন পাওয়া যায়।

শস্য সংগ্রহ ও ফলন : পূর্বে বর্ণিত জাতগুলির শুঁটি প্রায় 12—25 সেঃ মিঃ লম্বা হয়। জাতগুলি 40—60 দিনের মধ্যেই ফলন দিতে আরম্ভ করে। শুঁটিগুলি নরম থাকতেই সংগ্রহ করা হয়। শক্ত হয়ে গেলে আর সব্জী হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। বীজগুলি ডাল হিসাবে ব্যবহার করতে হয়।

যাইহোক শুঁটির হেক্টর প্রতি গড় ফলন 8—10 টন হতে পারে।

সীম :

জাত প্রকরণ : বরবটীর মতই সীমের দুরকম গাছ দেখা যায়। কতকগুলি জাত যেমন, জে. ডি. এল-37, কল্যাণপুর, পুষা আরলি প্রলিফিক ইত্যাদি বেশ লতানে ও মাচা ছাড়া চাষ করা যায় না এবং ফলগুলি লম্বা ও সব্জী হিসাবে ব্যবহারের উপযুক্ত। আবার কিছু জাত যেমন হেব্বাল সিলেকশনের গাছ ছোট হয়, ফলগুলি ছোট হয়, বীজগুলি ডাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এগুলি জমিতে মাচা ছাড়াই চাষ করা যায়। দক্ষিণ ভারতে বিশেষ করে কর্ণাটকে মাঠে মাচা ছাড়াই এই জাতটির বহুল চাষ হতে দেখা যায়।

জমি তৈরী ও বীজ বোনা : জমিতে লাগালে বরবটীর মতই জৈব্য ও অজৈব সার দিয়ে মাটি তৈরী করতে হয়। বালি মাটি ছাড়া যে কোন মাটিতেই সীম চাষ হতে পারে। বালি মাটিতে গাছ বেশী বাড়ে না ও ফলন ভাল হয় না।

জুলাই-আগস্ট মাসে বীজ লাগালে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফুল আসে ও জানুয়ারী মাস থেকে সীম পাওয়া যায়। তবে পুষা জাতটি ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে চাষ করা যায়।

জমিতে লাগালে বরবটীর মতই সারিতে, এক মিটার দূরত্বে খুপি করে 2-3টি বীজ লাগানো হয়। পরে একটি গাছ রেখে বাকীগুলি তুলে ফেলা হয়। এভাবে লাগালে হেক্টরে 25—40 কেজি বীজ লাগে। গাছ একটু বড় হলে সারিতে মাচা করে দেওয়া হয়। অন্যান্য মাধ্যমিক পরিচর্যা বরবটীর মতই।

শ‍ুটি সংগ্রহ ও ফলন ঃ নরম অবস্থায় শ‍ুটি সংগ্রহ করা হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে ফুল ফোটার পর 15—20 দিনের মধ্যেই সীম সংগ্রহ করার উপযোগী হয়। দেরী হলে শ‍ুটি শক্ত হয়ে যায় ও বীজগ‍ুলি ডাল হিসাবে ব্যবহার করা যায়। হেক্টর প্রতি শ‍ুটির গড় ফলন 6—8 টনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

অন্যান্য বীন বা সীম ঃ অন্যান্য বীন বা সীম-এর মধ্যে মাখন সীম, থোকা সীম ও সয়াবীন-এর চাষ সব্জী হিসাবে খ‍ুব একটা প্রচলিত নয়। লিমাবীন চাষ হতেই দেখা যায় না। মাখন সীমও থোকা সীম আদিবাসীদের কাছে খ‍ুব প্রিয় ; তবে এগ‍ুলি জঙ্গলে প্রাকৃতিক অবস্থায় হতে দেখা যায়। সয়াবীনের চাষ ও ব্যবহার ম‍ূলত ডাল হিসাবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

ফল সব্জী

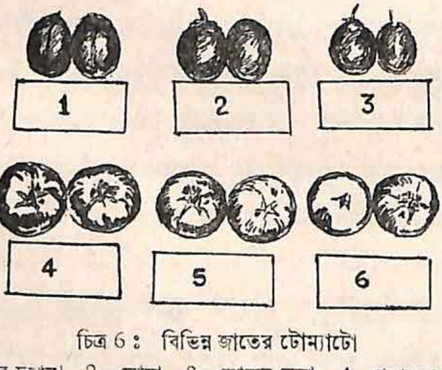
ফল সব্জীগুলির মধ্যে বেগুন গোত্রীয় টোম্যাটো, বেগুন ও লংকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলির মধ্যে টোম্যাটো ও বেগুন সব্জী হিসাবে বহুল প্রচলিত। টোম্যাটোর উৎপাদন ও জনপ্রিয়তা আলুর সাথেই তুলনীয়। লংকার অবশ্য কতকগুলি অনুপ্রকরণ দেখা যায় এবং এদের মধ্যে একটি, যেটি ক্যাপ সিকাম নামে বেশী পরিচিত, সব্জী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অন্যগুলি হয় শুকনো বা আচারের লংকা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

এছাড়া পাহাড়ী অঞ্চলে গাছ টোম্যাটোর কিছু চাষ হতে দেখা যায়। অবশ্য ক্যাপসিকামও পূর্ব ভারতের সমতলে চাষ করা সম্ভব নয়।

টোম্যাটো ঃ

জাত প্রকরণ ঃ জলদি ঃ—পুষা আরলি ডুয়ার্ফ, পুষা রুবি ইত্যাদি।

মাঝারি ও নাবি—কৃষ্ণনগর-20, এস এল-120, মারগ্লোব, সু, বেষ্ট অফ অল চিকু গ্রান্ড, পাঞ্জাব ট্রপিক, কল্যাণী ইউনুষ (T_9), মানি মেকার, পাঞ্জাব চুহারা, আঙ্গুর লতা, রোমা, মারগ্লোব সুপ্রিম। এইচ এস—101, সুইট—72, পুষা গৌরব, এস—12, কো—3, পাঞ্জাব কেশরী, লা-বোনিটা, কে, এস—2, পন্থ বাহার, পন্থ টি—13, টি-3, আর্কা বিকাশ ও সৌরভ ইত্যাদি উন্নত জাতের উল্লেখ করা যায়।

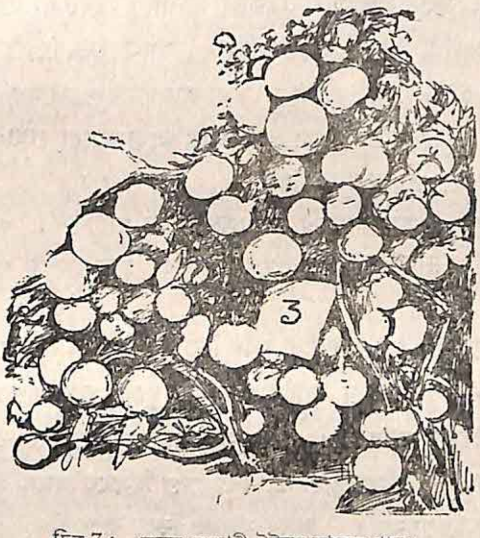


চিত্র 6 ঃ বিভিন্ন জাতের টোম্যাটো
(1—পাঞ্জাব চুহারা, 2—রোমা, 3—আঙ্গুর লতা, 4—পুষা আরলি ডুয়ার্ফ 5—মারগ্লোব, 6—পুষারুবি)

এগুলোর মধ্যে কিছু জাতের ফল গোলাকৃতি, কিছু আঙুরের মত ছোট, আবার কিছু নাসপাতির মত দেখতে। কিছু ফলের রস বেশী আবার কিছু

ফলের শাঁস বেশী এবং বাইরের খোসা অপেক্ষাকৃত শক্ত হওয়ায় দূরে চালান করার পক্ষে উপযুক্ত।

প্রজননের মাধ্যমে সংকর বীজ তৈরী করে টোম্যাটো উৎপাদন প্রায় 50% বাড়ানো সম্ভব। সাধারণত প্রথম সংকর প্রজন্মেই উচ্চ ফলনশীলতা দেখা যায়। প্রজননের জন্য পুষা রুবি একটি ভাল সহযোগী। অবশ্য উচ্চ ফলনশীল কল্যাণী ইউনুষ জাতটি মিউটেশনের মাধ্যমে উৎপন্ন করা হয়েছে।



চিত্র 7 : ফলন্ত কল্যাণী ইউনুষ জাতের গাছ।

আবহাওয়া ও মাটি : টোম্যাটো চাষের জন্যে 21—23° সেঃ গ্রেঃ উষ্ণতা হলে ভাল হয়। তবে 13°—38° সেঃ গ্রেঃ পর্যন্ত উষ্ণতায় টোম্যাটো চাষ করা যেতে পারে। এর কম তাপ, হলে গাছ মারা যায় ও তাপ বেশী হলে ফল না ধরে ও ফলে রং না হওয়ার সম্ভবনা থাকে। অনেক সময় ফল জ্বলেও যায়।

উর্ব্বর দোয়াঁশ মাটি টোম্যাটো চাষের উপযুক্ত হলেও যে কোন মাটিতেই টোম্যাটো চাষ হতে দেখা যায়। তবে মাটি খুব বেশী অম্ল হলে চলবে না। পি, এইচ—6-7 এর মধ্যে হওয়া চাই।

বীজ বপন ও চারা রোপণ : সাধারণভাবে জুলাই, আগষ্ট মাসে 400—500 গ্রাম বীজ, বীজতলায় ফেলে চারা তৈরী করলে এক হেক্টর জমিতে লাগানোর মত চারা পাওয়া যায়। আবহাওয়া অনুকুল হলে বছরে দুবার

ফলন লওয়া সম্ভব। নাবি ফসলের জন্য আক্টোবর মাসেও বীজ ফেলা যেতে পারে।

শীতকালীন মূল শস্যের জন্য 75 × 60 সেঃ মিঃ দূরত্বে চারা লাগানো হয়। তবে জলদি ও নাবি শস্যে, গাছের দূরত্ব কমিয়ে 40 সেঃ মিঃ করা যেতে পারে।

ক্ষেত তৈরী ও সার প্রয়োগ ঃ মোটামুটিভাবে জমিতে দুটো চাষ ও মই দেওয়ার পর হেক্টর প্রতি 20 টন পচা জৈবসার এবং 100 কেজি ইউরিয়া, 175 কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ ও 200 কেজি সুপার ফসফেট ছড়িয়ে আরো দুটো চাষ ও মই দিয়ে এগুলি ভাল ভাবে মাটিতে মিশালে জমি তৈরী হবে। এরপর নির্দিষ্ট দূরত্বে চারা লাগানো যায়। চারা লাগানোর পর গোড়ায় জল দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। চারা লেগে গেলে এক মাসের মধ্যে আরো 100 কেজি ইউরিয়া চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করা উচিত।

চারা লাগানো ও সার দেওয়ার পর সেচ দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া প্রয়োজন অনুসারে আরো 3-4টি সেচ লাগতে পারে। সেচ বেশী হলে ফল ফেটে যেতে পারে।

মাধ্যমিক পরিচর্যা ঃ টোম্যাটো জমি নিড়ানী দিয়ে পরিষ্কার রাখা দরকার। এছাড়া প্রয়োজন মত গোড়ায় মাটি দিয়ে আল তুলে দেওয়া হয়। অনেক সময় গাছে ঠেকা দেওয়ার দরকার হয়। প্রথম ফুল আসার সময় 15—20 নিজুতাংশ পি, সি, পি৪ বা 1—2 নিজুতাংশ 2, 4-ডি স্প্রে হিসাবে গাছে ছড়ালে ফল ধরা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। এছাড়া ফলনও কিছু বাড়ে।

ফলন সংগ্রহ ও উৎপাদন ঃ ফল পুষ্ট হয়ে গেলেই সংগ্রহ করা উচিত। অবশ্য প্রয়োজন অনুসারে পুষ্ট অথচ কিছুটা সবুজ রং ধরা ও পাকা সব রকম ফলই সংগ্রহ করা হয়। তবে বেশী পেকে গেলে পাখীতে ফল নষ্ট করতে পারে বা সংগ্রহের অসুবিধা হয়। টোম্যাটোর গড় ফলন হেক্টর প্রতি 16—24 টন। কিছু প্রজাতির ফলন আরো বেশী।

বেগুন ঃ

জাত প্রকরণ ঃ উচ্চফলনশীল জাতগুলোর মধ্যে পুষা সম্রাট, পুষা পার্পল লঙ, পুষা পার্পল ক্লাসটার, পি, এইচ— 4, পুষা ক্রান্তি, পুষা পারপেল রাউণ্ড, মুক্তাকেশী, মাকড়া, ব্লাক বিউটি, রামনগর জায়েন্ট, ভাকরি, ওয়াইনাড জায়েণ্ট আরকা শীল, আরকা কুসুমকার ইত্যাদির নাম করা যায়। এগুলি সবই শীতকালে ভাল হয়। পূর্বাঞ্চলে বারমেসে বলে একটা জাত পাওয়া যায়,

যা সারা বছরই ফলন দেয়। এছাড়া ঝুপড়ি ও নুরকি বলে জাতগুলি বসন্তকালে চাষ হতে দেখা যায়। তবে এগুলির ফল ছোট। পন্থ ঋতুরাজ, আজাদ ক্রান্তি, আর্কা নভনীত, যমুনী গোল ইত্যাদি বিভিন্ন গবেষণাগারে উদ্ভাবিত উন্নত জাতের বেগুন।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ সাধারণভাবে শীতকালে ফলতে দেখা গেলেও গড়ে 13°—21° সেঃ গ্রেঃ তাপমাত্রায় বেগুন ভাল হয়। তবে তিনটি জাত যেমন, বারোমেসে, ঝুপড়ি ও নুরকি ব্যতিক্রম।

যে কোন মাটিতেই বেগুন ভাল হলেও উর্বর বেলে দোয়াঁশ মাটি বেগুন চাষের পক্ষে উপযুক্ত। মাটির জল ধারণ ক্ষমতা যথেষ্ট থাকা দরকার।

বীজ ও চারা তৈরী ঃ এক হেক্টর চারা লাগাতে 300—500 গ্রাম বীজ ফেলতে হবে। বর্ষা ও শীতকালীন ফসলের জন্য মার্চ-এপ্রিল মাসে বা বসন্ত-কালীন বেগুনের জন্য সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বীজ ফেলা হয়।

দেড় মাসের চারা মূল জমিতে 60—90 সেমিঃ দূরত্বে লাগানো হয়। গাছের থেকে সারির দূরত্ব বেশী থাকে। বড় জাতের গাছ হলে সারির দূরত্ব বেশী থাকে। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব 60 সেঃ মিটারের মধ্যে রাখা হয়।

জমি তৈরী, সেচ ও সার প্রয়োগ ঃ বেগুন সাধারণত ছয় মাসের শস্য। তবে বারো মেসে জাত গোটা বছর থাকে। কাজেই ছয় মাসের প্রয়োজনমত উদ্ভিদ খাদ্য প্রয়োগ করা দরকার।

বার বার চাষ দিয়ে জমি তৈরী করা হয়। জমি তৈরির সময় হেক্টর প্রতি 20—25 টন জৈবসার, এক কুইণ্টাল ইউরিয়া বা সমপরিমাণে নাইট্রোজেন ঘটিত সার, 225 কেজি সুপার ফসফেট ও 100 কেজি মিউরিট অফ পটাশ প্রয়োগ করা উচিত। নির্দিষ্ট দূরত্বে চারা লাগিয়ে, গাছের গোড়ায় সেচ বা জল দেওয়া দরকার। গাছ লেগে গেলে, এক মাস পরে, আরো 50 কেজি ইউরিয়া চাপান হিসাবে প্রয়োগ করে সেচ দিতে হবে। গাছে ফুল আসতে আরম্ভ করলে পুনরায় 50 কেজি ইউরিয়া চাপান হিসাবে প্রয়োগ করে সেচ দিতে হবে।

এছাড়া প্রথম অবস্থায় প্রয়োজনমত 7 দিন অন্তর ও গাছ বড় হয়ে গেলে 10—12 অন্তর সেচ দেওয়া দরকার। বর্ষায় চারা লাগালে প্রথম অবস্থায় সেচের বিশেষ দরকার হয় না।

মাধ্যমিক পরিচর্যা ঃ বেগুন ক্ষেত মোটামুটি পরিষ্কার রাখা দরকার। গাছ ছোট থাকাকালীন দুই একটা নিড়ানী লাগে। প্রথমবার চাপান দেওয়ার পর

গাছের গোড়ায় মাটি দিলে ভাল হয়। দ্বিতীয়বার চাপান সার সারিতে দেওয়ার পর আল তুলে দেওয়া উচিত। এতে গাছের গোড়া শক্ত হওয়া ছাড়াও সেচ দেওয়ার সুবিধে হয় ও বেশী বর্ষা হলে ঐ আলের মাঝ দিয়ে জল বের করে দেওয়া যায়।

বেগুনের সব ফুলেই ফল হয় না। ফল ধরার হার বাড়ানোর জন্য দুই নিযুতাংশ 2, 4-ডি জলীয় দ্রবণ ফুল আসার পরেই, সমস্ত গাছে ছড়ালে উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া 4—5 নিযুতাংশ 2, 4-ডি বা পি, সি, পি বা এন, এ, এ জলীয় দ্রবণে চারা একদিন শোধন করে জমিতে লাগালেও বেশী ফলন পাওয়া যায়।

বেগুনে সংকরায়নের মাধ্যমে বেশী ফলন পাওয়া যায়। কিছু কিছু প্রজাতির সংমিশ্রণে সংকর বীজ উৎপাদনে 80—100 শতাংশ বেশী ফলনও পাওয়া গেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পুষা অনমোল। এটি পুষা পার্পল লঙ ও হাইদরপুর এই দুটি প্রজাতির সংমিশ্রণে সৃষ্ট।

ফল সংগ্রহ ও ফলন ঃ বেগুন নরম থাকতেই সংগ্রহ করা উচিত। নরম বেগুনে চকচকে ভাবটা থাকে। উপরের খোসা খসখসে বা ফ্যাকাসে হয়ে গেলে ধরে নিতে হবে বেগুন পেকে গেছে।

সাধারণভাবে প্রতিটি বেগুন গাছ থেকে 2-5 কেজি ফল আশা করা যায়। হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন 25-35 টন।

লংকা ঃ

জাতপ্রকরণ ঃ লংকার মধ্যে মোটামুটি দুটো ভাগ দেখা যায়। একটা ধানী লংকা, এটি দেখতে খুবই ছোট তবে ভীষণ ঝাল। এটি মূলত মসলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অন্যটি অপেক্ষাকৃত মোটা বা বড় লংকা। শেষেরটি মশলা বা সব্জী দুই ভাবেই ব্যবহৃত হয়। ক্যাপসিকাম বলে বাজারে, সব্জী হিসাবে যে ফলটি দেখা যায়, সেটি শেষোক্ত পর্যায়ে পড়ে। লংকার অনেক জাত প্রকরণ দেখা যায়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য এন পি—46A, এইচ, ওয়াই, বি—5-1-52 CA—452-1। ক্যালিফোরনিয়া ওয়ানডার, ইয়োলো ওয়ানডার, কিং অফ নর্থ, এলিফ্যান্ট ট্রাঙ্ক, ইত্যাদি জাতগুলির মধ্যে স্বাদ, বর্ণ ও আকৃতিগত যথেষ্ট প্রভেদ দেখা যায়। ক্যালিফোরনিয়া ওয়ানডার, ইত্যাদি প্রকরণগুলি শীত প্রধান দেশেই বেশী চাষ হতে দেখা যায়। অন্ধ্রজ্যোতি, ভাগলক্ষী, কে-2, জে-218,

মুশালওয়াদি এবং এক্স-235, ইত্যাদি উন্নত জাতগুলি ভারতীয় কৃষিঅনুসন্ধান পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত।

বীজ বপন ও চারা রোপণ ঃ এক হেক্টর জমির জন্য উপযুক্ত পরিমাণ চারা তৈরি করতে 1200-1500 গ্রাম বীজ লাগে। লংকা বীজ সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে বীজ তলায় ফেলা হয়। চারা 4-8 সপ্তাহের মধ্যেই লাগানোর উপযুক্ত হয়ে যায়।

লংকা চারা জমিতে লাগানোর সময় গাছ থেকে গাছের দূরত্ব 40-45 সেঃ মিঃ ও সারি থেকে সারির দূরত্ব 50-60 সেঃ মিঃ রক্ষা করা হয়।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ ক্রান্তিয় এবং অন্য আবহাওয়াতেও লংকা হতে দেখা যায়। সাধারণত 60-120 সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত লংকা চাষের জন্য প্রয়োজন। পাহাড়েও ভালই লংকা হতে দেখা যায়। কালিমপং, ভূটান ইত্যাদি অঞ্চলে সব রকম লংকার চাষ হয়। না-অম্ল বেলে দোঁয়াশ মাটিই লংকা চাষের জন্য প্রকৃষ্ট।

সার ও সেচ প্রয়োগ ঃ সেচ অঞ্চলে হেক্টর প্রতি 15-20 টন জৈবসার দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে জমি তৈরী করা উচিত। অবশ্য অসেচ অঞ্চলে সেচের সুবিধে না থাকলে একটু বেশী অর্থাৎ হেক্টর প্রতি 20-30 টন জৈবসার দিলে, মাটির রস ধারণ ক্ষমতা বাড়ে। যাইহোক, জমি তৈরীর সময়, হেক্টর প্রতি 70 কেজি ইউরিয়া, 175 কেজি সুপার ফসফেট ও 100 কেজি পটাসিয়াম সালফেট প্রয়োগ করা উচিত। চারা লাগানোর এক মাস পর এবং ফুল আসার সময় প্রতিবার 35 কেজি ইউরিয়া হিসাবে দুবার চাপান সার প্রয়োগ করা উচিত।

লাগানোর আগে চারার শেকড় (বেগুনের মতই) 24 ঘণ্টা তরল সার ও হরমোন দ্রবণে চুবিয়ে রাখলে গাছ সতেজ হয়, তাড়াতাড়ি ফুল আসে ও ফলনও বাড়ে।

লংকা চাষে প্রয়োজন মত 7-15 দিন অন্তর সেচ দেওয়া দরকার।

মাধ্যমিক পরিচর্যা ঃ লংকা জমি পরিষ্কার রাখা দরকার। প্রয়োজনে গোড়ায় মাটি ও গাছে ঠেকা দেওয়ার দরকার হতে পারে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন ঃ সাধারণতঃ সব্জী হিসাবে ব্যবহার করার জন্য লংকা পুষ্ট অথচ সবুজ অবস্থায় তোলা হয়। মশলা হিসাবে ব্যবহারের জন্য লাল বা সবুজ, শুকনোর জন্য লাল, রঞ্জক হিসাবে ব্যবহারের জন্য পাকা ও লাল এবং আচারের জন্য দুরকমই সংগ্রহ করা হয়। কাঁচা লংকার ফলন হেক্টরে 7-12 টন আর শুকনো লংকা 7-15 কুইণ্টাল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মূল সব্জী

এই সব্জীগুলির মূলই প্রধানত সব্জী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তবে কিছু সব্জীর কচি পাতাও শাক সব্জী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই সব্জীগুলি মূলত শর্করা সমৃদ্ধ। সালোক সংশ্লেসিত শর্করা মূলে সঞ্চিত হয়ে মূলগুলির বৃদ্ধি ঘটায়। এই বিভাগে বেশ কিছু সব্জী থাকলেও প্রধানত মূলো, শালগম, বীট ও গাজরের নাম করা যায়। অন্য সব্জীগুলি কদাচিৎ চাষ হতে দেখা যায়।

মূলো : ভারতবাসীর কাছে মূলো অতি পরিচিত ও জনপ্রিয় সব্জী। মূলো কাঁচা ও রান্না করে খাওয়া যায়, মূলোর পাতাও শাক হিসাবে রান্না করা হয়। কাঁচা মূলো থেকে যথেষ্ট খনিজ লবণ ও খাদ্য প্রাণ "সি" পাওয়া যায়। তবে রান্না করলে খাদ্য প্রাণটি নষ্ট হয়ে যায়।

জাত প্রকরণ : মূলোর রঙ, আকার ও মাপ অনুযায়ী জাত প্রকরণ ভাগ করা হলেও প্রধানত তাপ সহ্য করার ক্ষমতা দেখেই মূলোর জাতগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। শীত সহনশীল জাতগুলো ইউরোপ মহাদেশে বেশীর ভাগ চাষ হয়, তবে পৃথিবীর শীত প্রধান ও পাহাড়ী অঞ্চল এবং সমতলে শীত-কালেও এদের চাষ করা যায়। প্রচলিত সব্জীর মধ্যে শীত সহনশীল মূলোর জাতগুলো প্রকৃত পক্ষে সব্জী হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। অন্য জাতগুলো উষ্ণ আবহাওয়ায় উষ্ণ অঞ্চলে চাষ হতে দেখা যায়। এগুলি তৈরী হতে একটু বেশী সময় নেয়। তবে ফলন অপেক্ষাকৃত বেশী।

মূলোর জলদি জাত বলতে প্রথমেই ফ্রেঞ্চ ব্রেকফাস্ট, স্কারলেট গ্লোব, হোয়াইট আসইকল, ইত্যাদির নাম করতে হয়। এই জাতগুলোতে বীজ বোনার 20-30 দিনের মধ্যে ফসল তৈরী হয়ে যায়। এগুলোর ঝাঁজ একদম নেই বললেই হয়।

উষ্ণ অঞ্চলের জাতগুলোর মধ্যে জাপনীজ হোয়াইট, পুষা দেশী ; কল্টায় লাল ও পুষ হিমানীর নাম করা যায়। এগুলি তৈরী হতে বেশী সময় নেয়, ঝাঁজ আছে ও ফলন বেশী।

ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ জাপানীজ হোয়াইট থেকে পুষা চেতকী বলে একটা জাত নির্বাচন করেছে, যেটি তৈরী হতে মাত্র 40-45 দিন সময় লাগে।

এই জাতটিরও ঝাঁজ কম এবং যে কোন আবহাওয়াতেই হতে দেখা যায়, তবে শীতকালে বেশী ফলন পাওয়া যায়।

এগুলো ছাড়াও জোনপুরী (প্রায় 2 হাতের বেশী লম্বা ও বেশ মোটাজাত), বোম্বাই লাল, চীনা গোলাপী ও সকুরাজুমা ইত্যাদিও ভাল জাত বলে পরিচিত।

আবহাওয়া ঃ সাধারণত তাপমাত্রা 10°-15° সেঃ গ্রেঃ থাকলে মূলো চাষ ভাল হয়। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়াতে সারা বছরই মূলো চাষ করা যায়।

মাটি তৈরী ও সার প্রয়োগ ঃ যে কোন মাটিতে মূলো ভাল হয় না। সাধারণত গভীরতাযুক্ত হালকা মাটিতেই মূলো চাষ ভাল হয়। বেলে দোয়াঁশ মাটি সবচেয়ে উপযোগী।

কথায় আছে ষোল চাষে মূলো, কাজেই বীজ বোনার আগে খুব ভাল ভাবে বার বার চাষ দিয়ে মাটি ঝুর ঝুরে করে ফেলতে হবে। শেষ চাষের আগে হেক্টর প্রতি 30-40 টন জৈবসার, এবং 200 কেজি ইউরিয়া, 300 কেজি সুপার ফসফেট ও 200 কেজি পটাশ সালফেট মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। জৈবসার প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ ছাড়াও মাটি ফাঁপা রাখবে ; মূলো মোটা হতে সাহায্য করবে ; মাটির রস ধরে রাখবে ও অজৈব সার প্রয়োগজনিত দূষণ থেকে জমিকে রক্ষা করবে।

বীজ বপন ও দূরত্ব ঃ জাতের তারতম্য অনুসারে হেক্টর প্রতি 10-12 কেজি বীজের দরকার হয়। বড় জাতগুলোর বীজ কম লাগে।

মূলো বীজ জমিতে ছড়ানো হলেও সারিতে বুনলে ফলন ভাল হয় ও মাধ্যমিক পরিচর্যার সুবিধা হয়। সাধারণত 30-40 সেঃ মিঃ দূরত্বে সারি করা হয়। তবে বড় জাতগুলোর জন্য বেশী দূরত্ব দেওয়া দরকার।

উষ্ণতা সহনশীল পুষা দেশী, পুষা চেতকী ইত্যাদি জাতগুলো অক্টোবর-জানুয়ারী মাসে বোনা হয়।

মাধ্যমিক পরিচর্যা ঃ মূলোর ফলন পেতে হলে ভালভাবে মাটি খুঁড়ে দিতে হবে। আগাছা থাকবে না ও প্রয়োজনমত সেচ দিতে হবে। এছাড়া ঘন হলে কিছু গাছ তুলে পাতলা করে দিতে হবে।

মূলো শক্ত হওয়ার আগেই তুলে বাজার জাত করা হয়। মূলো বেশী দিন জমিতে রাখলে শক্ত ও শোলা হয়ে যায়। শীত কমে গেলে আবার পোকার আক্রমণ বাড়ে। বড় জাতগুলির গোড়ায় মাটি দেওয়ার দরকার হতে পারে।

ফলন ঃ ইউরোপীয় জাতগুলির ফলন একটু কম। এগুলো চাষ করলে,

হেক্টরে 4 টন ফলন আশা করা যায়। তবে বড় জাতগুলোর ফলন 20-30 টন পর্যন্ত হতে দেখা যায়।

হেক্টর প্রতি বীজের ফলন 8-10 টন হতে পারে। বীজ উৎপাদনের জন্য দুরকম পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। মূলোকে গাছশুদ্ধ উপড়ে নিয়ে, মূলোর আকৃতি ও চেহারা দেখে পুনরায় রোপণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে উচ্চ মানের বীজ পাওয়া যায়। অন্য পদ্ধতিতে স্থান পরিবর্তন না করে মূলোর ফুল আসতে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বীজের ফলন বেশী হয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে পুষ্ট মূলো খানিকটা কেটে নিয়ে ফের জমিতে লাগালেও ফুল আসে ও বীজ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ফলন কমে যায়। কাজেই মূলো কেটে নেওয়া উচিত নয়। মূলোতে মৌমাছির দ্বারা ইতর পরাগ সংযোগ হয়। আবহাওয়া খুব বেশী উষ্ণ হলে ও খুব হাওয়া থাকলে ফুলে মৌমাছি বসে না। এছাড়া পরাগও শুকিয়ে যায়। কাজেই বীজ উৎপাদনের জন্য শীত ও বসন্ত কালই প্রশস্ত।

শালগম ঃ

মূলোর মত শালগমও শীতের সব্জী। এটিতেও প্রচুর খনিজ লবণ ও খাদ্য-প্রাণ আছে। খাদ্যপ্রাণ "সি" সব থেকে বেশী পরিমাণে দেখা যায়। সাধারণত সালাদ, রান্না ও আচার করে শালগম ব্যবহার করা হয়।

এটিরও চেহারা, রঙ ও তাপ সহনশীলতা অনুযায়ী জাত প্রকরণ ঠিক করা হয়েছে। হোয়াইট গ্লোব, স্নোবল, গোল্ডেন বল, পুষা চন্দ্রিমা, ইত্যাদি জাত-গুলো যথেষ্ট ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে। এবং সমতলে শীতকালে চাষ হতে দেখা যায়। এই জাতগুলো কিছুটা মিষ্টি ও নরম হয়। উষ্ণ অঞ্চলে পুষা কাঞ্চন ও পুষা শ্বেতীর চাষ করা যায়। এগুলোর ঝাঁজ আছে। পুষা শ্বেতী এগুলোর মধ্যে সব থেকে জলদি।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ শালগমের জন্য মূলোর মতই আবহাওয়া ও মাটি দরকার হয়। জমি তৈরীর পদ্ধতিও একই রকম। জৈবসারও একই পরিমাণে লাগলেও নাইট্রোজেন ইত্যাদি কম পরিমাণে লাগে। জমি তৈরীর সময় হেক্টর প্রতি 80 কেজি ইউরিয়া, 200 কেজি সুপার ফসফেট, ও 100 কেজি পটাশ সালফেট প্রয়োগ করা হয়। একমাস পরে আরো 40 কেজি ইউরিয়া চাপান সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

মাধ্যমিক পরিচর্যা ও সেচ ঃ সেচ ও মাধ্যমিক পরিচর্যা মূলোর মতই।

বীজ বপন ঃ আষাঢ় শ্রাবণ মাসে সারিতে তাপ সহলশীল জাতগুলো চাষ করা হলেও অন্য জাতগুলো আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ন মাসের মধ্যে লাগানো হয়। পাহাড়ী অঞ্চলে গ্রীষ্মে শালগম চাষ হয়।

ফলন ঃ শাল গমের ফলন মূলোর থেকে বেশী। হেক্টরে 20-30 টন ফলন আশা করা যায়। বীজের ফলন 500-600 কেজি হতে দেখা যায়।

বীট ঃ

সালাদ ও রান্না দুভাবেই বীট ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে বীটের মধ্যে অনেক ভাগ দেখা যায়। সাধারণভাবে সব্জী হিসাবে বীট ব্যবহৃত হয়, এছাড়া চিনি তৈরীর জন্য সুগার বীট, সুইস চার্ড, পালং ও মেঙ্গল, সবই এই বীটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

জাত প্রকরণ ঃ যাইহোক ক্রিমসন গ্লোব ও ডেট্রইট ডার্ক রেড জাত দুটিই ভারতীয় চাষীদের সমাদর লাভ করেছে। দুটি জাত থেকেই গোলাকৃতি মূল পাওয়া যায়।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ বীট শীতকালীন দ্বিবর্ষজীবী ফসল। তাপমাত্রা 18°-21° সেঃ গ্রেঃ মধ্যে থাকলে ফলন ভাল হয়। তবে তাপমাত্রা 10° সেঃ গ্রেঃ-এর নিচে বেশীদিন থাকলে মূল বাড়ে না, যার ফলে বড় না হয়ে ফুল এসে যায়। প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা না থাকলে মিষ্টত্বও আসে না।

হালকা, উর্বর ও গভীরতাযুক্ত মাটি বীট চাষের উপযুক্ত। মাটিতে যথেষ্ট জৈবপদার্থ থাকা দরকার। নিষ্কাষণী ব্যবস্থাও ভাল হওয়া চাই। মাটি বেশী অম্ল হলে ফলন ভাল হয় না। সাধারণত মাটির অম্লত্ব পি, এইচ-5.5—6.9 এর মধ্যে হলে খুব ভাল হয়।

ক্ষেত তৈরী ও সার প্রয়োগ ঃ মূলো বা সালগমের মতই বার বার চাষ দিয়ে মাটি তৈরী করতে হবে। ক্ষেত করার সময় হেক্টর পিছু 30-40 টন জৈবসার, 120 কেজি ইউরিয়া, 400-500 কেজি সুপার ফসফেট ও 120 কেজি পটাশ সালফেট ভালভাবে মিশাতে হবে। এছাড়া প্রয়োজন মত সোহাগা দিতে পারলে ভাল হয়। সুগার বীটের লবণ সহনশীলতা বেশী। সেইজন্য লবণাক্ত জমিতে শীতকালে চাষ করলে, একটি বেশী অর্থকরী ফসল যেমন পাওয়া যায়, তেমনই মাটি শোধনও করা যায়।

বীজ বপন ঃ প্রতি হেক্টরের জন্য প্রায় 8-10 কেজি বীজ লাগে। সাধারণত তৈরী জমিতে, 30-45 সেঃ মিঃ দূরে দূরে সারিতে বীজ বোনা হয়। বীজ থেকে

বীজের দূরত্ব 10 সেঃ মিঃ রাখতে হবে। মাটির 2-3 সেঃ মিঃ এর বেশী গভীরে বীজ বোনা উচিত নয়।

আগষ্ট থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বীজ বোনা চলে। পাহাড়ী এলাকাতে ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাস পর্যন্ত বীজ বুনলে অসুবিধা হয় না। তবে বীজ অঙ্কুরিত হতে কিছুটা সময় লাগে।

মাধ্যমিক পরিচর্যা ও সেচ ঃ প্রথমেই বলা দরকার চারা ঘন হলে পাতলা করে দিতে হবে। গাছ একটুকু বড় হলে গোড়ায় মাটি দিতে হবে। জমি পরিষ্কার রাখা বাঞ্ছনীয়।

প্রয়োজনমত সেচ দেওয়া দরকার। মাটির রস যেন শুকিয়ে না যায়।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন ঃ বীটের মূল নির্দিষ্ট আকারে আসতে প্রায় 2-3 মাস সময় নেয়। আকারে এসে গেলে মূলগুলো টেনে তোলা হয় ও পাতা ছাড়িয়ে বাজারজাত করা হয়। হেক্টর প্রতি বীটের ফলন প্রায় 20-25 টন।

গাজর ঃ

গাজরের বিভিন্ন জাত দেখা গেলেও এগুলিকে মূলত শীতসহনশীল ও অপেক্ষাকৃত কম শীতসহনশীল এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। শীতসহনশীল গুলি ইউরোপ মহাদেশে আর তাপসহনশীলগুলি এশিয়া মহাদেশে উদ্ভূত হয়েছে। ইউরোপীয় জাতগুলি দ্বিবার্ষিক। এগুলি আবার রঙ ও আকৃতি দেখে নানা ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলির মধ্যে পূষা কেশর, পূষা জমদগনী ট্যানটেনী ও ন্যানটেস, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ গাজর শীতকালীন সব্জী হলেও এর রঙ ও ঠিক আকৃতি আসার জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রা লাগে। সাধারণত 10°-15° সেঃ গ্রেঃ তাপমাত্রায় মূল বেশ বড় হয়। তবে রঙের উজ্জ্বলতা আসে না। প্রাকৃতিক তাপমাত্রা 15°-20° সেঃ গ্রেঃ হলে আকৃতি ও রঙ স্বাভাবিক হয়। কিন্তু তাপমাত্রা বেড়ে গেলে মূল মোটা ও ছোট হয়ে যায়।

গাজর চাষের জন্য সাধারণত হালকা ও গভীর মাটির দরকার হয়। বেশী অম্ল মাটি গাজর চাষের অনুপযুক্ত। সাধারণত 6.5 পি, এইচ বা অম্লতা গাজর চাষের পক্ষে আদর্শ।

জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ ঃ মূল জাতীয় শস্যের জন্য খুব ভালভাবে জমি তৈরী হওয়া দরকার। জমি তৈরীর সময় হেক্টর প্রতি 30-40 টন জৈব-

সার, 80 কেজি ইউরিয়া, 300 কেজি সুপার ফসফেট ও 120 কেজি মিউরেট অফ পটাশ মিশিয়ে নেওয়া উচিত। পরে আরো 80 কেজি ইউরিয়া চাপান হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। সার ভালভাবে মাটির গভীরে যাওয়া দরকার।

বীজ বপন ঃ বীটের মতই গাজরের বীজও সহজে অংকুরিত হয় না, বপনের পর প্রায় সপ্তাহ খানেক লাগে। গাজর বীজ 45 সেঃ মিঃ দূরত্বে সারিতে লাগানো হয়। বীজ মাটির 1.5—2 সেঃ মিঃ গভীরে বপন করা উচিত। এক হেক্টর জমির জন্য 5-6 কেজি বীজ লাগে। সরাসরি জমিতে লাগালে, পরে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব 10 সেঃ মিঃ রেখে পাতলা করে দেওয়া হয়।

সাধারণত, জাত অনুযায়ী, আগষ্ট থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে বীজ বপন করা যেতে পারে। পাহাড়ী অঞ্চলে অবশ্য মার্চ থেকে জুলাই মাসের মধ্যে বীজ বপন করা হয়।

মাধ্যমিক পরিচর্যা ও সেচ ঃ গাজর সারিতে লাগানো হলেও গাছ থেকে গাছের দূরত্ব কম থাকলে পাতলা করে-দেওয়া হয়। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব কম পক্ষে 10 সেঃমিঃ রাখা বাঞ্ছনীয়। এছাড়া লক্ষ্য রাখতে হবে জমি যেন পরিষ্কার থাকে। প্রয়োজনে আগাছা দমনের জন্য রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বীজ বোনার সময় জমিতে রস থাকা বাঞ্ছনীয়। এর পর 20 দিনের মাথায় সেচ দিলে ভাল হয়। অবশ্য চাপান সার দেওয়ার পর সেচ দিতে হবে। সাধারণভাবে 10-15 দিন অন্তর সেচ দেওয়া চলে। তবে কেনে সময়ই প্রয়োজনের বেশী সেচ দেওয়া উচিত নয়, তাহলে মূল বড় না হয়ে গাছ বড় হয়ে যাবে। গাজর তোলার আগে হালকা সেচ দিলে এগুলি তুলতে সুবিধা হয়।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন ঃ মূল পূর্ণ আকৃতির হলে জমি থেকে গাজর সংগ্রহ করা হয়। সাধারণত হাতে টেনে গাজর সংগ্রহ করা হলেও কোদাল বা খুরপির সাহায্যে পাশের মাটি আলগা করে এগুলি সংগ্রহ করা যায়। গাজরের হেক্টর প্রতি ফলন 20-30 টনের মধ্যে সীমিত।

চতুর্দশ অধ্যায়

কুমড়োজাতীয় লতানে গাছ

কুমড়ো গোত্রীয় গাছগুলি প্রায় সবই লতানো। এই গোত্রে এত বৈচিত্র-পূর্ণ গাছ ভারতীয় উপমহাদেশের আবহাওয়াতে হতে দেখা যায় যার তুলনা অন্য কোথাও মেলা ভার। দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব সব্জীগুলিই উষ্ণ আবহাওয়াতে হতে দেখা যায়। 24°—30° সেঃ গ্রেঃ তাপমাত্রায় এগুলি ভাল হয়। শশা, খরমুজ, চালকুমড়ো, চিচিঙ্গা, কুঁদরী, উচ্ছে ও করলা, ইত্যাদি এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এগুলির বীজে বেশ শক্ত বহিরাবরণ দেখা যায়। এদের চাষ পদ্ধতিও প্রায় একই রকম। এগুলির ফল সংরক্ষণ, বীজ উৎপাদন, আগাছা দমন ও শস্য রক্ষা পদ্ধতি আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

শশা :

জাতপ্রকরণ : সিকিম, বালাম খিরা, গোল খিরা, পুনা খিরা ইত্যাদি বহু স্থানীয় জাত প্রকরণ দেখা গেলেও জাপানীজ লং গ্রীণ, পুষা সংযোগ, স্ট্রেট এইট, এই তিনটি উচ্চ ফলনশীল বলে স্বীকৃত। বিভিন্ন প্রচলিত শশার জাতগুলিকে ইউরোপীয়, পশ্চিম এশীয়, ভারতীয় ও চৈনিক এই চার ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলির মধ্যে চৈনিক জাতটি আকারে বেশ বড় হয় এবং এর রঙও উজ্জ্বল সবুজ।

আবহাওয়া ও মাটি : শশা চাষের জন্য 18°—24° সেঃ গ্রেঃ তাপমাত্রা দরকার হয়। তবে তাপ 11° সেঃ গ্রেঃ নীচে নেমে গেলে বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার সম্ভবনা নাই। শীতকালে বীজে কল বের হলেও, ফল পাওয়ার জন্য কম পক্ষে 18° সেঃ গ্রেঃ তাপমাত্রা দরকার।

শশা চাষের জন্য সব থেকে ভাল মাটি বেলে দোঁয়াশ। তবে বিভিন্ন ধরনের মাটিতে শশা চাষ হতে দেখা যায়। মাটির অম্লতা 5·5 পি, এইচ এর কম হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। নিষ্কাষণী ব্যবস্থা ভাল হওয়া চাই। মোটা মাটিতে শশার ফলন ভাল হয়।

জমি তৈরী, সার প্রয়োগ ও বীজ বপন : বার চারেক চাষ ও মই দিয়ে জমির মাটি ঝুরঝুরে করে নেওয়া হয়। আগাছা বাছা সম্পূর্ণ করে নিয়ে হেক্টর প্রতি 30—40 টন জৈবসার, 20 কেজি ইউরিয়া বা সমপরিমাণ অন্য কোন নাইট্রোজেন ঘটিত সারও 100 কেজি সুপার ফসফেট প্রয়োগ করে পুনরায় চাষ দিয়ে মাটিতে

মিশিয়ে নেওয়া হয়। এরপর দাঁড় দিয়ে সারি করে $1\frac{1}{2}$ মিটার অন্তর অন্তর নালা কাটা হয়। দুটি নালার মধ্যবর্তী জমি, কিছু ঢালু থাকতে পারে। এখন নালা থেকে 50 সেঃ মিঃ ভিতরে $\frac{1}{2}$ (আধ) মিটার অন্তর নালার দুইদিকে মাদা তৈরী করা হয়। প্রতিটি মাদায় 4—6টি বীজ বোনা হয়। অনেক সময় বীজগুলি অঙ্কুরিত করে বা এগুলির কল বের করেও লাগানো হয়। এভাবে লাগালে সেচ দেওয়ার ও শশা গাছ মধ্যবর্তী জমিতে লতিয়ে যাওয়ার সুবিধে হয়। এভাবে বীজ বপন করলে হেক্টর প্রতি প্রায় 2—3 কেজি বীজ লাগবে। সাধারণত জানুয়ারী থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত বীজ বোনা হয়।

সেচ ও মাধ্যমিক পরিচর্যা ঃ শীত ও গরমকালে 7—10 দিন অন্তর সেচ দেওয়া দরকার হয়। বর্ষাকালে সেচ ত লাগেই না বরং নিষ্কাষণী ব্যবস্থা করা দরকার হয়।

নিড়ানী দিয়ে জমি পরিষ্কার রাখতে হবে। এছাড়া 3—4 সপ্তাহ পর, সব বীজ অঙ্কুরিত হলে, মাদা পিছু 3টি গাছ রেখে, অন্য গাছগুলি তুলে ফেলা হয়।

ফল সংগ্রহ ও ফলন ঃ কাঁচা খাওয়ার জন্য শশা পাকানো হয় না। তবে রান্না করে খেতে হলে কিছু পাকিয়ে নেওয়া ভাল। কাজেই সবুজ থাকতেই শশা তুলে ফেলা হয়। জমিতে লক্ষ্য রেখে মাঝে মাঝেই শশা তুলে নেওয়া হয়। একবার সংগ্রহ আরম্ভ হলে 4—5 দিন অন্তর অন্তর ফল তুলতে হয়। শশার ফলন খুব খারাপ নয়। গড়ে হেক্টর পিছু 12—15 টন ফলন আশা করা যায়।

খরমুজ ঃ

জাতপ্রকরণ ঃ খরমুজের দু রকম বহিরাবরণ দেখা যায়। কিছু ফলের বহিরাবরণে জালের মত দাগ থাকে। এগুলির খোসা মোটা ও সংরক্ষণের পক্ষে বেশ উপযোগী। এগুলিকে ইউরোপ ও আমেরিকায় ক্যাণ্টালুপ বলে। অন্য গুলির বহিরাবরণ মসৃণ, এগুলিকে খরমুজ বলে। খরমুজের নানান জাত দেখা যায়। এগুলির মধ্যে পুষা সরবতী, আর্কা জিত, আর্কা রাজহংস, লাক্ষ্মৌ সাফেদা, ফইজাবাদী, অমৃতসরী, হরমধু, দুর্গাপুর মধু, ও টঙ্ক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সারদা বলে একটি খরমুজ অক্টোবর নভেম্বর মাসে ভারতে চালান আসে। এটি শুধু মিষ্টিই নয়, সুগন্ধযুক্ত ও সংরক্ষণ গুণ সম্পন্ন। ভারতে এটির চাষ প্রচলিত করার চেষ্টা চলছে। পুষা মধুরস ও পাঞ্জাব হাইব্রীড জাত দুটিও উন্নত জাত।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ শুকনো, উষ্ণতাপযুক্ত আবহাওয়াতে তরমুজ ভাল হয়। আর্দ্র আবহাওয়া তরমুজ চাষের অনুপযুক্ত। 30° সেঃ গ্রেঃ এর কম তাপে তরমুজ চাষ হয় না।

অল্প অম্ল থেকে অল্প ক্ষার বালী মাটিতে তরমুজের চাষ হয়। তবে নদীর শুকনো চরে বা পলি মাটিতে তরমুজের চাষ হতে পারে।

জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ ঃ শশার মতই জমি তৈরী করে, প্রাথমিক ভাবে হেক্টর প্রতি 120 কেজি ইউরিয়া, 100 কেজি সুপার ফসফেট, 200 কেজি পটাশ সালফেট, 100 কেজি কলিচুন, 32 কেজি ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ও প্রয়োজনীয় জৈবসার মাটির সাথে মিশিয়ে নেওয়া হয়।

বীজ বপন ঃ শশার মতই নালার দুধারের সারিতে নির্দিষ্ট দূরত্ব নির্দ্ধারিত করে মাদায় বীজ লাগানো হয়।

স্থানানুয়ায়ী তরমুজ বীজ নভেম্বর—মার্চ মাসের মধ্যে লাগানো যেতে পারে। পাহাড়ী এলাকাতেও মে মাস পর্যন্ত বীজ লাগানো হয়। বীজ লাগানোর আগে ভিজিয়ে বা কল বের করে নেওয়া উচিত। এক হেক্টর জমিতে প্রায় দেড় কিলো বীজ লাগে।

মাধ্যমিক পরিচর্যা ও সেচ ঃ বালি মাটি বা নদীর শুকনো চরে কোন মাধ্যমিক পরিচর্যা বা সেচ লাগে না। জমিতে চাষ করলে, প্রথম অবস্থায়, প্রয়োজন মত সেচ দিতে হয়। তবে ফল ধরতে আরম্ভ করলে বা পুষ্ট হয়ে গেলে সেচ দেওয়া উচিত নয়।

নিড়ানী দিয়ে জমি পরিষ্কার রাখা, অতিরিক্ত চারা মাদা থেকে তুলে ফেলা বা ঢাকা দিয়ে জমির রস সংরক্ষণ ও আগাছা দমন এগুলিই মাধ্যমিক পরিচর্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

ফল সংগ্রহ ও ফলন ঃ খরমুজ পেকে গেলেই তুলে নিতে হবে। বাইরের খোসার রঙ ও বোঁটার কাছে চিরচিরে ফাটা দাগ দেখলে ফল তোলার মত হয়েছে ধরা যায়। এছাড়া ফল পেকে গেলে গন্ধ ছড়াবে। লতা থেকে ফল সহজেই আলাদা করা যাবে।

খরমুজের জাত ও আবহাওয়া অনুযায়ী হেক্টর প্রতি 10—15 টন ফলন হতে দেখা যায়।

এখানে আরো দুটি সব্জী, ফুটি ও কাঁকর বা কাঁকরীর উল্লেখ করা দরকার। পুষ্ট ও কাঁচা অবস্থায় ফুটি রান্না করে ও পাকা অবস্থায় ফল হিসাবে ব্যবহার

করা হয়। পেকে গেলে ফেটে যায় বলেই বোধ হয় ফুটি নামটি এসেছে। ফুটির বাঙ্গী, ইত্যাদি কয়েকটি জাত গ্রামের দিকে দেখা যায়। চাষ খুব প্রচলিত না হওয়ায় বাজারে সচরাচর দেখা যায় না।

কাঁকরী খেলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। ফলগুলি বেশ লম্বা তবে বাঁকানো ও সবুজ রঙের। কাঁচ অবস্থায় লবণ, গুড়ো লংকা ইত্যাদি মাখিয়ে খাওয়া যায়। আর পুষ্ট হলে তরকারী হিসাবে খাওয়া হয়। এটি ফুটির চেয়েও বেশী পরিচিত। বাইরের খোসার রঙ দেখে কিছু স্থানীয় জাত চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সব্জীটির ফলন মন্দ নয়। হেক্টরে প্রায় 10—20 টন ফলন পাওয়া যায়।

তরমুজ :

জাতপ্রকরণ : তরমুজের বেশ কয়েকটি দেশী ও বিদেশীজাত ভারতীয় আবহাওয়াতে ভালই ফলন দেয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পুষা রসাল, পুষা বেদানা, কাটাগোলা, সুগার বেবী, আশাহি, ইমাটোও, নিউহ্যামসায়ার মিজেট ইমপ্রুভড সিপার, পাঞ্জাব সিলেকসন, দুর্গাপুর মিঠা, আর্কা মানিক ইত্যাদি।

আবহাওয়া ও মাটি : তরমুজের চাষ করতে হলে মোটামুটি 22°—25° সেঃ গ্রেঃ তাপমাত্রা দরকার হয়। তরমুজ চাষে সময়ও লাগে বেশ লম্বা। তাই তরমুজ চাষের সময়, বিশেষত ফল ধরার সময় এই উষ্ণতা বজায় থাকলে ভাল। তবে এ সময় আদ্রর্তা খুব বেশী থাকলে ফল পচে যায় এবং স্বাদ পানসা লাগে।

কিছুটা অম্ল মাটিতেও তরমুজ চাষ করা যায়। তবে মাটি হালকা হওয়া বাঞ্চনীয়। জমি উঁচু হবে কিন্তু ভুগর্ভস্থ জলস্তর মূলের কাছাকাছি থাকবে।

জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ : হেক্টর প্রতি 30—35 টন জৈবসার, 100 কেজি ইউরিয়া, 225 কেজি সুপার ফসফেট ও 100 কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ মাটিতে মিশিয়ে খরমুজের মতই জমি তৈরী করা হয়। পরে অবশ্য 50—60 কেজি ইউরিয়া চাপান হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া পাতায় প্রয়োজন মত 2 নিযুতাংশ সোহাগা ও মলিবডেনাম এবং 20 নিযুতাংশ কলিচুন ছড়ালে উপকার পাওয়া যায়।

বীজবপন : তরমুজের মতই সারি করে মাদায় বীজ বপন করা হয়। প্রতিটি মাদায় 3—4টি বীজ দেওয়া হয়। কল বের করে বীজ বুনলে ভাল হয়। মাদার দূরত্ব শশার থেকে বেশী, প্রায় 3—4 মিটার, রাখা হয়। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বীজ বোনা হয়। হেক্টর প্রতি প্রায় 2—2½ কেজি বীজ হলেই যথেষ্ট।

মাধ্যমিক পরিচর্যা ও সেচ ঃ খরমুজের মতই জমি পরিষ্কার রাখা ও সেচ দেওয়া দরকার। নদীর চরে বা বালিতে তরমুজ লাগালে সেচ ও নিড়ানী লাগে না। তবে এক্ষেত্রে প্রতিটি মাদায় কম করে 5—10 কেজি জৈবসার দিয়ে বীজ লাগানো উচিত।

মাদা পিছু 2—3টি গাছ রেখে দেওয়া হয়। ফল ধরতে আরম্ভ করলে, ফল বেশী থাকলে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এতে ফলের আকার বড় হয়। কাদা মাটিতে চাষ করলে ফলের তলায় ঠেকা দিলে ফল পচার ভয় থাকে না।

স্ত্রী ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি ও ফল ধরা নিশ্চিত করতে গাছে 25—30 নিযুতাংশ টিবা (TIBA) ছড়ালে প্রায় 50% বেশী ফলন পাওয়া যায়।

ফল সংগ্রহ ও ফলন ঃ ফল পেকে গেলে, আঙ্গুল দিয়ে টোকা মারলে, ঢপঢপ শব্দ করে। কিন্তু অপুষ্ট ফলে ধাতব শব্দ হবে। এছাড়া মাটি স্পর্শকারী তরমুজের বহিরাবরণের রঙ সবুজ থাকে সাদা ও পরে হলদে হয়ে গেলে বুঝতে হবে ফল সংগ্রহ করার মত হয়েছে। অবশ্য পুষ্ট ফল দুহাতের তালুতে রেখে চাপ দিলে মৃদু কড়কড় আওয়াজ করবে।

তরমুজের ফলন হেক্টর প্রতি প্রায় 25—35।

মিষ্টি কুমড়ো ঃ

মিষ্টি কুমড়োর তিনটি ভাগ দেখা যায়, এগুলির মধ্যে একটি কুমড়ো, অন্যটি বিলিতি কুমড়ো, ও তৃতীয়টি সীতাফল। প্রতিটির আকৃতি, রঙ, স্বাদ ও চাষের সময় আলাদা।

জাতপ্রকরণ ঃ উন্নত জাতপ্রকরণগুলির নাম নিচে দেওয়া হলো—

কুমড়া ঃ আরলি ইয়োলো প্রলিফিক, অস্ট্রেলিয়ান গ্রীণ বাটার নাট ইত্যাদি বাইরের প্রজাতি।

বিলিতি কুমড়া ঃ গ্রীণ হবার্ড, গোল্ডেন হাবার্ড, ব্লু হাবার্ড, প্রভৃতি আমেরিকান প্রজাতি।

সীতাফল ঃ আর্কা চন্দন, আর্কা সূর্যমুখী, পুষা অলংকার, পুষা বিশ্বাস, সি, এম—14, ইত্যাদি ভারতীয় প্রজাতি।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ মোটামুটি উষ্ণ অঞ্চলের সব্জী। বিলিতি কুমড়ো ও সীতাফল সমতলে শীতকালে ও পাহাড়ে গরমকালে চাষ করা হয়। তবে গরমকালেই কুমড়ো চাষ বেশী দেখা যায়।

যে কোন মাটিতেই কুমড়ো চাষ হতে পারে। তবে বালিতে ফসল ভাল হয় না। উচু জমি হলে ভাল হয়।

জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ ঃ মাদায় বীজ লাগানোর আগে হেক্টর প্রতি 30—35 টন জৈবসার মিশিয়ে জমি তৈরী করা হয়। দেড় মাস পরে 40 কেজি ইউরিয়া চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করা হয়।

বীজ বপন ঃ তরমুজের মতই মাদায় 3—4টি অঙ্কুরিত বীজ লাগানো হয়। হেক্টর প্রতি 7—8 কেজি বীজ লাগে। জাত অনুযায়ী বছরে দুবার, ডিসেম্বর-জানুয়ারী ও জুন-জুলাই মাসে কুমড়ো লাগানো চলে।

মাদা থেকে মাদার দূরত্ব এক মিটার রাখা উচিত। নালা থেকে নালার দূরত্ব হবে 3 মিঃ।

মাধ্যমিক পরিচর্যা ও সেচ ঃ প্রয়োজন অনুসারে প্রথম অবস্থায় 7—10 দিন অন্তর সেচ দেওয়া হয়। গাছ ছড়িয়ে গেলে, মাটি ঢাকা পড়ে। তখন সেচ দেওয়া বা নিড়ানী দেওয়া দরকার হয় না। বেরোবার পর, মাদায় গাছ বেশী থাকলে, 2টি রেখে বাকীগুলি তুলে ফেলা হয়।

ফল সংগ্রহ ও ফলন ঃ সীতা ফল জমিতে পাকিয়ে তোলা হয়। এগুলির বহিরাবরণ হলদে হয়ে আসলে তুলে ফেলা উচিত। ফলগুলি বেশ কিছুদিন গুদামজাত করা যায়। অন্যগুলির ফল, কাঁচা থাকতেই তোলা হয়। পরিপূর্ণ আকৃতি এসে গেলেই সংগ্রহ করা হয়। ঐগুলি বেশী দিন গুদামজাত করা যায় না।

প্রকার অনুযায়ী কুমড়োর ফলন হেক্টর প্রতি 10—35 টন এর মধ্যে অন্য দুটি উপজাতি অপেক্ষা সীতাফলের ফলন ভাল।

লাউ ঃ

নানান আকৃতির লাউ দেখা যায়। মোটামুটি আকৃতি ও চাষের সময় অনুযায়ী বিভিন্ন জাতগুলির সৃষ্টি হয়েছে। উন্নত জাতগুলির মধ্যে পুষা সামার প্রলিফিক লং, পুষা সামার প্রলিফিক রাউন্ড, পুষা মেঘদূত (লম্বা), পুষা মঞ্জরী (গোল) ও পুষা নবীন, ইত্যাদির নাম করা যায়।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ উষ্ণ মণ্ডলীয় সব্জী, তবে ঋতু অনুযায়ী শ্রেণী ভাগ করা হয়েছে। গরমকালে গাছের বৃদ্ধি এবং শরৎ, হেমন্ত ও শীতকালে ফল হতে দেখা যায়।

যেকোন মাটিতেই লাউ হতে পারে। তবে জমি উচু হওয়া দরকার এবং মোটামুটি না-অম্ল ক্ষার মাটিতে ভাল হয়।

বীজ বপন ঃ লাউ-এর মাদা থেকে মাদা ও জমির নালা থেকে নালার দূরত্ব মিষ্টি কুমড়োর মতই। সাধারণত ফেব্রুয়ারী-মার্চ, জুন-জুলাই এবং অক্টোবর-নভেম্বর বছরে তিন বার লাউ লাগানো চলে। হেক্টর প্রতি 7-8 কেজি বীজ লাগে। প্রায়শই বাড়ীর হাতায় 2-1টি গাছ লাগিয়ে ছাদে বা চালে তুলে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট দূরত্ব রাখা হয় না। মাচা করে দিলে ভাল হয়। না হলে দক্ষিণ ভারতের মতই জমিতে লাউ চাষ করা যায়।

সার, সেচ প্রয়োগ ও মাধ্যমিক পরিচর্যা ঃ লাউ-এর সারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা না হলেও, হেক্টর পিছু 40—50 টন জৈবসার, 300—350 কেজি সুপার ফসফেট ও 100 কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করা উচিত। মোট ইউরিয়ার অর্দ্ধেকটা অবশ্য গাছ বের হওয়ার দেড়মাস বাদে চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া যথাক্রমে 2—3 নিযুতাংশ সোহাগা ও কলিচুন জলীয় দ্রবণে পাতায় ছড়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

প্রথম অবস্থায় প্রয়োজনমত 7—10 দিন অন্তর সেচ লাগে। গাছ বড় হয়ে গেলে সেচের পরিমাণ ও ক্রমে কমে যায়। অনেক সময় প্রয়োজন হয় না।

প্রথমদিকে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে দেওয়া হয়, পরে আর দরকার হয় না।

গাছের 2 পাতা ও 4 পাতা অবস্থায় 50 নিযুতাংশ হারে জলীয় দ্রবণে ম্যালিক হাইড্রাজাইড বা টিবা (TIBA) পাতায় প্রয়োগ করলে স্ত্রী ফুল বেশী আসে ও ফলন বেড়ে যায়।

ফল সংগ্রহ ও ফলন ঃ লাউ নরম থাকতে থাকতেই সংগ্রহ করা হয়। নরম লাউ সব্জী হিসাবে উপযুক্ত। শক্ত লাউ পেঠা তৈরী ও তানপুরার খোলের জন্য ব্যবহৃত হয়। সব্জী হিসাবে ব্যবহৃত লাউ-এর ফলন প্রতি হেক্টরে 15—20 টন।

ঝিঙে, উচ্ছে, ধুঁধুল ও চিচিঙে ঃ

জাতপ্রকরণ ঃ সব্জী চারটির উন্নত জাতগুলি নিচে দেওয়া হল ঃ

ঝিঙে ঃ পুষা নাসদার, সাত পুতিয়া ইত্যাদি।

উচ্ছে ঃ পুষা দোসশুমী, কল্যাণপুর বারমাসী, কোয়েম্বাটুর লং, আর্কা-হরিৎ ইত্যাদি।

ধুঁধুল ঃ পুষা চিকনী ইত্যাদি।

চিচিঙে ঃ কোয়েম্বাটুর সিলেকশন, পুনা সিলেকশন ইত্যাদি।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ার ফসল। গরম ও বর্ষাকালে ভাল হয়। উচ্ছে শীতকালে হলেও ফলন কমে যায়।

যে কোন ধরনের মাটিতেই এগুলি হাত পারে, তবে বেলে-দোয়াঁশ উৎকৃষ্ট। নদীর চড়ায় বা পলি মাটিতেও উৎকৃষ্ট ফলন পাওয়া যায়। মাটির বেশী অম্ল বা ক্ষার হওয়া বাঞ্জনীয় নয়। জমির নিষ্কাষণী ব্যবস্থা ভাল থাকবে ও জল দাঁড়ানো চলবে না।

জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ ঃ জমি তৈরীর সময় 20—40 টন জৈবসার দিয়ে শশা চাষের মত জমি তৈরী করতে হবে। গাছ একটু বড় হলে, অর্থাৎ অংকুরিত হওয়ার দেড় থেকে দুমাস বাদে হেক্টর প্রতি 100 কেজি ইউরিয়া চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করা হয়।

বীজ বপন ঃ প্রাক্ গ্রীষ্মকালের ফসলের জন্য নভেম্বর-ডিসেম্বর, গ্রীষ্মকালীন সব্জীর জন্য ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল ও বর্ষাকালীন ফসলের জন্য মে-জুলাই মাসে শশার মতই মাদায় বীজ বপন করা হয়।

ঝিঙে বপনের জন্য হেক্টর প্রতি 5—7 কেজি বীজ, উচ্ছে ও চিচিঙার জন্য 8—10 কেজি বীজ ও ধুঁধুলের জন্য 4—5 কেজি বীজ লাগে। অঙ্কুরিত করে বীজ লাগানো উচিত। নির্দিষ্ট তাপমাত্রা (27° সেঃ গ্রেঃ) পেলে 7 দিনের মধ্যেই চারা বেরিয়ে যাবে।

সেচ ও মাধ্যমিক পরিচর্যা ঃ প্রথম অবস্থায় 7—10 দিন অন্তর দুই একটা সেচ দরকার হতে পারে। গাছ বড় হয়ে গেলে সেচ দেওয়ার দরকার হয় না। মাচা করে দিলে বেশী ফলন পাওয়া যায়। জমিতেও গাছ লতিয়ে যেতে দেওয়া হয়। মাচা না করলে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে, প্রথম অবস্থায়, একটা নিড়ানী দেওয়া দরকার। ভাল ফলনের জন্য শেকড়ের গোড়ার মাটি ঝুর ঝুরে রাখা বাঞ্জনীয়।

এই সব্জীগুলিতেও আগের মত (হরমোন মৌলিক হাইড্রাজাইড ও টিবা) প্রয়োগ করে ফলন বাড়ানো যেতে পারে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন ঃ ফলের পূর্ণ আকৃতি এসে গেলেই সংগ্রহ করা হয়। বেশী পুষ্ট হয়ে গেলে বা পেকে গেলেই খাবার অযোগ্য হয়ে যায়। প্রায় একদিন অন্তর ফল তোলা হয়। সময়মত ফল না তুললে ফলন কমে যায়। ঝিঙে, ধুঁধুল, ও চিচিঙের ফলন উচ্ছের ফলন থেকে বেশী। হেক্টরে প্রায় 15—25 টন। উচ্ছের ফলন হেক্টরে 10—15 টন।

এই সব্জীগুলির বীজেরও চাহিদা আছে। বীজ উৎপাদন করতে হলে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে হেক্টর 1—1½ ক্যুইণ্টাল বীজ উৎপাদন করা যায়। বীজ উৎপাদন পদ্ধতি সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

চাল কুমড়ো ও টিণ্ডা

জাতপ্রকরণ ঃ চাল কুমড়োর বিশেষ কোন উন্নত জাত নেই। একমাত্র কোয়েম্বাটোর ওয়ান-এর উল্লেখ করা যায়। আর্কা টিণ্ডা জাতটি টিণ্ডার উন্নত জাত।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ গ্রীষ্মকালীন ফসল, মার্চ থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত বীজ লাগানো যায়। যে কোন মাটিতে এগুলির চাষ করা গেলেও, বেলে দোয়াঁশ ও পলি মাটি উৎকৃষ্ট। মাটির অন্যান্য প্রয়োজনীয় গুণাগুণ ঝিঙের মতই হওয়া দরকার।

জমি তৈরী ও বীজ বপন ঃ জমি তৈরী ও বীজ বপনের পদ্ধতি শশার মত। বীজ বপনের সময় আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। হেক্টর প্রতি প্রায় 5—6 কেজি বীজ লাগে। বীজ অঙ্কুরিত করে বপন করা হয়।

সার, সেচ প্রয়োগ ও মাধ্যমিক পরিচর্যা ঃ সার ও সেচ প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে বিশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষা না হলেও হেক্টর প্রতি 40—50 টন জৈবসার 350 কেজি ইউরিয়া চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করা যায়।

প্রয়োজন মত প্রথম অবস্থায় দু একটা সেচ লাগতে পারে তবে পরে, আর সেচ দেওয়ার দরকার হয় না।

লাউ ও মিষ্টি কুমড়োর মতই মাধ্যমিক পরিচর্যা করা উচিত।

ফল সংগ্রহ ও ফলন ঃ সব্জী হিসাবে ব্যবহারের জন্য ফলের বহিরাবরণ শক্ত হওয়ার আগেই অর্থাৎ অপুষ্ট ফল সংগ্রহ করা হয়। সম্পূর্ণ পুষ্ট হলে বা পেকে গেলে, বহিরাবরণ শক্ত হয়ে যায় ও সাদা চুনের প্রলেপের মত পড়ে। এগুলি পেঠা তৈরীর জন্য ব্যবহার করা হয়। সব্জী দুটির ফলন হেক্টর প্রতি 10—12 টন হতে দেখা যায়।

পটল ঃ

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে, পূর্ব ভারত বা বাংলাদেশে পটল একটি গুরুত্বপূর্ণ সব্জী। পটলের উৎপত্তিও সম্ভবত পূর্ব ভারতের অন্তর্বর্তী কোন অঞ্চলে। পটলের ফল এবং লতা ভেষজ গুণে ভরপুর ও স্বাস্থ্যপ্রদ। মূল বিষাক্ত।

জাতপ্রকরণ ঃ লম্বা, গোল, বেঁটে নানাধরনের ফল দেখা যায়। কখনো ফলের আকৃতি বা স্থানের নাম অনুসারে জাত-প্রকারের নামকরণ হয়েছে। জাতগুলির মধ্যে সুজি, কাজলী, বোম্বাই, দামোদর, আমড়া ঝাটি, ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ সম্পূর্ণ উষ্ণ ও আর্দ্র মণ্ডলীয় শস্য। দক্ষিণা বাতাস বা মৌসুমী বায়ু বইলে, ফুল ধরতে আরম্ভ করে। শরৎকাল পর্যন্ত ফলন দেয়। সাধারণত উঁচু পলি বা বেলে দোয়াঁশ মাটি পটল চাষের উপযোগী। অম্ল মাটিতে পটল চাষ হয় না। মাটির পি-এইচ 6·5 কম হলে পটল ভাল হবে না।

জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ ঃ শশার মতই জমি তৈরী করা বাঞ্ছনীয়। সাধারণত 30—40 টন জৈবসার দিয়ে মূল লাগিয়ে দেওয়া হয়। পরে গাছ বের হলে, হেক্টর প্রতি 100 কেজি ইউরিয়া দুইবারে চাপান সার হিসাবে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করা হয়।

মূল রোপণ ও সেচ ঃ মূল, লতা, বা বীজ যে কোনটির মাধ্যমে পটল গাছ তৈরী করা যায়। স্ত্রী গাছের মূল সংগ্রহ করে 2-3 মিঃ অন্তর সারিতে লাগানো হয়। প্রায় 100 কেজি মূলের দরকার এক হেক্টর জমির জন্য। লতা লাগলে 20—30 সেঃ মিঃ লতার টুকরোয় প্রথমে শেকড় করে নিতে হয়। পরে নির্দিষ্ট দূরত্বে এগুলি লাগানো হয়। সংখ্যায় 1000—2000 বা ওজনে 100 কেজি এ রকম লতা হলে এক হেক্টর জমি চাষ করা চলে। বীজের সাহায্যেও গাছ তৈরী করা যায়। 20—25 কেজি বীজ এক হেক্টর জমি চাষ করার জন্যে যথেষ্ট। তবে বীজের সমস্যা হচ্ছে এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক গাছ হবে পুরুষ ও অর্ধেক গাছ হবে স্ত্রী। এবং যেহেতু কেবল স্ত্রী গাছেই পটল ধরে সেই হেতু পুরুষ গাছগুলি তুলে ফেলতে হবে। আবার পরাগ সংযোগ না হলে ফল টিকবে না এবং পটলের স্ত্রী ও পুরুষ গাছ আলাদা, তাই শতকরা দুই থেকে পাঁচ ভাগ পুরুষ গাছ রাখা বাঞ্ছনীয়। এছাড়া বীজের গাছ খুব দুর্বল হয় ও প্রথম বছরে ফুল বা ফল আসে না।

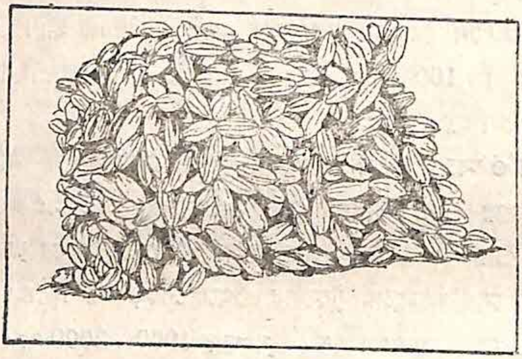
সাধারণত অক্টোবর 15 থেকে নভেম্বর 15 তারিখের মধ্যে জমিতে পটল গাছ লাগাতে হয়। ফেব্রুয়ারী—মে মাসের মধ্যে বৃষ্টি না হলে প্রয়োজন মত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

মাধ্যমিক পরিচর্যা ঃ জমিতে বা মাচায় পটলের লতা হতে পারে। তবে

জমিতে লাগালে প্রতিটি গাঁট থেকে শেকড় বেরিয়ে গাছ সতেজ ও বেশী উৎপাদন-ক্ষম হয়।

জমি সম্পূর্ণ ঢেকে না যাওয়া পর্যন্ত 2—3টি নিড়ানী দিয়ে জমি পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। লতায় জমি ঢেকে গেলে নিড়ানী বা সেচের দরকার হয় না। যেহেতু ইতর পরাগ সংযোগে ফল উৎপন্ন হয় এবং পরাগ সংযোগের মূল মাধ্যম পতঙ্গ, তাই পোকার আক্রমণ ঠেকানোর জন্য হিসাবমত ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত। যাতে পোকাও মরে এবং পরাগ সংযোগ ব্যাহত হয় না।

ফল সংগ্রহ ও ফলন : ফল পরিপূর্ণ আকৃতি পেলে ও পুষ্ট হলে প্রায় রোজই সংগ্রহ করা উচিত। পেকে হলদে হয়ে গেলে বাজারে দাম পাওয়া যায় না।



চিত্র 8 : সংগৃহিত কাজলী জাতের পটল।

জাতের তারতম্য অনুসারে 20—30 টন ফল এক হেক্টর জমি থেকে আশা করা যায়।

এগুলি ছাড়াও কাঁকরোল, কুঁদরী, স্কুয়াস-এর চাষ কিছু কিছু অঞ্চলে দেখা যায়। প্রথম দুটি সমতলে পটলের মতই চাষ করা যায়। শেষোক্তটি পাহাড়ে শশার মত চাষ করা হয়। আলোচ্য প্রায় সব সব্জীরই লতা, শাক হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। কুমড়োর ফুলও সব্জী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বাল্ব জাতীয় সব্জী

পেঁয়াজ, রসুন, লিক ইত্যাদি বাল্ব জাতীয় সব্জীর অন্তর্গত। পূর্ব ভারত বা বাংলাদেশের দিকে লিকের চাষ হতে দেখা যায় না। এগুলি কাঁচা অবস্থায় সব্জী হিসাবে ব্যবহৃত হলেও আসল ব্যবহার মশলা হিসাবে। এগুলির বীজ উৎপাদন, আগাছা দমন, শস্য রক্ষা ও গুদামজাতকরণ পদ্ধতি আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

পেঁয়াজ :

জাতপ্রকরণ : পেঁয়াজের জাতগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়। সাধারণ পেঁয়াজ ও ছাঁচি পেঁয়াজ। ছাঁচি পেঁয়াজের চাষ খুব সীমিত। এগুলির বীজ হয় না। পেঁয়াজ লাগিয়েই গাছ তৈরী করা হয়। সাধারণ পেঁয়াজের কতকগুলি উন্নত জাত দেখা যায়। পুষা রেড, পুষা রত্নার, এন-2-4-1, লাইন-102, আর্কা নিকেতন, এন-257-9-1, আরলি গ্রানো, পাঞ্জাব সিলেকশন, পাটনা রেড, হিসার II, উদয়পুর 101, উদয়পুর 102, উদয়পুর 103 ইত্যাদি শীতকালে খুব ভাল হয়। এছাড়া নাসিক থেকে এন-53 (N-53) বলে একটি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে, যেটি গরমকালেও চাষ করা চলে। সাদা পেঁয়াজের মধ্যে পুষা হোয়াইট রাউন্ড, পুষা হোয়াইট ফ্ল্যাট, এম—48, ও আর্কা কল্যাণ ইত্যাদির নাম উন্নত জাত হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

আবহাওয়া ও মাটি : জাতের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন আবহাওয়ার প্রয়োজন হলেও পেঁয়াজ মূলত শীতকালীন সব্জী। তবে পেঁয়াজের বাল্ব বড় হওয়া ও ফুল আসার জন্য বেশী তাপ ও আলোর দরকার হয়।

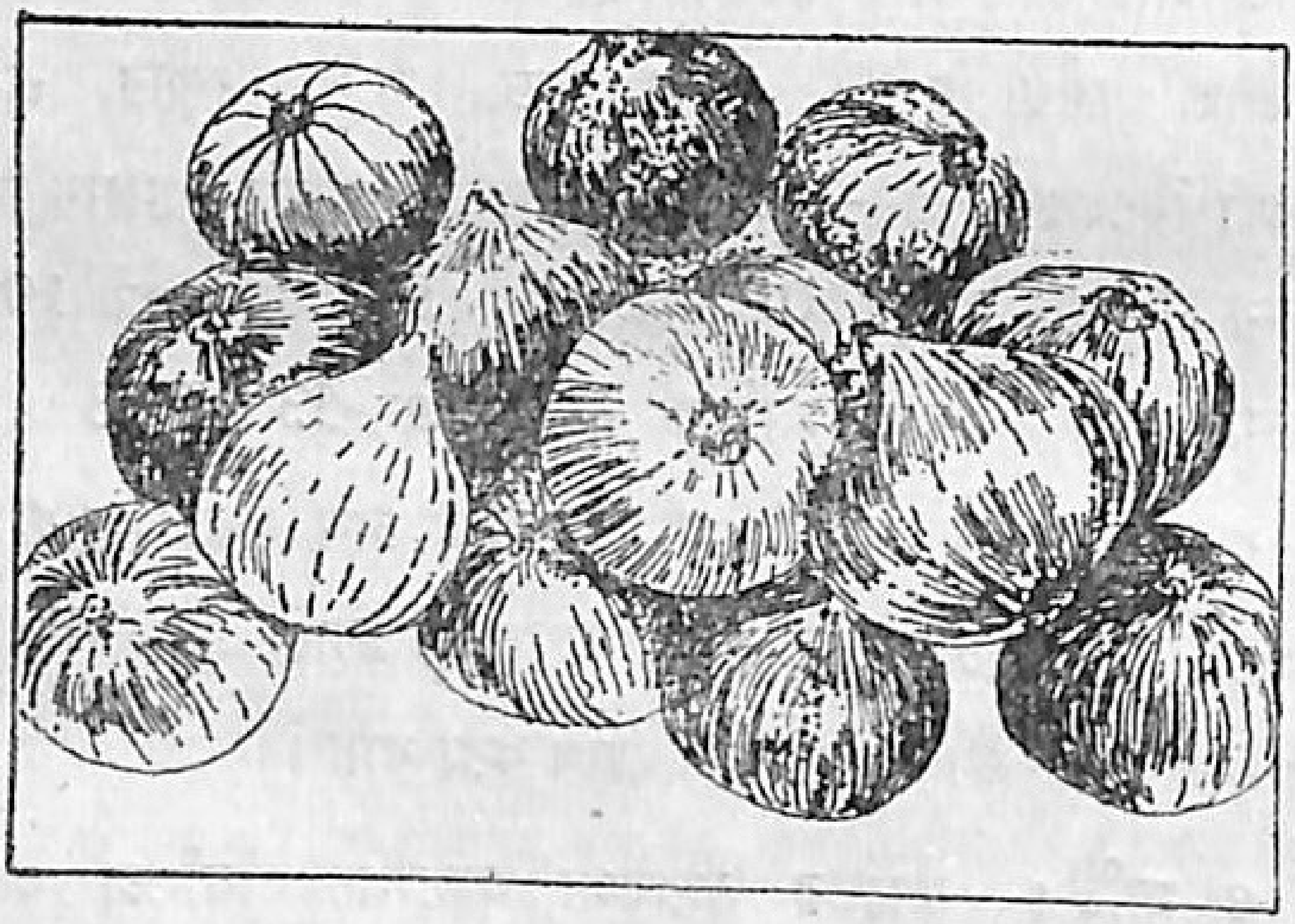
পেঁয়াজ চাষের জন্য জৈবসারযুক্ত উর্বর মাটি দরকার হয়। জমি উঁচু হওয়া বাঞ্ছনীয়। মোটা মাটিতে পেঁয়াজের বাল্ব মোটা হয়। মাটির পি, এইচ 5·8 থেকে 6·5 মধ্যে হলে ফলন খুব ভাল হয়।

জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ : মূলোর মতই বার বার চাষ দিয়ে জমি তৈরী করা হয়। জমি তৈরীর সময় প্রাথমিকভাবে হেক্টর প্রতি 20 টন জৈবসার, 125 কেজি ইউরিয়া, 300 কেজি সুপার ফসফেট ও 200 কেজি পটাশ সালফেট প্রয়োগ

করা হয়। চারা লাগানোর এক দেড় মাস পরে সারির দুই দিকে পুনরায় 125 কেজি ইউরিয়া চাপান হিসাবে প্রয়োগ করা উচিত।

চারা তৈরী ঃ এক হেক্টর জমির জন্য 8—10 কেজি হিসাবে বীজ, বীজ তলায় সেপ্টেম্বর মাসে বপন করা উচিত। চারাগুলি 2—2½ মাস বয়সের হলে ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে মূল জমিতে 10—15 সেঃ মিঃ দূরত্বে ও 45 সেঃমিঃ অন্তর সারিতে লাগানো হয়। এখন দশ-বারো সারির পর কিছু জমি ফাঁক রেখে পুনরায় সারি করা হয়। অনেক সময় সোজাসুজি চারা কিনে জমিতে লাগানো হয়। এক্ষেত্রে 6—10 কুইণ্টাল চারা এক হেক্টর জমির জন্য প্রয়োজন হয়।

মাধ্যমিক পরিচর্যা ও সেচ ঃ পেঁয়াজের জমি সব সময় পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। এছাড়া বার বার নিড়ানী দিয়ে মাটির উপরের স্তর ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এতে করে মাটির মধ্যে বায়ু চলাচল করে ও পেঁয়াজ মোটা হওয়ার সুযোগ পায়। গরম পড়লে, পাতা ভেঙ্গে দিলে পেঁয়াজ মোটা হয়।



চিত্র 9 ঃ সংগৃহীত পুষ্ট পেঁয়াজ।

পেঁয়াজে সেচের প্রয়োজন খুব বেশী। প্রথম অবস্থায় 5—7 দিন অন্তর হালকা সেচ দেওয়া হয়। পরে সেচের ক্রম কমে যায়, কিন্তু গভীরতা বাড়ে। পেঁয়াজে মোট 7—8টি সেচ লাগতে পারে। অবশ্য আবহাওয়ার তারতম্যের উপর সেচের প্রয়োজনীয়তা ও সংখ্যা নির্ভর করে। বাল্ব পুষ্ট হওয়ার মুখে সেচ দেওয়া উচিত নয়।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন ঃ বাজারের চাহিদা অনুসারে পাতা সমেত পেঁয়াজ তোলা হয়। প্রতিকূল আবহাওয়া না থাকলে গাছ শুকিয়ে গেলে

জমি থেকে পেঁয়াজ তোলা হয়। জমি থেকে পেঁয়াজ তুলে কয়েক দিন ছায়ায় রেখে শুকিয়ে নিতে হয়।

জাতের তারতম্য অনুসারে হেক্টর পিছু 20—30 টন ফলন আশা করা যায়। হেক্টরে পেয়াঁজ বীজের উৎপাদন 850—1000 কেজি।

রসুন ঃ

জাতপ্রকরণ ঃ রসুনের বিশেষ জাত প্রকরণ নেই, তবে ক্রেয়ল, ইটালিয়ান ও তাহিতি নামে জাতগুলি উচ্চ ফলনশীল।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ পেঁয়াজ চাষের মতই আবহাওয়া ও মাটি দরকার হয়। অবশ্য রসুন নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেও ভাল হয়।

জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ ঃ পেঁয়াজের মতই জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ করা হয়।

বীজ বপন ঃ এক হেক্টর জমির জন্য 350—500 কেজি রসুনের কোয়া লাগে, কোয়াগুলি 7—8 সেঃ মিঃ দূরত্বে 15 সেঃ মিঃ অন্তর সারিতে লাগানো হয়। রসুন সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে লাগাতে হবে।

মাধ্যমিক পরিচর্যা ও সেচ ঃ পেঁয়াজের মতই দরকার হয়।

ফল সংগ্রহ ও ফলন ঃ পাতা শুকিয়ে গেলেই রসুন তুলে পেঁয়াজের মতই পরিচর্যা করতে হয়। ফলন পেঁয়াজের থেকে কম। হেক্টর পিছু 4—10 টন।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

কন্দ সব্জী

কন্দ শস্যের মধ্যে মূলত আলু, মিষ্টি আলু, ওল, কচু, খাম ও চুপরি আলু, টেপিয়োকা, আর্টিচোক ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে কিছু মরসুমী আবার কিছু বর্ষজীবী গাছ দেখা যায়। তবুও চাষ পদ্ধতি অনেকটা একই রকম হওয়ায় এগুলিকে কন্দ শস্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সব কন্দ শর্করা জাতীয় খাদ্যগুণে সমৃদ্ধ।

আলু :

জাতপ্রকরণ : ভারতীয় আলু গবেষণালয়ের অন্তর্গত কুফরি কেন্দ্র হতে বহু উন্নত জাতের আলু উদ্ভাবন করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে কুফরি চমৎকার, কুফরি-সিন্দুরী, কুফরি চন্দ্রমুখী, কুফরি অলংকার, কুফরি কুবের, কুফরি সফেদ, কুফরি জ্যোতি, কুফরি শীতমান, কুফরি কুন্দন, কুফরি কিষাণ, কুফরি নীলা, কুফরি দেবা, ইত্যাদি সমতলের জন্য ও কুফরি জীবন, কুফরি নীলমণি, কুফরি নবীন ইত্যাদি পাহাড়ী এলাকার জন্য উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়েছে।

আবহাওয়া ও মাটি : সমতলে শীতকালীন ও পাহাড়ে গ্রীষ্মকালীন শস্য হিসাবে আলুর চাষ হয়। প্রায় 3000 মিঃ উচ্চতাতেও আলু চাষ হতে পারে। কিছু জায়গায়, ঠিক মত ব্যবস্থা করলে বছরে দুবার আলু চাষ করা যায়। কন্দ তৈরীর জন্যে 18—21° সেঃ গ্রেঃ উষ্ণতা আবশ্যক অবশ্য এর সাথে মাটিতে রস থাকাও বাঞ্জনীয়।

যে কোন মাটিতে আলু চাষ হতে পারে। তবে, বেলে দোয়াঁশ মাটি সর্বোৎকৃষ্ট এবং কাদা মাটি নিকৃষ্ট। জমি উঁচু হওয়া ও নিষ্কাষণী ব্যবস্থা ভাল থাকা দরকার। কিছুটা অম্ল মাটিতেও আলু ভালই হয়। মাটি উর্বর ও গভীর হওয়া চাই।

জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ : জমি সম্পূর্ণভাবে তৈরীর আগে হেক্টর পিছু 15 টন জৈবসার, 130 কেজি ইউরিয়া ও মুরেট অফ পটাশ এবং 550 কেজি সুপার ফসফেট প্রয়োগ করে বার বার চাষ দিয়ে মুলোর মত জমি তৈরী করা দরকার।

বীজবপন : আলু আকারে ছোট হলে সম্পূর্ণ ও বড় হলে টুকরো করে বীজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হয়, যেন প্রতিটি টুকরোতে

একাধিক চোখ থাকে। 45—60 সেঃ মিঃ দূরত্বে সারিতে, 30 সেঃ মিঃ অন্তর অন্তর মাটির 5—7 সেঃ মিঃ গভীরে আলুর টুকরোগুলি বসিয়ে মাটি চাপা দিতে হয়।

সাধারণত জলদি ফসলের জন্য সেপ্টেম্বর—অক্টোবরের মধ্যে ও নাবি ফসলের জন্য সেপ্টেম্বর—নভেম্বরের মধ্যে আলু লাগিয়ে যথাক্রমে নভেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও এপ্রিলে আলু তোলা যায়। পাহাড়ী এলাকায় অবশ্য সময়টা অন্য। জলদি ফসলের জন্য সেপ্টেম্বর মাসে আলু লাগিয়ে যথাক্রমে জুন-জুলাই ও ডিসেম্বর জানুয়ারী মাসে ফসল তোলা হয়।

এভাবে আলু লাগালে হেক্টর প্রতি প্রায় 1250—1500 কেজি বীজ লাগে।

মাধ্যমিক পরিচর্যা ও সেচ ঃ ভাল ফলনের জন্য সেচ একটি অত্যাবশ্যকীয় কর্ম। নির্দিষ্ট সেচ না দিলে আলু বড় হবে না। সাধারণত 10 দিন অন্তর হালকা সেচ দেওয়া দরকার।

যেহেতু আলু একটি পরিবর্তিত কাণ্ড, সেজন্য মাটি দিয়ে কাণ্ড ঢেকে দিলে আলু ধরার সুবিধে হয়। গাছ 30 সেঃ মিঃ উঁচু হলেই দুসারির মাঝে থেকে মাটি নিয়ে কাণ্ডগুলিকে দুপাশ থেকে ঢেকে দেওয়া হয়। একে সারি বাঁধা বলে। প্রয়োজনে দুবারও সারি বাঁধা হয়। সারি বাঁধার সময় আগাছা নির্মূল হয়ে যায়। এছাড়া সারিতে সেচ দেওয়ার সুবিধে হয়।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন ঃ আলু সাধারণত 2—5 মাসের মধ্যেই তোলার উপযুক্ত হয়ে যায়। অবশ্য এটি জাতের উপর নির্ভর করে। যাইহোক গাছ শুকিয়ে এলেই আলু তোলা উচিত। অন্যথায় গরমে আলু পচে যেতে পারে, বৃষ্টিতে নষ্ট হতে পারে বা ইঁদুর ইত্যাদিতে ক্ষতি করতে পারে।

গড় হেক্টর প্রতি ফলন 25 টন কিন্তু জাত বিশেষে 60 টন পর্যন্ত ফলন হতে পারে।

মিষ্টি আলু ঃ

জাত প্রকরণ ঃ আমেরিকা, জাপান, ও চীন থেকে কিছু উন্নত জাত আমদানি করে এগুলির থেকে ভারতে চাষের উপযোগী কিছু জাত নির্বাচন করে পুষা সফেদ, পুষা লাল ও পুষা সুনেরী ইত্যাদি নাম করণ করে চাষীদের জন্য দেওয়া হয়েছে। মূলত আলুর রঙ ইত্যাদি দেখেই নামকরণ করা হয়েছে। ভি-35,

ও পি-217, আই বি-81 এছাড়া গোল্ড রাম ও সেণ্টিনিয়াল নামে জাতগুলি বেশ উচ্চফলনশীল। তাছাড়া বিভিন্ন প্রদেশে নানান প্রকরণ চালু আছে।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ মিষ্টি আলু গরম আবহাওয়ায় ভাল হয়। সাধারণত বছরে চার মাস গরম দিন ও রাত্রি, পর্যাপ্ত সূর্যালোক ও মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত থাকলেই মিষ্টি আলু চাষ করা যাবে। শস্যটি খরা সহনশীল। 20°—30° সেঃ গ্রেঃ তাপমাত্রায় মিষ্টি আলু ভাল হয়।

15—20 সেঃ মিঃ গভীরতাযুক্ত হাল্‌কা মাটিতে মিষ্টি আলুর চাষ ভাল হয়। কাদা মাটিতে শেকড় লম্বা হয়, কিন্তু মোটা হয়না। মাটি বেশী অম্ল হওয়া চলবে না। মাটির পি, এইচ-5.8—6.7-এর মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। মিষ্টি আলু চাষের জন্য উঁচু জমি নির্বাচন করা দরকার।

জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ ঃ চাষ দিয়ে ভালভাবে জমি তৈরী করার আগে হেক্টর প্রতি 10-15 টন জৈবসার, 60 কেজি ইউরিয়া, 280 কেজি সুপার ফসফেট ও 120 কেজি মিউরেট অফ পটাশ প্রয়োগ করে জমি তৈরী করা হয়। কলম লাগানোর পর পুনরায় 60 কেজি ইউরিয়া, চাপান সার হিসাবে, দেওয়া হয়।

চারা তৈরী ও রোপন ঃ মিষ্টি আলুর লতায় শেকড় গজিয়ে জমিতে লাগানো হয়। শেকড় তৈরী করার জন্য লতাগুলিকে নার্সারীতে 10—15 সেঃ মিঃ মাটির গভীরে পুঁতে রাখা হয়। 7—10 দিনের মধ্যেই প্রতিটি গাঁট থেকে শেকড় গজায়। এগুলি 20—30 সেঃ মিঃ লম্বা টুকরো করে মূল জমিতে 60 সেঃ মিঃ অন্তর সারিতে লাগানো হয়। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব 30 সেঃ মিঃ রাখা হয়। কলমগুলি লাগিয়ে সেচ দিতে হয়। হেক্টর প্রতি প্রায় 50—70 হাজার কলম লাগে।

পূর্ব ভারতে জুন-জুলাই ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর দুই ঋতুতে কলমগুলি লাগানো হয়। তবে খরিপ ও রবি যে কোন সময়েই লাগানো হোক না কেন কিছুটা আগে লাগাতে পারলে ফলন বেশী হয়।

মাধ্যমিক পরিচর্যা ঃ আগেই বলা হয়েছে কলম লাগানোর সাত দিনের মধ্যেই এগুলি জমিতে লেগে যায়। প্রায় 21 দিনের মধ্যে নতুন পাতা ও শাখা গজায়। এই সময় একবার আগাছা নির্মূল করা দরকার গাছ সম্পূর্ণ জমি ঢেকে না ফেলা পর্যন্ত নিড়ানী দিতে হয়। সারিতে থাকলে 2-$2\frac{1}{2}$ মাস পরে গাছে মাটি দেওয়া দরকার।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন ঃ মিষ্টি আলু তোলার উপযুক্ত হলে (জাত অনুসারে লাগানোর 150—180 দিন পরে) পাতার রঙ হলদে হয়ে আসবে। ঠিক সময়মত না তুলতে পারলে ফলন পাওয়া যায় না। আগে তুললে অপুষ্ট আলু বেশী দিন রাখা যায় না। আবার পুষ্ট আলু জমিতে বেশী দিন রাখলে পচে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। আলু তোলার পর ঘরের মধ্যে বা রোদের মধ্যে শুকনো আবহাওয়ায় রেখে (7 দিন) শোধন করা হয়।

স্থান ও জাত অনুসারে ফলনের তারতম্য ঘটলেও গড়ে 10 টন ফলন পাওয়া যায়। সেচের ব্যবস্থা ও জাত ভাল হলে হেক্টর প্রতি 30 টন ফলনও পাওয়া যায়।

টেপিয়োকা ঃ

টেপিয়োকার চাষ আগে দক্ষিণ ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পূর্ব ভারতে শস্যটির চাষ ক্রমশ প্রসার লাভ করেছে। ফলন ও প্রাকৃতিক অবস্থার সাথে সহনশীলতা প্রসারের কারণ বলে মনে করা হয়।

জাত প্রকরণ ঃ জনপ্রিয় ও উচ্চ ফলনশীল জাত হিসাবে এম-4, এইচ-165, এইচ-226 ও এইচ-97 ইত্যাদির নাম করা গেলেও টেপিয়োকার বহু জাত দেখা যায়।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ হালকা ধরনের যে কোন মাটিতেই, উষ্ণ অঞ্চলে এ শস্যটি হতে পারে। তবে জমিটি উঁচু ও খোলামেলা হবে। বাড়ীর হাতায় লাগানোর জন্য বা পতিত জমি ব্যবহার করার জন্য এই ফসলটির চাষ করা যায়।

জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ ঃ সাধারণভাবে জমি তৈরী করে। হেক্টর প্রতি 15—20 টন জৈবসার, 250 কেজি সুপার ফসফেট ও 250 কেজি পটাশ সালফেট ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। পরে দুই তিন মাসের মধ্যে 100 কেজি ইউরিয়া চাপান হিসাবে প্রয়োগ করা হয়।

চারা তৈরী ও লাগানো ঃ আগের বছরের পুষ্ট অংশ থেকে 20—30 সেঃ মিঃ লম্বা টুকরো কেটে নিয়ে ছায়াযুক্ত স্থানে অর্ধেকের ওপর অংশ নালার মধ্যে পুঁতে রাখা হয়। গাছে অপুষ্ট মাথাগুলো বাদ দেওয়া হয়। সাধারণত এপ্রিল—জুলাই মাসের মধ্যে 60—45 সেঃ মিঃ অন্তর সারিতে লাগানো হয়। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব 45 সেঃ মিঃ রাখা হয়। এক হেক্টর জমি চাষ করতে প্রায় 12000 থেকে 18000 কলম লাগে।

মাধ্যমিক পরিচর্যা ও সেচ : গাছ বড় না হওয়া পর্যন্ত 2-3 বার নিড়ানী দেওয়া দরকার হয়। গাছে মাটি তুলে সারি করে দেওয়া হয়।

সাধারণত সেচ দেওয়া না হলেও 12—18টি সেচ দিতে পারলে ফলন অনেক বেড়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, টেপিয়োকা গাছ প্রায় 8-12 মাস জমিতে থাকে।

শস্য সংগ্রহ ও ফলন : সাধারণত শেকড় একটু নরম থাকতেই তুলে নেওয়া হয়। বেশী পুষ্ট হয়ে গেলে এগুলি ছিবড়ে হয়ে যায়।

টেপিয়োকার হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় 25—30 টন।

কচু :

জাত প্রকরণ : কচুর কতকগুলি জাত প্রকরণ দেখা যায়। যেগুলি মূলত স্থানিক। আকৃতি এবং রঙ দেখে নামকরণ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে কালো কচু, পঞ্চমুখী উল্লেখযোগ্য। আবার পঞ্চমুখী উচ্চ ফলনশীল।

আবহাওয়া ও মাটি : কচু সম্পূর্ণভাবে উষ্ণ মণ্ডলীয় শস্য। গরম কালেই কচু চাষ হতে দেখা যায়। 14° সেঃ গ্রেঃ এর নীচে তাপ হলে কচু হবে না। এছাড়া দীর্ঘ দিন ও বাঞ্ছনীয়।

জল ধারণক্ষম পলি ও কাদা মাটি কচু চাষের উপযুক্ত। বেলে দোয়াঁশ মাটিতেও কচু হতে পারে। তবে বেশী সেচ লাগে। জমি নিচু হলে ক্ষতি নাই। কেননা জমিতে জল থাকলে কচুর ক্ষতি হয় না।

জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ : মূলোর মত বা আলুর মত খুব ভালভাবে জমি তৈরী করতে হবে। হেক্টর পিছু 25—30 টন জৈবসার। 100 কেজি ইউরিয়া, 300 কেজি সুপার ফসফেট ও 200 কেজি পটাশ সালফেট মিশিয়ে কচু লাগানো উচিত। গাছ বেরোনোর একমাস পর 50 কেজি ইউরিয়া ও দুমাস পর আরো 50 কেজি ইউরিয়া চাপান হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

বীজ বপন ও সেচ : ফেব্রুয়ারী মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত সেচের সুবিধার উপর নির্ভর করে কচু লাগানো যায়। এক হেক্টর জমির জন্য প্রায় 8—12 কুইণ্টাল কচু লাগে। আস্ত কচু 50—60 সেঃ মিঃ অন্তর সারিতে লাগানো হয়। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব প্রায় 30—40 সেঃ মিঃ রাখা হয়।

কচু প্রায় 4—5 মাসের শস্য। বর্ষাকাল ব্যতীত সব ঋতুতেই 5-7 দিন অন্তর

সেচ দেওয়া দরকার। জলের অভাব সহ্য করার ক্ষমতা কচুর নাই। সার দেওয়ার পর সেচ দেওয়া একান্ত দরকার।

মাধ্যমিক পরিচর্যা ঃ প্রথম অবস্থায় কোদাল দিয়ে জমি পরিষ্কার রাখা দরকার। প্রথম চাপান দেওয়ার পর গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দেওয়া উচিত। ঠিক একইভাবে দ্বিতীয় চাপানের পরও গোড়ার মাটি তুলে দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন ঃ গাছ মরে গেলে কচু তুলে ফেলা হয়। কোদাল দিয়ে সারিগুলো ভেঙ্গে দিলে কচু বেরিয়ে পড়ে। এগুলি সংগ্রহ করে, যেগুলির গাছ থাকে, সেগুলি বিচ্ছিন্ন করে পরিষ্কার করা হয়। পরে ছায়ায় শুকিয়ে নিলে ও মাটি ঝরে গেলে গুদাম জাত করা যায়।

কচুর গড় ফলন হেক্টর প্রতি 15—20 টন। কিন্তু কিছু স্থানে কিছু জাত চাষ করে হেক্টরে 35 টন ফলনও পাওয়া গেছে।

ওল ঃ

জাত প্রকরণ ঃ বিখ্যাত মাদ্রাজী বা সাঁতরাগাছির ওল নাম শুনে বোঝা যায় ওলের জাতগুলোর নামকরণ প্রায় সবই স্থানীয় নামানুসারে। এগুলোর মধ্যে কাভুর জাতটি উচ্চফলনশীল।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া ওল চাষের উপযুক্ত। পর্যাপ্ত সূর্যালোক না পেলে ওল হবে না।

সাধারণতঃ হাল্কা বেলে দোয়াঁশ বা মোটামাটি ওল চাষের উপযুক্ত। তাছাড়া ওলের জমি উঁচু হতে হবে, এবং ভাল জল নিকাশী থাকাও দরকার।

জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ ঃ আলুর মতই জমি তৈরী করতে হবে। জৈব-সারের পরিমাণ কচুর মতই। অন্যান্য সারও একই পরিমাণ। তবে নাইট্রোজেন একটু বেশী লাগে। ফসফেট, পটাশ ও নাইট্রোজেনের অর্ধেকাংশ অর্থাৎ 100 কেজি শেষ চাষের আগে মাটিতে মেশানো হয়। ওল গাছ বেরোনোর একমাস পরে আরও 100 কেজি ইউরিয়া চাপান হিসাবে দেওয়া হয়।

ওল লাগানো ও মাধ্যমিক পরিচর্যা ঃ ওলের মুখি বা টুকরো $\frac{1}{2}$ মিঃ × $\frac{1}{2}$ মিটার অন্তর সারিতে লাগানো হয়। এভাবে লাগালে হেক্টর পিছু প্রায় 15—20 কুইণ্টাল বীজ লাগবে। ওল, সাধারণত, মার্চ এপ্রিল মাসে লাগানো হয়।

জমি কুপিয়ে পরিষ্কার রাখা হয়। এছাড়া গাছ বড় হয়ে গেলে, গোড়ায় মাটি দিতে হয়।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন ঃ কন্দ পুষ্ট হলে গাছ মরে যাবে। এ অবস্থায় গাছের গোড়া আলগা করে, কন্দ তুলে ফেলা হয়। ওলের শোধন কচুর মতই। হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় 30—40 টন পর্যন্ত হতে দেখা যায়।

এছাড়া খামআলু, চুপড়ি আলু, জেরুজালেম আর্টিচোখ ইত্যাদি কন্দ শস্যগুলি সাধারণত পদ্ধতিতে চাষ করা হয়। এগুলির আওতায় জমির পরিমাণও নগন্য। প্রথম দুটি এখনো প্রকৃতির মধ্যে বনে জঙ্গলে হতে দেখা যায়। তৃতীয়টি উপযুক্ত আবহাওয়ার অভাবে সমতল পূর্ব ভারতে বিশেষ চাষ হয় না।

যাই হোক, এগুলির চাষ আবাদ পদ্ধতির সম্পূর্ণভাবেই কচুর মত।

সপ্তদশ অধ্যায়

শাক সব্জী

পালং ঃ

পালং-এর অনেকগুলি উন্নত জাত দেখা যায়। এগুলির মধ্যে পুষা জ্যোতি জবনের গ্রীণ, অলগ্রীণ, ব্যানার্জী'স্ জায়েণ্ট ও ব্যানার্জী'স্ সরবতী ইত্যাদি।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ সমতলে শীতকালে ও পাহাড়ে বসন্তকালে চাষ করা হলেও গরম কালেও পালং চাষ করা সম্ভব। যদিও সেচ্ ও নাইট্রোজেন ঘটিত সার বেশী লাগে।

যে কোন মাটিতে পালং চাষ হতে পারে। তবে নিষ্কাষণী ব্যবস্থা যুক্ত উঁচু বেলে দোয়াঁশ মাটিই পালং চাষে সর্বোৎকৃষ্ট।

জমি তৈরী, বীজ বপন, সেচ ও সার প্রয়োগ ঃ হেক্টর প্রতি 30—40 টন জৈবসার দিয়ে ভালভাবে জমি তৈরী করা হয়। বীজ সাধারণত ছড়িয়ে বপন করা হয়। তবে সারিতে লাগাতে পারলে মাধ্যমিক পরিচর্যা ইত্যাদির সুবিধা হয়। চারা বেরোনোর পর এক মাসের মধ্যে হেক্টর প্রতি 40 কেজি ইউরিয়া চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করা উচিত। এক হেক্টর চাষ করতে প্রায় 30 কেজি বীজ লাগে।

সমতলে আগষ্ট মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ও পাহাড়ে মার্চ মে পর্যন্ত বীজ বপন করা চলে। জমির অবস্থা ও আবহাওয়া বুঝে প্রয়োজন মত সেচ দেওয়া হয়। তবে চাপান সার ছড়ানোর পর সেচ দিতে হবে। আগাছা নির্মূল করে জমি পরিষ্কার রাখা বাঞ্ছনীয়।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন ঃ পাতাগুলি 15—30 সেঃ মিঃ লম্বা হলেই গোড়া থেকে কেটে নেওয়া হয়, অথবা শেকড় সমেত তুলে নেওয়া হয়। তবে পাতাগুলি নরম থাকতেই সেগুলি তোলা হয়। পালং তোলার পর পরিষ্কার জলে ধুয়ে বাজারে পাঠানো হয় বা ব্যবহার করা হয়। পালং-এর ফলন হেক্টর প্রতি 8 – 10 টন।

লেটুস্ ঃ

লেটুস্ অবশ্য সালাদ হিসাবে বেশী পরিচিত হলেও লেটুস পাতা শাক হিসাবে যথেষ্ট ব্যবহৃত হচ্ছে।

জাত প্রকরণ ঃ লেটুস পাতার নানারকম আকৃতি দেখা যায়। কোনটা কোচকানো, কোনটা সরু পাতা, কোনটা আবার তৈলাক্ত। যাইহোক, গ্রাণ্ড-র‍্যাপিডস, হোয়াইট বোসটোন, গ্রেট লেকস্, চাইনিজ ইয়োলো ও স্লোবোল্ট ইত্যাদির নাম ভাল জাত হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ লেটুস শীতকালীন সব্জী। তাপমাত্রা ২৭° সেঃ গ্রেঃ উপরে উঠলে বীজ অঙ্কুরিত হতে চায় না। বীজ বপন থেকে শস্য সংগ্রহ পর্যন্ত সমস্ত সময়ই ঠাণ্ডা আবহাওয়া দরকার।

যে কোন মাটিতেই লেটুস চাষ করা গেলেও উর্বর বেলে দোয়াঁশ, দোয়াঁশ বা পলিমাটি লেটুস চাষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট।

জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ ঃ পালং-এর মতই ভালভাবে জমি তৈরী করা উচিত। চারা লাগানোর আগে হেক্টর প্রতি 15—20 টন জৈবসার, 120 কেজি ইউরিয়া, 300 কেজি সুপার ফসফেট ও 120 কেজি মিউরেট অফ পটাশ প্রয়োগ করা হয়। চারা লাগানোর 5 সপ্তাহ পরে আরো 120 কেজি ইউরিয়া চাপান হিসাবে দেওয়া হয়।

চারা তৈরী ও রোপণ ঃ এক হেক্টর জমির জন্য $2\frac{1}{2}$ কেজি বীজ লাগে। বীজগুলি বীজতলায় 25—30 সেঃ মিঃ অন্তর সারিতে লাগানো হয়। বীজ খুবই ছোট, তাই মাটির 1 সেঃ মিঃ এর বেশী গভীরে যাওয়া উচিত নয়। চারার বয়স 5 সপ্তাহ হলে মূল জমিতে 40—50 সেঃ মিঃ দূরত্বে সারি করে লাগানো হয়।

অনেক সময় সরাসরি জমিতে লাগিয়ে, মাঝে মাঝে পাতলা করে, নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখা হয়। লেটুস বীজ, বীজতলায় সেপ্টেম্বর মাসে ফেলা হয়। অক্টোবর নভেম্বর মাসে মূল জমিতে লাগানো হয়।

মাধ্যমিক পরিচর্যা ও সেচ ঃ প্রয়োজন মত হাল্কা নিড়ানী দেওয়া দরকার। জমি পরিচ্ছন্ন রাখা বাঞ্ছনীয়। 4—7 দিন অন্তর প্রথম অবস্থায় হাল্কা সেচ দেওয়া দরকার। গাছ বড় হলে সেচের ক্রম কমে ও গভীরতা বাড়ে।

কপি জাতীয় লেটুসের বাঁধা ঠিক হওয়ার জন্য অনেক সময় পাতা বেঁধে দেওয়া হয়।

শস্য সংগ্রহ ও ফলন ঃ পাতা শক্ত হওয়ার আগেই এবং গাছ পূর্ণ আকৃতিতে এসে গেলেই শস্য সংগ্রহ করা হয়। লেটুসের হেক্টর প্রতি ফলন 10—12 টন। বাঁধা লেটুসের থেকে পাতা লেটুসের ফলন বেশী।

এছাড়া শীতকালীন শাক সব্জীর মধ্যে মেথীশাক, সরষে শাক, বিলীতি পালং, সুইস চাড, টক পালং, পাহাড়ী পালং, মটর শাক, ছোলা শাক, খেসারী শাক, ইত্যাদির নাম করা যায়। এগুলির চাষ পদ্ধতি পালং-এর মতই।

লাউ, কুমড়ো ও পটলের কচি পাতা, কচু শাক, মিঠা পাটের নরম পাতা, পুঁই, পুনর্নবা, গিমে, হেলেঞ্চা, শালুক ডাঁটা, শতমূলী, সজনে পাতা, চম্পানটে চামেলীনটে, শীষনটে, কাঁটানটে ও কাঁটোয়া ডাঁটা শাক হিসাবে ও নটে জাতীয় সব্জীর বীজ, খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলিতে আমিষ জাতীয় খাদ্য ও খনিজ লবণ ভাল থাকে।

চামেলী নটের দুটো জাত—পুষা ছোট চাওলি ও পুষা বড় চাওলী, ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ থেকে অনুমোদিত। পুঁই-এরও লাল ও সবুজ দুটি জাত দেখা যায়।

এগুলি মূলত গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে চাষ করা হয়। জৈবসার যুক্ত যে কোন উর্বর মাটিতেই এগুলির চাষ হওয়া সম্ভব। সার বিশেষত নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগ করলে 40—50 শতাংশ বেশী ফলন পাওয়া যায়।

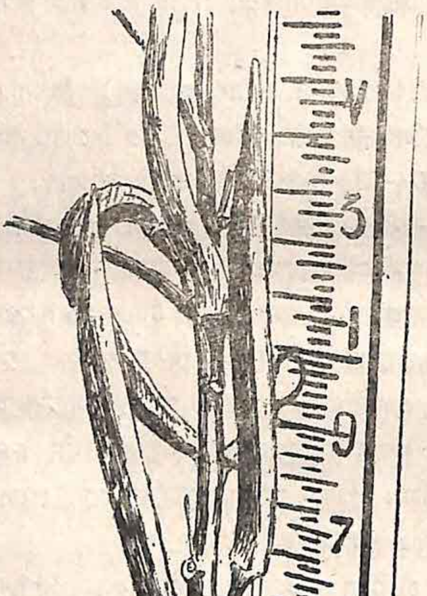
হেক্টর প্রতি 30—40 টন জৈবসার দিয়ে মৌসুমী শাকগুলির বীজ বপন বা চারা রোপণ করে 60 কেজি ইউরিয়া চাপান সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

প্রায় সমস্ত শাক সব্জী চাষের জন্য পরিচ্ছন্ন চাষ ও প্রচুর সেচের দরকার হয়। 3—5 দিন অন্তর (গাছ বেরোনোর পর) সেচ দেওয়া দরকার। সেচ দিতে পারলে ফলন বেশী পাবার সম্ভাবনা থাকে। নটে ও পাট বীজ মার্চ-জুলাই মাসে ফেলা হয়। হেক্টর পিছু 3—6 কেজি বীজ লাগে। পুঁই-এর বীজ একটু বেশী লাগে। হেক্টরে প্রায় 10 কেজি। অবশ্য পুঁই পুনর্নবা গিমে, হেলেঞ্চা, শত মূলী, সজনে ও শালুক চারা ও কলম করেও লাগানো হয়।

গাছ তুলে বা কেটে নিয়ে শাক সংগ্রহ করা যায়। এগুলির ফলন, সব্জীর তারতম্য অনুসারে, হেক্টর প্রতি 10—20 টন হতে পারে।

ঢেঁড়স ঃ

জাত প্রকরণ ঃ ঢেঁড়সের অনেকগুলি জাত দেখা যায়। মূলত গাছের উচ্চতা ও ফলের রঙ অনুযায়ী জাতগুলো ভাগ করা হয়েছে। অনেকগুলি উচ্চ ফলনশীল জাত ভারতের ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে। উন্নত জাতগুলির মধ্যে পুষা শাওনী, কল্যাণী প্রভাকর, পাঞ্জাব পদ্মিনী, রেড আমেরিকান, পুষা মখমলী, বৈশালী বধূ, পারকিনস্ লংগ্রীণ ও সাতধারির নাম করা যায়। রেড আমেরিকান জাতের ফলের রঙ লাল। বৈশালী বধূ ও



চিত্র 10 ঃ ফলন্ত কল্যাণী প্রভাকর জাতের ঢেঁড়স। ফলের আকার দেখানো হয়েছে (ইঃ)।

সাতধারির গাছ ছোট, ফলও অপেক্ষাকৃত ছোট। পুষা শাওনী, কল্যাণী প্রভাকর ও পাঞ্জাব পদ্মিনী জাতগুলির ভাইরাস সহনশীলতা আছে। কল্যাণী প্রভাকরের ফল সব থেকে বড়। প্রায় 35—45 সেমি লম্বা এবং এটি শীত গ্রীষ্ম সব সময়ই লাগানো যায়।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ ঢেঁড়স মূলত গরম কালের ফসল। তাপমাত্রা 20° সেঃ গ্রেঃ কম হলে বীজ অঙ্কুরিত হতে চায় না। ব্যতিক্রম কল্যাণী প্রভাকর।

ঢেঁড়স যে কোন মাটিতেই হতে পারে। তবে নিষ্কাষণীযুক্ত, উঁচু উর্বর, বেলে দোয়াঁশ মাটিতে সব থেকে ভাল হয়। ক্ষার ও লবণাক্ত জমি এবং অল্প অম্ল (পি, এইচ-6-6·8) জমিতেও ঢেঁড়স ভালই হয়। বীট ছাড়া অন্য ফসলের থেকে ঢেঁড়সের লবণ সহনশীলতা বেশী।

সার প্রয়োগ ও বীজ বপন ঃ জমি তৈরীর সময় 30—40 টন জৈবসার, 120 কেজি ইউরিয়া, 300 কেজি সুপার ফসফেট ও 120 কেজি মিউরেট অফ পটাশ প্রাথমিক ভাবে প্রতি হেক্টর জমিতে ভালভাবে মেশাতে হয়।

হেক্টর প্রতি 18—20 কেজি বীজ মে থেকে সেপ্টেম্বর-এর মধ্যে যে কোন সময়, 60 সেঃ মিঃ অন্তর সারিতে লাগানো হয়। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব 40—50 সেঃ মিঃ রাখা হয়। বীজ বোনার সময় জমিতে রস থাকা চাই।

মাধ্যমিক পরিচর্যা ও সেচ্ ঃ জমি পরিষ্কার রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনে 2—3 টে নিড়ানী দেওয়া হয়। বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়াও যেতে পারে।

প্রয়োজন অনুসারে 5—6 দিন অন্তর সেচ দেওয়া হয়। বর্ষাকালে সেচ লাগে না। পরন্তু নিষ্কাষণী ব্যবস্থা করতে হয়।

ফল সংগ্রহ ও ফলন ঃ নরম অবস্থায় পূর্ণ আকৃতি এলে ফল সংগ্রহ করা হয়। সাধারণত ফুল ফোটার পর 5—6 দিনের মধ্যেই ফল তোলার উপযোগী হয়ে যায়। রোদ ওঠার আগেই ফল সংগ্রহ করে, ছায়া বা ঠাণ্ডা-জায়গায় রাখা উচিত।

এক হেক্টর জমি থেকে 8—10 টন ঢেঁড়শ উৎপন্ন হতে পারে। পাঞ্জাব পদ্মিণী ও কল্যাণী প্রভাকরের ফলন কিছুটা বেশী প্রায় 12—15 টন হতে দেখা যায়।

সব্জী সারণী

Sl No	Bengali Name	English Name	Scientific Name
1.	পেঁয়াজ	Onion	*Allium cepa*
2.	রসুন	Garlic	*A. sativum*
3.	লীক	Leek	*A. porrum*
4.	কচু	Arum	*Colocasia spp.*
5.	ওল	Elephant Yam	*Amorphophalus companulatus.*
6.	খাম আলু	Yam	*Dioscorea alata*
7.	ভুট্টা বা মকাই	Corn	*Zea mays*
8.	শতমূলী	Asparagus	*Asparagus officinalis*
9.	কাঁচাকলা	Cooking Banana	*Musa paradisiaca*
10.	নিউজিল্যাণ্ড পালং	Newzealand Spinach	*Tetragonia expansa*
11.	লালশাক, কাটোয়াডাঁটা	Amaranth	*Amaranthus spp.*
12.	নটে, চাওলি শাক	Alternanthera	*Alternanthera anoen*
13.	পুঁই	Basella	*Basella alba, B. rubra*
14.	পালং	Spinach	*Artiplex hortensis*
15.	বীট	Beet	*Beta vulgaris*
16.	বথুয়া শাক	Bathua	*Chenopodium album*
17.	কুসুম	Saflower	*Carthamus tinctorius*
18.	লেটুস	Lettuce	*Lactuca sativa*
19.	চীকোরী	Chikory	*Cichorium intybus*
20.	আর্টিচোক	Artichoke	*Cynara scolymus*
21.	এনডিভ	Endive	*Cinchorium endivia*
22.	মিষ্টি আলু	Sweet Potato	*Ipomoea batatus*
23.	ফুলকপি	Cauliflower	*Brassica oleracea* var *botrytis*
24.	বাঁধাকপি	Cabbage	*B. oleracead* var. *capitata*

Sl No.	Bengali Name	English Name	Scientific Name
25.	ওলকপি	Knolkhol	*B. caulorapa*
26.	শালগম	Turnip	*B. compestris*
27.	সরষে শাক	Leaf Mustard	*B. juncea*
28.	ব্রকোলী	Broccoli	*B. oleracea* var. *italica*
29.	রুটাবাগা	Rutabaga	*B. napus* var. *napobrassica*
30.	ব্রুসেলস্ স্প্রায়ুট	Brussel Sprout	*B. oleracea* var. *gemmifera*
31.	কেল	Kale	*B. oleracea* var. *occphala*
32.	মূলো	Radish	*Raphanus sativus*
33.	হালিম শাক	Nasturtium	*Nasturtium officinalis*
34.	ধুঁধুল	Sponge Gourd	*Luffa cylindrica*
35.	ঝিঙে	Ridge Gourd	*L. acutangula*
36.	টিণ্ডা	Tinda	*Citrullus vulgaris*
37.	চাল কুমরা	Ash Gourd	*Benincasa hispida*
38.	উচ্ছে বা করলা	Bitter Gourd	*Monordca charantia*
39.	শশা, ক্ষীরা	Cucumber	*Cucumis sativus*
40.	কাঁকরী, ফুটি	Long Melon	*C. melo* var. *utilissimus*
41.	লাউ	Bottle Gourd	*Lagenaria siceraria*
42.	চিচিঙ্গা	Snake Gourd	*Tricosanthes anguina*
43.	পটল	Pointed Gourd	*T. dioica*
44.	স্কুয়াস	Squash	*Cucurbita pepo*
45.	তরমুজ	Water Melon	*Citrullus vulgaris*
46.	খরমুজ	Musk Melon	*Cucumis melo* var *reticulata*

Sl No.	Bengali Name	English Name	Scientific Name
47.	কুঁদরী	Ivy Gourd	*Coccinea cordifolia*
48.	কাঁকরোল	Kankrol	*Momordica cochin-chinensis*
49.	মিষ্টি কুমরো	Sweet Gourd	*Cucurbita pepo, C. moschata, C. maxima.*
50.	চালতা	Dillenia	*Dillenia indica*
51.	টেপিয়োকা	Tepioca	*Manihot esculenta*
52.	লীমা বীন	Lima Bean	*Phaseolus lunatus*
53.	ফরাস বীন	French Bean	*Phaseolus vulgaris*
54.	সয়াবীন	Soybean	*Glycine max*
55.	মটরশুঁটি	Pea	*Pisum sativum*
56.	চীনে বাদাম	Peanut	*Aracis hypogea*
57.	সীম	Dolichos Bean	*Dolichos lab lab*
58.	বরবটি, লোবিয়া	Cowpea	*Vigna sinensis*
59.	জ্যাকবীন	Jackbean	*Canavalia ensiformis*
60.	মাখন সীম	Swordbean	*anavalia gladiata*
61.	মেথী	Foenum Graecum	*Trigonella Foeneem Graecum*
62.	চম্পা মেথী	—do—	*Trigonella cornacu-lata*
63.	কাঞ্চন ফুল	Boehinia	*Boehinia alba*
64.	বকফুল	Sesbania	*Sesbania grandiflora*
65.	তেঁতুল	Tamarind	*Tamarindus indica*
66.	শালুক	Paccharymus	*Paccharynus angula-tus*
67.	বুনো সীম	Wild Bean	*Canavalia carthertica*
68.	করণজা	Karanda	*Deris indica*
69.	উইং বীন	Wing Bean	*Psophocarpus tetra-gonolobus*

SI No.	Bengali Name	English Name	Scientific Name
70.	ঢেঁড়স	Okra, Lady's Finger	*Abelmoschus esculentus*
71.	নিম	Neem	*Azadirachta indica*
72.	ডুমুর	Fig	*Ficus recemosa*
73.	সজনে	Drumstick	*Moringa oliefera*
74.	টক পালং	Sour Spinach	*Rumex acetosa*
75.	রুহার্ব	Ruharb	*Rheum rhaponticum*
76.	কারী পাতা	Curryleaf	*Murraya chalcas*
77.	আলু	Potato	*Solanum tuberosum*
78.	টোম্যাটো	Totmato	*Lycopersicon lycopersicum*
79.	বেগুন	Brinjal	*Solanum melongena*
80.	সব্জী লঙ্কা	Capsicum	*Capsicum annum*
81.	লঙ্কা	Chilli	*Capsicum frutescens*
82.	গাজর	Carrot	*Daucus carota*
83.	সেলারী	Celery	*Apium groveolens*
84.	মিঠে পাট	Juteleaf	*Corchorus oletorius*
85.	পার্শনীপ	Parsnip	*Pastinaca sativa*
86.	পার্শলে	Parsley	*Petroselinum crispum*

গ্রন্থপঞ্জী

References :—

Bailey, L. H. (1958). *Manual of cultivated plants.* The Mac Milian Company, New York.

Cerighelli, R. (1955). *Cultures Tropicales, I* : 33-35.

Chadha, Y. R. (1961). *Tropical science, 3* : 104.

Chatterjee, S. S. (1966). *Indian Horticulture, 10(2)* : 46.

Chauhan, D. V. S. (1972). *Vegetable Production in India.* Ram Prasad & sons, Agra-3.

Chaudhury, B. (1968). *Vegetables.* National Book Trust, India.

Giacomo, M. M. D. (1967). *Intal, Symp, Trop, Subtrop, Hort.* Bengalore.

Katyal, S. L. (1962). *Indian Farning* (Dec.).

—Ibid— (1977). *Vegetable Growing in India.* Oxford & IBH Publishing Co. New Delhi.

Knott, J. E. (1957). *Handbook for Vegetable growers.* John Wiley & Sons Ine, New York.

Kundu, B. S. (1967). *Intal, Symp, Trop, Root Crops.* Trinidad.

Mae Gillivary, J. H. (1961). *Vegetable Production.* The Blakiston Co. Inc, New York.

Majumdar, D. K. (1983). A note on non-conventional food and feed from ocean. *Proc, Ind, Sci, Cong,* Tirupati.

Mehta, Y. R. (1959). *Kitchen Gardening,* Buraue of Agriculture, Lucknow, U. P.

Mukherjee, S. K. (1970). Presidential Address, *Pro. Ind. Se. Cong.*

Randhawa, M. S. (1966). *Indian Horticulture*, *10*(*2*) : 10-16.

Rajlaxmi, R. (1969). *Applied nutrition*, Baroda-I.

Roy, K. (1967). *Science Reporter*, *4* : 77-81.

Roy, G. L. and P. K. Chatterjee (1976). *Winter Vegetables*; B. C. K. V. West Bengal.

Sukhatme, P. V. (1965). *Feeding India's growing millions*. Asia Publishing House, London.

Yawalkar, K. S. (1969). *Vegetables crops in India*. Agri-Hort. Publishing House, Nagpur-I.

উনিশ টাকা